প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৭



প্রকাশিকা : শিবানী দে / পত্রপুট / ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র দে / শ্রীগোপাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ২৫/১এ কালিদাস সিংহ লেন / কলকাতা-৯

শ্রীমতী কুন্তলা ঘোষ

শ্রীচরণেষু

জীবন ও সাহিত্য

সাহিত্যের চরিত্র বলতে কী বোঝায়? রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"তাহা অন্তর্নিহিত নির্ভীক নিশ্চল জ্যোতির্ময় সত্যের দীপ্তি।" সৃষ্টির এই "চরিত্র"গুণেই কৃষণ চন্দর ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় লেখক রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পরে বহির্বিশ্বে যে ক'জন ভারতীয় সাহিত্যিক পরিচিতি লাভ করেছেন তাঁদেরই একজন কৃষণ চন্দর। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় কৃষণ চন্দরের সাহিত্য অনূদিত হয়েছে, তারই মধ্যে রুশ ভাষায় অনুবাদের সংখ্যা সর্বাধিক। সোভিয়েট ল্যাণ্ড নেহরু পুরস্কার কমিটিও প্রথম বছরেই তাঁদের সাহিত্য পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন তাঁকে ১৯৬৬ সালে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে কৃষণ চন্দরের জনপ্রিয়তার কারণ সম্ভবত: ভারতীয় কৃষকশ্রমিকের সংগ্রামের এমন জীবন্ত চিত্র আর কোনো ভারতীয় লেখকের সাহিত্যে সুলভ নয়। তাঁর সংগ্রামী মানসিকতা ও মানবতাবাদের জন্যেও তিনি বন্দিত।

কৃষণ চন্দরের সাহিত্যের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন এদেশে কৃষণ চন্দর যথার্থই গোর্কির উত্তরসাধক। তবে গোর্কির দ্বারা প্রভাবিত হলেও বিশ্বের সব দেশের প্রগতিশীল লেখকদের সঙ্গেই তাঁর আত্মিক সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে যায় জাঁ পল্ সার্ত্রের কথা। সার্ত্রে তাঁর একটি প্রবন্ধের নামকরণ করেছিলেন—"Vous Sommes Tous Des Assasins" অর্থাৎ "আমরা সবাই খুনী"। কৃষণ চন্দরের একটি গল্প-সংকলনের নাম— "হাম্ ওয়াহশী হ্যাঁয়" অর্থাৎ "আমরা বর্বর"। সার্ত্রের প্রবন্ধের পটভূমি আলজিরীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যদের ওপর ফরাসী পুলিস ও সেনাবাহিনীর ঘাতকদের অমানুষিক অত্যাচার। পক্ষান্তরে কৃষণ চন্দরের গল্পগুলির পটভূমি হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় মানুষের প্রতি মানুষের বর্বরোচিত আচরণ।

নিজের দেশের মানুষের বর্বরোচিত আচরণের অপরাধের ভাগী হওয়ার বোধকে আর্টের মাধ্যমে প্রকাশ করা কিংবা দেশের ও বিশ্ব-মানবের সাম্প্রতিক কোনো সমস্যাকে গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তু করা তাঁর কাছে কোনো সমস্যা ছিল না। খাজা আহমদ আব্বাসের ভাষায়, —"কৃষণ চন্দরের চিন্তাশক্তি একটি স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মতো যাতে সব রকম অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ব্যথা-বেদনা এবং বন্ধু ও শত্রু সহজেই কাহিনীর উপাদান হিসেবে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।"

বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই কৃষণ চন্দর লিখতেন। তাঁর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তু দেশ ও মেহনতী মানুষ। যে সুস্থ পরিবেশ থাকলে মানুষের স্বাভাবিক সত্তা বিকশিত হয়ে উঠতে পারে সেই সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্যেই আজীবন তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে সংগ্রাম করে গেছেন। খানকয়েক রুটি, কয়েক গজ কাপড়, মাথা গোঁজার একটু-খানি ঠাঁই—এক কথায় বেঁচে থাকার ন্যূনতম আশ্বাস থেকে যে দেশের অধিকাংশ মানুষ বঞ্চিত তাদের প্রতি কৃষণ চন্দরের সহানুভূতির অন্ত ছিল না। কিন্তু মানুষকে তিনি শুধু শোষিত, দমিত, উৎপীড়িত হিসেবেই আঁকেননি, দাসত্বমোচনে সক্ষম এক পরাক্রান্ত শক্তি হিসেবে এঁকেছেন। এখানেই গোর্কির প্রভাব আমরা অনুভব করি। 'রোটি কাপড়া মকান' উপন্যাসে কাশেম্মার চরিত্রটি গোর্কির 'মা'-এর আদলেই আঁকা।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যতগুলি গণ-অভ্যুত্থান ঘটেছে তার প্রায় প্রতিটি সংগ্রামের চিত্রই জীবন্ত সংলাপ ও শব্দের সংঘাতের মধ্য দিয়ে পাঠকের হৃদয়ে পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। মানুষের সংগ্রামী চেতনার ওপর তাঁর আস্থা ছিল অগাধ। নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামী শক্তিকে তিনি বার বার সেলাম জানিয়েছেন। বর্তমান সংকলনে নিজামশাহীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তেলেঙ্গানার কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ঐতিহাসিক কাহিনীকে কি ভাবে কৃষণ চন্দর শিল্পসম্মত সাহিত্যরূপ দিয়েছেন পাঠকেরা নিজেরাই তার বিচার করতে পারবেন। আজীবন তিনি দেশের বৃহত্তর জীবন ও সামাজিক প্রগতির সঙ্গে সাহিত্যের সাযুজ্য রচনা করে গিয়েছেন।

মাতৃভাষা হিন্দী হলেও কৃষণ চন্দর উর্দু ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন কারণ উর্দু ভাষার ঐশ্বর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। উর্দু ভাষা যে সংস্কৃতির ভাষা হিসেবে কত সমৃদ্ধ বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট এ স্মিথের উক্তি থেকেই আমরা তা অনুধাবন করতে পারবো—"The urdu language which resembles English in simplicity and flexibility of its syntax and in the extraordinary wealth of its vocabulary drawn from Western Hindi, Sanskrit, Persian, Arabic, English and other sources should be capable of expressing ideas on any subject,—literary, philosophical and scientific." প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য প্রেমচাঁদও উর্দু ভাষার মাধ্যমেই তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে উত্তর ভারতের বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছবার তাগিদেই প্রেমচাঁদ হিন্দীতেই সাহিত্য রচনা করে গিয়েছেন।

কৃষণ চন্দর হিন্দীতেও অনেক গল্প লিখেছেন তার মধ্যে তাঁর সর্বশেষ রচনা নিজের আত্মজীবনী (আধে সফর কী পুরা কহানী) হিন্দীতেই লেখা। আত্মজীবনী লেখা শেষ করে যেতে পারেন নি, তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী সালমা সিদ্দিকী 'অন্তিম অধ্যায়' শীর্ষক রচনাটি যুক্ত করে সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন।

কৃষণ চন্দরের জন্ম হয়েছিল কাশ্মীরের পুঞ্চে ১৯১৪ সালের ২৬শে নভেম্বর। পিতা গৌরীশঙ্কর ছিলেন অন্যতম রাজ চিকিৎসক। পুঞ্চ হাই স্কুলেই তিনি পড়াশোনা করেন। পরবর্তীকালে গৌরীশঙ্কর লাহোর চলে যান। লাহোরেই কৃষণ চন্দর ইংরেজি সাহিত্যে এম এ ও এল এল বি পরীক্ষায় পাস করেন।

দেশ বিভাগের পর কৃষণ চন্দর বোম্বাইতে চলে আসেন স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে। কিছুদিন অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে চাকরি করেন। পরে প্রেমচাঁদের মতো উনিও সিনেমা জগতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন এবং প্রেমচাঁদের মতই এই সৃষ্টিশীল লেখক সিনেমা জগতের কৃত্রিম

পরিবেশের সঙ্গে বেশিদিন মানিয়ে চলতে পারেননি। এই পর্বেই কৃষণ চন্দর কিছু 'মামুলি' গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন যা কৃষণ চন্দরের রচনা হিসেবে মেনে নিতে কষ্ট হয়। পরবর্তীকালে কৃষণ চন্দর লেখাকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রচনার মধ্যে রয়েছে উপন্যাস, কিশোর সাহিত্য, নাটক, ছোটগল্প এবং প্রবন্ধ। একসময় কবিতাও লিখতেন, যা 'নই জ্যাড়য়ে' সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৯৭৭ সালের ৪ঠা মার্চ সকালেও তিনি আত্মজীবনী লিখেছেন। সেদিন বিকেলে তৃতীয়বার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। ৭ই মার্চ বিকেলে শেষবারের মতো তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যায়। স্ত্রী সালমাকে বলেছিলেন,—"প্রকৃতির বিরুদ্ধে অনেকদিন সংগ্রাম করেছি কিন্তু এবার আমার হাতিয়ার surrender করার সময় এসেছে। সালমা, তোমার কাছে আমার প্রার্থনা, আমার জীবন শেষ হওয়া মাত্রই তুমি হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাবে কারণ এখানে সবাই হার্টের পেশেন্ট, তোমার কান্নাকাটি শুনলে তাদের ওপর সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হবে। এখানে যদি কান্নাকাটি করো তাহলে তুমি আমাদের ভালোবাসাকেই অপমান করবে আর একটি কথা। আমার বুকে বসানো পেস মেকারটি নতুন, পেস মেকারটি যাঁর প্রয়োজন তাঁকে দেবার ব্যবস্থা করবে।" (আধে সফর কী পুরা কহানী) আশা করি তাঁর এই অন্তিম সংলাপ থেকেই কৃষণ চন্দর কি ধরণের মানুষ ছিলেন পাঠকবৃন্দ সহজেই তা অনুমান করে নিতে পারবেন।

১৯৭৭ সালের ৮ই মার্চ সকাল ছটায় কৃষণ চন্দর মৃত্যুর কাছে তাঁর 'হাতিয়ার' সমর্পণ করে দিলেন আর সেইদিন থেকেই অমর সাহিত্যিকদের সভায় একটি আসনও তিনি পেয়ে গেলেন।

অমিয় রায়চৌধুরী

ষোলই আগস্ট। উনিশশো সাতচল্লিশ।

আমি তখন আমার মামার বাড়ি লালগাঁওতে ছিলাম। কালা-লোভাসিং রেলস্টেশন থেকে লালগাঁওয়ের দূরত্ব প্রায় দেড় মাইল। এ গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে ব্রাহ্মণরাই সংখ্যায় বেশি। তারপর ক্ষত্রিয়দের স্থান। মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম।

এখানে আমার মামার বাড়ি "গৌরগোঁসাই বাড়ি" নামে সুপরিচিত। হাজার বছর আগে এঁদের পূর্বপুরুষেরা এই গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। শোনা যায় প্রাচীন কালে এই অঞ্চলে তাঁরা অনেকদিন রাজত্ব করেছিলেন। তার চিহ্ন এখনো বর্তমান। লাল-গাঁওয়ের সবচাইতে উঁচু বাড়ি, পরিত্যক্ত প্রাসাদটিকে এখনো লোকে "মহল" নামে উল্লেখ করে থাকে। প্রাসাদটিকে দেখতে ঠিক প্রাচীন কালের কেল্লার মতো।

প্রাসাদের পিছন দিকটায় পাথুরে টিলা। তারপর অনুর্বর বিস্তৃত জমিতে কাঁটাঘাসের জঙ্গল। মাঝে মাঝে শরবন। শরবনের মধ্যে যখন হাওয়া খেলতে থাকে, শরগাছের শুভ্র সুন্দর ফুলগুলি যখন দুলতে থাকে তখন চোখ দুটি জুড়িয়ে যায়। কখনো মনে হয় বুঝি এক ঝাঁক সাদা পায়রা পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে।

এই শরবনই ছিল আমাদের সবচাইতে প্রিয় আস্তানা। দুপুরে যখন শাঁদার মা ঘুমোতেন তখন আমরা দুজনে এখানে পালিয়ে আসতাম। প্রাসাদের সামনের দিকের রাস্তাটা চলে গেছে আখক্ষেতের দিকে। বড়সড় আখগাছের ছায়াঘন অঞ্চলটিও প্রেমিক-প্রেমিকাদের মিলিত হওয়ার পক্ষে মন্দ নয়। অনেকে সেই আখক্ষেতের মধ্যে বসেই গল্প করতো। আমার আর শাঁদার পছন্দ ছিল কিন্তু শরবন। যখন আমরা গল্প করতে করতে মাঝে মাঝে থামতাম তখন হঠাৎই দমকা হাওয়ার শরবন দুলে উঠতো আর সেই অনিন্দ্যবনে যেন জেগে

বেড়াতো আমাদের দুজনেরই অন্তরের অব্যক্ত সংলাপ। শাঁদার করুণা কপালে একগুচ্ছ কালো চুল উড়ে এসে চিকচিক করতো। আর বড় বড় দুটি চোখে ক্লান্ত উদাস ছায়া নেমে আসতো। যে স্বপ্ন আমরা কোনোদিন দেখিনি তা যেন মৃদু মধুর বাতাসের মধ্যে ভেসে বেড়াতো। বাতাসে যেন ছড়িয়ে থাকতো স্বপ্নিল প্রত্যাশার বাণী। ভালবাসার রামধনু তখন আকাশকে রাঙিয়ে দিয়ে যেতো।

শরবনে বাতাস কথা কইতো আর আমরা তা শুনতাম। কিন্তু সবুজ আখের ক্ষেতে বাতাস বাধা পেয়ে স্তব্ধ হয়ে যেতো। যেন প্রাচীন প্রথা, সামাজিক রীতিনীতি আর শাসনের ভয়ে বাতাস থমকে দাঁড়িয়েছে। যেখানে হাওয়াই প্রবেশ করতে ভয় পায় সেখানে তো আর প্রেম বাঁচতে পারে না। এই জন্যেই মেলামেশার জায়গা হিসেবে আমরা শরবনকেই বেছে নিয়েছিলাম। শরের শুভ্র শীর্ষমঞ্জরীর মতই আমাদের উদ্ধত প্রেম মাথা উঁচু করে দুলতে থাকতো।

উনিশশো সাতচল্লিশ সালের দোসরা আগস্ট। সেদিন দুপুরের কথাই বলছিলাম। আমাদের পিছনে ছিল ঘন শরবন। বনের পিছনেই আমাদের গ্রাম। সামনে মাইলের পর মাইল অনুর্বর জমি। সকালে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, তখনো আকাশের গায়ে যেন বৃষ্টির ফোঁটা ছড়িয়ে আছে। পাখির পালকের মতো হাল্কা জলভরা একদল মেঘ আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। ভেজা হাওয়ার মাটির সোঁদা গন্ধ। পশ্চিম আকাশে স্বচ্ছ মৃদু আলো ছড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছিল আশার প্রতীক হয়ে রামধনু বুঝি এখনই ওখানে জেগে উঠবে।

শাঁদার নরম হাতখানি ছিল আমার হাতের মধ্যে। আমরা দুজনেই আকাশের দিকে তাকিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল আমাদের আশা মুসাফিরের মতো ওই পরিচ্ছন্ন পথ দিয়ে হেঁটে আসছে।

শাঁদার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বললাম,—একদিন নিশ্চয়ই তুমি আমার কথা ভুলে যাবে।

শাঁদা কিছু বলল না। বলার কিইবা আছে? এ প্রশ্ন তো যুগ-যুগান্তর ধরে নারী-পুরুষ পরস্পরকে করে আসছে। এর উত্তর কেউ

কোনোদিন দেয়নি। পুরনো প্রশ্ন কিন্তু কত নতুন! মনে হলো এ প্রশ্ন বুঝি আমার কণ্ঠ থেকেই প্রথম উচ্চারিত হলো।

আবার বললাম,—একদিন তোমার বিয়ে হয়ে যাবে।

শাম্বা তখনো সেই স্বচ্ছ স্নিগ্ধ আকাশের দিকেই তাকিয়ে ছিল। অনেকটা সময় নীরবতায় কাটিয়ে সে আস্তে আস্তে বললো,—ঠিকই বলেছো। আমার বিয়ে হয়ে যাবে। যেমন তোমার হয়েছিল।

—আমার বিয়ে তো সেই ছোটবেলায় আমার মা বাবা দিয়েছিলেন।

—আমার বিয়েও তো মা বাবাই দেবেন। তুমি কি ভাবো স্বাধীনভাবে বিয়ে করার সুযোগ আমার আছে?

অপরাধবোধে আমি মাথা নীচু করে রইলাম। অখণ্ড নীরবতা আমাদের দুজনের মাঝে কিছুক্ষণ প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়েছিল। শাম্বাই নীরবতা ভাঙলো। এখন আর তার দৃষ্টি আকাশের দিকে নিবদ্ধ নেই। দু হাত দিয়ে সে আমার বিষণ্ণ মুখ তুলে ধরল। কাছে, খুব কাছে সরে এসে তার গোলাপী গাল আমার মুখের ওপর রাখল। তারপর সোহাগভরা কোমল কণ্ঠে দৃঢ়তার সঙ্গে বললো,—ঠিকই বলেছো। আমার বিয়ে হয়ে যাবে। আমি আদর্শ মা হবো, পতিব্রতা স্ত্রী হবো। সুন্দর স্বামী, সুন্দর ঘর সবই পাবো আমি। মেয়েরা সুখী জীবনের যে স্বপ্ন দেখে সবই হয়তো পাবো।

আমার একখানা হাত ওর বুকের মাঝখানে চেপে ধরে বললো,—আরো, আরো গভীরে যেখানে আমার আত্মা রয়েছে সেখানে তুমি আমার শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে।

আমি অভিভূত হয়ে বললাম,—সত্যি তুমি চিরকাল আমায় মনে রাখবে?

শাম্বা কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় পিছনের শরবনে একটা শব্দ শোনা গেল। ও থেমে গেল। কিছুটা আতঙ্ক, কিছুটা কৌতূহল, আমরা সেই শব্দের দিকে কান পেতে রইলাম। এই সময়টাতে কেউ তো এখানে আসে না। কেউ কি তবে আমাদের ওপর নজর রাখছিল?

শব্দটা ক্রমশই কাছে এগিয়ে আসছিল। আমি শাম্বার হাত ধরে

নিঃশব্দে ঝোপের অন্তপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালাম। শব্দটা আমাদের কাছাকাছি এসে থেমে গেল। দুটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

প্রথম কণ্ঠস্বর,—আসসালামো আলাইকুম।

দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর,—ওয়ালাইকুম আসসালাম।

দ্বিতীয় কণ্ঠস্বরটি শাঁদার খুবই চেনা। আমারও। শাঁদার ভাই, জোকারেল। শাঁদা চিৎকার করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, আমি তাড়াতাড়ি ওর মুখে হাত চাপা দিলাম।

জোকারেল ও শাঁদা দুজনেই লাহোরে একই কলেজে পড়ে। ওরা গ্রামের বাড়িতে ছুটি কাটাতে এসেছে।

আমরা অপরিচিত ব্যক্তির কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলাম। সে বলল,—চাকতারা থেকে পীর কলন্দর শাহ আমাকে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন তাঁর নির্দেশ জারি করার জন্যে।

—কোন্ পীর কলন্দর শাহের কথা আপনি বলছেন?

—জবরগঞ্জের পীর কলন্দর শাহ।

—কী তাঁর নির্দেশ?

—নির্দেশটা পৌঁছিয়ে দিতে হবে নম্বরদার শের বুলন্দকে। আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলুন। সেখানেই শুনতে পাবেন।

—আমি তাঁরই ছেলে।

—তাহলে তো ভালোই হলো।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আমাদের অপরিচিত ব্যক্তিটি বলল,—পীর কলন্দর শাহ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ কারণ এ গাঁয়ে আপনারা এখনো কাজ শুরু করেননি। যাই হোক ওঁর আদেশ, পনেরোই আগস্টের রাতের মধ্যে সব কাজ শেষ করতে হবে।

—সব শেষ করা বলতে আপনি কি বলছেন?

আগন্তুক বলল,—শুনুন তাহলে পীর সাহেবের আদেশ। পনেরোই আগস্টের রাতের মধ্যে সব হিন্দু যুবকদের হত্যা করতে হবে। অর্থ ও অলংকার লুঠ করতে হবে। বুড়ো ও বাচ্চাদের ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে তবে যে সব হিন্দু যুবতী মেয়ে এখানে আছে ও অন্যত্র থেকে আসবে

তাদের লুঠ করে আনতে হবে আমাদের সকলের মুক্তির জন্যে।

শাঁদা কেঁপে উঠল। ও আমার বুকের সঙ্গে মিশে গেল। আমরা দুজনেই থরথর করে কাঁপছিলাম। হৃৎপিণ্ডের ধুক ধুক শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। আমি শাঁদাকে জড়িয়ে ধরলাম।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর তোফায়েলের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সে বলল,—আমার বাবার হয়ে বলছি পীর সাহেবকে একটা কথা জানিয়ে দেবেন।

—কি কথা?

—অনেকদিন থেকে এ গ্রামে আমরা হিন্দু-মুসলমানরা সদ্ভাবে বসবাস করছি। আমাদের দ্বারা পীর সাহেবের নির্দেশ পালন করা সম্ভব হবে না।

নবাগত ধমকের সুরে বলল,—আপনার মতো আদর্শবাদী যুবকদের আমার চেনা আছে। আপনি যদি না পারেন আমরাই কাজ হাসিল করবো।

তোফায়েল নীরব। ওর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম না। আগন্তুক আবার বলল,—আমি চললাম। তৈরি থাকবেন। পীর সাহেবের নির্দেশ পালিত হবেই।

দুজনের পদশব্দ আলাদা আলাদা পথে হারিয়ে গেল। শরবনের নিবিড় জঙ্গলে মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গেল। শাঁদাকে আমার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে দিয়ে বললাম,—শীগগির বাড়ি চলে যাও।

শাঁদা আমাকে আঁকড়ে ধরে বলল,—না, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না। যদি কোথাও যেতে হয় আমি তোমার সঙ্গেই যাবো।

আমি মৃদু ধমক দিয়ে বললাম,—শাঁদা, ছেলেমানুষী করো না। নিজের কানে সব কথাই তো শুনলে।

শাঁদা আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে রইল, তারপর কম্পিত কণ্ঠে বলল,—আমি বিশ্বাস করি না ওরা এমন জঘন্য কাজ করবে। সত্যি বলছি, তুমি দেখে নিও তোফায়েলরা এই

নিষ্ঠুর কাজ কখনই হতে দেবে না।

আমি অনেক চেষ্টায় মুখে হাসি ফুটিয়ে বললাম,—তুমি বলতে চাইছ, আমরা সবাই তো একই ধরিত্রীর সন্তান, তবে কেন·· তাই না ?

শাঁদা মৃদুকণ্ঠে বলল,—তাই তো।

—পৃথিবীতে বিনা কারণে বিষ জন্ম নেয় না শাঁদা। কুঁড়ি তো সবুজ হয়েই ফোটে। তারপর বাইরের গরম হাওয়ায় কখন সেই সবুজ কুঁড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এসব তো তোমার অজানা নয়। এতে কুঁড়ির কোনো দোষ নেই শাঁদা।

শাঁদা মাথা নিচু করল।

ধীরে ধীরে ওকে ছাড়িয়ে দিয়ে বললাম,—লক্ষ্মীটি তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাও। অনেক চেষ্টা করেও যার সমাধান হয়নি, আজ তা কেমন করে হবে ? ওরা বড় নীচ ধান্দাবাজ। আমাদের দেশটাকে ওরা টুকরো টুকরো করে দিতে চায়। তারও আগে ওরা আমাদের হৃদয় ভেঙে দিতে চায়। বিচ্ছেদের বেদনা তো হৃদয় থেকেই শুরু।

শাঁদা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল,- তোমার অভিযোগ কি আমাকে লক্ষ্য করে বলা ?

আমি বললাম,—না শাঁদা, তুমি নও, তুমি নও। এই সব কথা বলছি আমি এই শরবনকে, আকাশ, বাতাসকে। সামনের ওই পথকে তবে আমি এও জানি আমাদের আশার বাণী নিয়ে ওই পথে কোনো পথিক এখানে হাজির হবে না। তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাও, আমি সব বাড়ি বাড়ি গিয়ে খবরটা দিয়ে আসি।

পরস্পরের কাছে বিদায় নেওয়ার কাজটা সহজ ছিল না। চোখের জলে শাঁদার গাল ভিজে গেছে। আমি আবেগের প্রকাশের পথকে রুদ্ধ করে রেখেছিলাম। দুজনে শেষবারের মতো ঘনিষ্ঠ হলাম তারপর ভিন্ন পথে দুজন দুজনের বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

আমি গ্রামে ঢুকে প্রত্যেক বাড়িতে গিয়ে আজ যা শুনেছি

সেই ভয়াবহ সংবাদটি দিলাম। কয়েকদিন আগে আশপাশের গ্রাম থেকে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের যুবতী মেয়েরা আমাদের গ্রামে এসে জড়ো হয়েছিল। খবর পেয়ে সবাই খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পরে শের বুলন্দ হন্তদন্ত হয়ে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হলেন। তিনি আমার দিদিমাকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। গ্রামের প্রবীণা মহিলা হিসেবে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতো। দিদিমা শের বুলন্দকে দেখেই ধমক দিয়ে বললেন,—এসব কি শুনছি শের? সত্যিই কি তোরা বেইমানি করবি?

শের বুলন্দ নত হয়ে দিদিমাকে প্রণাম জানিয়ে বলল,—আমি আপনার ছেলে। আমার প্রাণ থাকতে বাইরের কোনো লোক এ গাঁয়ের বউঝিদের বেইজ্জতি করতে পারবে না। গ্রামের সব মুসলমানদেরই এই এক কথা। আমি নিজেই তাই ছুটে এসেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মা।

সারা গ্রামে আবার খুশির হাওয়া বয়ে গেল। দিদিমা জানতেন শের বুলন্দ কখনো মিথ্যে কথা বলে না। উনি তাই বিশ্বাস করলেন। শের বুলন্দ এ গাঁয়ের মুসলমান সমাজের নেতা। তার ওপর দিদিমার আস্থা দেখে সবাই ভরসা পেল।

নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে সবাই স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে গেল। বাঁধা বিছানা খোলা হলো। বয়স্কা মহিলারা রান্নাবান্নার কাজে লেগে গেল। যুবতী মেয়েরা চুল বাঁধতে বসে গেল। আয়নার সামনে তারা চোখে কাজল পরলো। ওদিকে হিন্দু-মুসলমান যুবকরা গ্রামের সীমান্ত বরাবর পাহারা দেবার কাজে লেগে গেল। আশপাশের গ্রাম থেকে ভয়াবহ সব খবর এসে পৌঁছলেও এ গ্রামের মানুষ নিশ্চিন্ত বোধ করছিল। সত্যিই তিনটি দিন বেশ শান্তিতেই কাটলো।

পাঁচই আগস্ট সন্ধ্যের দিকে চাকতারার দিক থেকে ঢোলের আওয়াজ শোনা গেল। ক্রমশই সেই আওয়াজ জোরদার হতে লাগলো। ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠল। মেয়েদের বাচ্চাদের কান্নায় বাতাস ভারী হয়ে উঠল। এই সময় শের বুলন্দ এসে খবর দিল

সকন্দারা থেকে প্রায় পাঁচশো মুসলমানের একটি দল লাঠিসোটা ও মশাল নিয়ে এদিকে এগিয়ে আসছে। শের বিনীত ভাবে বলল,— আমরা সংখ্যায় মাত্র পঞ্চাশজন, ওদের সঙ্গে কোনোমতেই পেরে উঠব না। আপনারা নিজেদের বাঁচাবার ব্যবস্থা নিজেরাই করুন। আমার পরামর্শ, এখনই আপনারা পালিয়ে যান।

শের মুহম্মদ চলে যেতেই পালানোর যে হিড়িক শুরু হলো তার সম্পূর্ণ বিবরণ দেবার ক্ষমতা আমার নেই। মা নিজের সন্তানকে ফেলে, স্বামী স্ত্রীকে ফেলে যে যার নিজের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে পালাতে শুরু করলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামের সব বাড়িগুলো শূন্য হয়ে গেল। রয়ে গেলেন শুধু আমার দিদিমা। ঘরের এক অন্ধকার কোণে পালঙ্কের ওপর তিনি চুপ করে শুয়ে রইলেন। আমি যখন পালঙ্কের কাছে এসে তাঁর পা স্পর্শ করলাম, তিনি বললেন,— কি রে, তুই এখনো পালাসনি?

আমি বললাম,—দিদিমা, আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

আমি তো হাঁটতে পারি না, আমাকে কি করে নিয়ে যাবি?

—হাঁটতে হবে কেন? তোমাকে কাঁধে করে নিয়ে যাব।

দিদিমা কান্না জড়ানো গলায় বললেন,—আমার ছেলেই যখন আমাকে ফেলে চলে গেল, তুই শুধু শুধু কষ্ট করতে যাবি কেন?

আমি বললাম,—তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না, আমি তোমাকে নিয়ে যাবই।

দিদিমা রাগে চিৎকার করে উঠলেন।

—খবরদার, আমার কাছে আসবি না। আমি এখানেই থাকবো।

ঢোলের আওয়াজ ক্রমশ বাড়ছে। আমি বললাম,—দিদিমা, তুমি শব্দ শুনতে পাচ্ছ? দাঙ্গাবাজের দল কাছে এগিয়ে আসছে।

দিদিমা বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে বললেন,—আমি কানে খাটো না। যা শুনছি ঈশ্বর যেন তা আর না শোনান। তুই চলে যা, ওরা আমাকে কিছু বলবে না। আর পীর কলন্দর শাহ! আসুক ও, দেখবো ওর কত বড় বুকের পাটা। ওর তখন জন্মই হয়নি, ওর বাপের

বিয়েতে আমি চকতারায় গিয়ে উপহার দিয়ে এসেছিলাম।

—কিন্তু দিদিমা—

—বলছি তো তোকে চলে যেতে। আমাকে রাগাসনি। পারি না আর বকবক করতে।

আমার দিকে পিছন ফিরে তিনি শুয়েই রইলেন। আমি মাথা নিচু করে বেরিয়ে এলাম।

সদর দরজা পার হয়ে আখক্ষেতের কাঁচা রাস্তা ধরে আমি হাঁটতে লাগলাম। কি ভেবে আমি বাড়ির অন্যপাশে চলে এলাম। চললাম শরবনের দিকে। ঢোলের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে "আল্লাহো আকবর" ধ্বনি শুনতে পেলাম। এই শব্দ দুটির অর্থ ঈশ্বর মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ, আর মানুষ অত্যন্ত ক্ষুদ্র। সংকীর্ণ, নীচ, বিশ্বাসঘাতকের দল! সভ্যতার শীর্ষে উঠেও স্বভাবের দৈন্য ঘোচেনি ওদের। তবু মানুষ মানুষই, ঈশ্বর কোথায়? তাই ওদের এসব ধ্বনির কোনো মূল্য নেই আমার কাছে।

শরবন আমাকে টানছিল। আমি আর শাঁদা সারাটা দুপুর ওখানেই কাটাতাম। শেষবারের মতো দেখার জন্যে আমি শরবনের দিকে এগোলাম। জানি শাঁদা ওখানে নেই, তবু সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে রইলাম আমি। ব্যথায় বুক টনটন্ করে উঠলো। এই তো সেই বালি আর কাঁকরের টিলা যেখানে আমরা দুজনে বসে গল্প করতাম। সামনে বিস্তৃত অনাবাদী জমি, আকাশ মেটে রঙের মেঘে ছেয়ে আছে। কাব্য করার মতো পরিবেশ নয় মোটেই। না আছে সবুজ গাছপালা, না আছে সুন্দর গন্ধেভরা ফুল, না আছে নদী, পাহাড়, ঝর্ণা তবু কেন এই জায়গাটি আমার কাছে এক টুকরো স্বর্গের মতো মনে হয়?

শাঁদার নাম ধরে আস্তে আস্তে আমি বার কয়েক ডাকলাম। এই ছিল আমাদের রীতি। ও আগে এসে শরবনের মধ্যে লুকিয়ে থাকতো। আমার ডাক শুনলেই বেরিয়ে আসতো। কিন্তু আজ সে এলো না। অন্যদিনের মতো শরবন থেকে বেরিয়ে এসে সে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো না। আমি আবার ডাকলাম, "শাঁদা। শাঁদা।" কেউ সাড়া

দিল না। শরবন নিস্তব্ধ। শরবনের সাদা ফুলের ওপর বিদায়ী সূর্যের রক্তিম আভা এসে পড়েছে। আমি ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম, তারপর ছুটতে লাগলাম কেয়ামাশোভাসিং স্টেশনের দিকে। রাত সাড়ে আটটার ট্রেন ধরতে পারলে নারোয়াল পৌঁছে লাহোরের ট্রেন ধরতে পারবো। লাহোরে আমার বাবা থাকেন।

প্রায় পৌনে এক ঘন্টা ছোটার পর যখন স্টেশনে পৌঁছলাম, অন্ধকার তখন গাঢ় হয়ে উঠেছে। স্টেশনের কাছে বিশাল এক বটগাছ। মাটির দিকে নেমে এসেছে অসংখ্য তার ডালপালা। অন্ধকার এখানে আরো গাঢ়, ভয়াবহ। মৃত্যুর কালো পর্দা যেন ঝুলছে আমার চোখের সামনে। উপায় নেই তাই সাহস করে এগিয়ে গেলাম। আর তখনই বটগাছের অন্ধকার থেকে একটি ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এসে পিছন থেকে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমি এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পিছন ঘুরতেই দেখলাম, ছায়ামূর্তি আর কেউ নয়, শাঁদা। উদ্‌ভ্রান্তের মতো তার চেহারা। শাড়ি, ব্লাউজ এখানে সেখানে ছেঁড়া, পায়ে জুতো নেই। তখনও সে হাঁপাচ্ছে। সেইভাবেই এক নিঃশ্বাসে সে বলে ফেললো,—তোফায়েলের সঙ্গে কথা হয়েছে, ও তোমাকে নিরাপদে লাহোর পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।

—তুমি কি করে নিশ্চিন্ত হলে যে তোফায়েল আমাকে মেরে ফেলবে না?

—না মারবে না। যদিও তোফায়েল আর সে তোফায়েল নেই তবু বলছি সে তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। আমি ওকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছি। তুমি নিরাপদে লাহোরে পৌঁছেছ এই মর্মে তোমার লেখা চিঠি দেখালে আমি কথা দিয়েছি ওর প্রাণের বন্ধু আফতাবকে বিয়ে করবো। আফতাব অনেকদিন থেকেই আমার পিছনে ঘুর ঘুর করছে। আমি তোফায়েলকে বলেছি যদি ও তোমার চিঠি আমাকে না দেখাতে পারে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজেকে শেষ করে ফেলবো।

অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলে ফেলে ও হাঁপাচ্ছিল। একটু পরে

নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত স্বরে বলল,—এখন তুমি যাও।

আমি বললাম,—তোফায়েল কোথায়?

—সামনের স্টেশনে ও তোমার সঙ্গে দেখা করবে।

অনুভব করলাম, আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতাই যেন আমার নেই। আমি বসে পড়লাম শাঁদার পায়ের কাছে। ওর পা জড়িয়ে ধরলাম। শরবনে বিদায় নেবার সময় আমার চোখে এক কোঁটা জল ছিল না। সেদিন শাঁদাই কেঁদেছিল। আর আজ আমার চোখে জল। অঝোরে ঝরছে।

অমি বললাম,—না শাঁদা, আমি যাব না। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারবো না। আমি এখানেই থাকবো।

শাঁদা শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বলল,—ওঠো বৈজনাথ। এ ভাবে চোখের জল ফেললে হবে না। তোমার দায়িত্ব অনেক। তোমার স্ত্রী আছে, ছেলে-মেয়ে আছে, মা-বাবা, ভাই-বোন আছে। সব্বাইকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার।

—সব্বাই জাহান্নামে যাক, আমি কারোকে চাই না। আমি চাই শুধু তোমাকে। আর তার জন্যে আমি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে তোমাকে বিয়ে করে এখানেই থাকবো।

—তাহলে আমি তোমাকে আর শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারব না।

শাঁদা কোমল কণ্ঠে কথা ক'টি বলে আমার হাত ধরে মাটি থেকে ওঠাল। আবেগভরে সে আমাকে তার বুকের মধ্যে টেনে নিল। তার নরম হাত দিয়ে সে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিল। দু'চোখ তখন তার জলে ভরে উঠেছে। জলভরা তার চোখের ভাষায় সে যেন আমাকে বলল,—এসো, আজ শেষবারের মতো তোমার চোখের জল মুছিয়ে দিই। আর তো কোনোদিন তোমার চোখের জলে আমার হাত ভিজবে না। সারা জীবন তোমার জন্যে আমি কাঁদব, আমার জন্যে তুমি কাঁদবে—এই তো আমাদের ভাগ্যের অমোঘ বিধান। আমাদের চোখের জল সাত সমুদ্র হয়ে দুজনের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করবে। কিন্তু এও জানি ব্যবধান যতই দুস্তর হোক, যত দূরেই

আমরা থাকি না কেন আমাদের এ প্রেম মৃত্যুহীন। জীবনের প্রতিটি মধুর মুহূর্তে তোমাকে আমি স্মরণ করবো। সন্ধ্যায় যখন আমার স্বামীকে আমি গরম খাবার খেতে দেব তখন তোমার কথা আমার মনে পড়বে। রাতে যখন আমার শিশুকে বুকে জড়িয়ে ঘুমপাড়ানি গান গাইব তখনও তোমার কথা আমার মনে পড়বে। আর যখন জীবনের সব কাজ শেষ হয়ে যাবে, মৃত্যু যখন শেষবারের মতো আমার চোখের আলো ছিনিয়ে নিতে আসবে তখনও আমি তোমাকে স্মরণ করবো। আমার শেষ নিঃশ্বাসে, হৃদয়ের অন্তিম স্পন্দনে, ঠোঁটের শেষ কম্পনে তোমার নামই উচ্চারণ করবো আমি। আমার আত্মার গভীরে লেখা থাকবে তোমারই নাম।

শাঁদা আজ স্মৃতিকে মহীয়ান করে তুলতে চাইছে যেন স্মৃতিই সত্য। স্মৃতি যদি সর্বশক্তিমান হতো তাহলে পৃথিবীতে গরীব থাকতো না, প্রেমের জন্যেও কারুকে রিক্ত হতে হতো না। শাঁদাই একথা একদিন আমাকে বলেছিল। আজ আর সে কথা ওকে মনে করিয়ে দিতে মন চাইল না। বরং ওকে সময় দিলাম আমার চোখের জল মুছিয়ে দেবার। ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। শেষবারের মতো ওর ঠোঁটে আমার চুম্বন এঁকে দিলাম। তারপর মুহূর্তের মধ্যে আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে স্টেশনের দিকে দৌড়তে শুরু করলাম কারণ—গাড়ির সিগন্যাল পড়ে গিয়েছিল।

স্টেশনের সিঁড়িতে উঠতে উঠতে পিছন ফিরে তাকালাম একবার। দেখলাম অন্ধকারে ছায়ার মতো শাঁদা নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে। দূরে লাল-গাঁও থেকে ঢোলের আওয়াজ ভেসে আসছে। আর আমাদের প্রিয় শরবন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

দুই

লাহোর স্টেশনে পৌঁছে তোফায়েল আমাকে বলল,—শুয়োরের বাচ্চা বামুন, ভাগ্য ভালো তোর, খুব বেঁচে গেলি। শাঁদা যদি আমাকে কসম না খাওয়াতো তো তোকে ট্রেনের মধ্যেই শেষ করে দিতাম। নে এবার এই কাগজখানায় লিখে দে যে নিরাপদে লাহোরে পৌঁছেছিস; আজে বাজে কথা লিখবি না, তাহলে ঘাড়ে আর মাথা থাকবে না।

ভয় করছিল আমার। তোফায়েলের আদেশ অনুসারে লিখলাম। —শাঁদা, তোমার ভাই আমাকে লাহোরে নিরাপদে পৌঁছে দিয়েছে। যতদিন বেঁচে থাকবো তোমার উপকার কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবো। ইতি বৈজনাথ।

তোফায়েল শেষ লাইনটা কেটে দিয়ে বলল,—এ সব লেখার কি দরকার? তারপর কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে আমাকে ধমক দিয়ে বলল,—যা পালা এখান থেকে, দূর হ আমার চোখের সামনে থেকে। বামুন কুত্তা, তোকে দেখে আমার মাথায় খুন চেপে যাচ্ছে।

বিন্দুমাত্র দেরি না করে আমি তোফায়েলের কাছ থেকে সরে এলাম। স্টেশনের বাইরে এসে একটা টাঙ্গা নিলাম। আমি শাহ-আলমিতে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু টাঙ্গাওয়ালা আমাকে শাহআলমির ফটকের কাছে নামিয়ে দিল। ভেতরে যেতে সে চাইল না। হেঁটে সয়র কি বান্দার গলি পেরিয়ে আমাদের বাড়ি সুতরমণ্ডীর দিকে এগোলাম। রাস্তায় একটি ছেলে আমাকে অনুসরণ করছিল। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম।

ছেলেটিকে বললাম,—আমি যে একলা ঘুরে বেড়াচ্ছি তাতেই তোমার বোঝা উচিত ছিল যে আমিও তৈরি।

ছেলেটি সরে পড়ল। আমিও বাড়ির দিকে এগোতে থাকলাম।

বাড়ির সামনে পৌঁছে দেখি দরজায় তালা লাগানো। তার মানে বাড়িতে কেউ নেই। বাবা, মা, ভাই, বোন কোথায় গেছে জানা সম্ভব নয় কারণ আশপাশের সব বাড়ির দরজাতেই তালা ঝুলছে। কাকে জিজ্ঞেস করবো? মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করছে আমাদের এই পাড়া। আমার মাথায় বাজ ভেঙে পড়লো। এখন কোথায় যাই? কার কাছে আশ্রয় চাইবো? তৃষ্ণায় আমার বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে এমনই পোড়া কপাল যে চোখে জলও আসছে না। তবু তো জিভটা ভেজাতে পারতাম। গলা শুকিয়ে কাঠ। কাছে পিঠে কোথাও জল নেই। দিশেহারার মতো খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ ঘুরলাম। তারপর গলির মধ্যে রাবিশের স্তূপ থেকে একটা ইটের টুকরো তুলে নিলাম। তালা ভেঙে বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলাম। গুলির শব্দ, পটকা ফাটার শব্দ দূর থেকে ভেসে আসছে।

শূন্য বাড়ি। মানুষ নেই, জিনিসপত্তরও নেই। দামী ও দরকারী জিনিসপত্তর কিছুই নেই। এঘর ওঘর ঘুরে রান্নাঘরে ঢুকলাম। রান্নাঘরে বাসনপত্র রয়েছে কিন্তু খাবারের একটি দানাও নেই। কল খুলে পেট ভরে জল খেলাম। অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে। খাটের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়লাম।

দুর্বিষহ একটা রাত কাটালাম। প্রায় জেগেই। মাঝে মাঝে দু'একবার ঘুমিয়েও পড়েছিলাম। কখনো নৈঃশব্দ এতই গভীর যে মনে হচ্ছিল এই শহরে আমি ছাড়া আর একটি মানুষও বেঁচে নেই। আবার কখনো কানে তালা লেগে যাবার মতো চিৎকার। মানুষের আর্তনাদ। মনে হচ্ছিল কসাইখানায় ছাগল কাটা হচ্ছে। আবার স্তব্ধতা। কখনো গুলি আর পটকার শব্দে রাত্রির স্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে পড়ছে, তারপরই আবার শ্মশানের নিস্তব্ধতা।

একদিন একরাত এইভাবে লুকিয়ে রইলাম। কিন্তু আর পারা গেল না। খিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠলাম। বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। হাঁটতে লাগলাম। সুতরমুণ্ডী থেকে লোহারি গেট, লোহারি গেট থেকে ভাটি গেট, ভাটি গেট থেকে বাদশাহী মসজিদের

দিকে চলে এলাম। সুদীর্ঘ পথে কোথাও বিপদের সম্মুখীন হলাম না। কেন যে বাদশাহী মসজিদের দিকে এলাম তা আমি জানি না। ওখান থেকে গেলাম হীরামুণ্ডী।

হীরামুণ্ডীতে আনোয়ার কাবাবওয়ালার দোকানে গিয়ে বসলাম। কাবাব কিনে খেতে শুরু করলাম। আনোয়ার আমার পরিচিত। সে আমাকে চিনতে পারলে। এবং অবাক হলো। সে আমাকে চোখ টিপে কিছু বলতে চাইলো। মুখে কিছু বলল না কারণ কয়েকজন মস্তানগোছের মুসলমান তখন কাবাব কিনছিল। ওরা চলে গেলে সে সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বলল,—পণ্ডিতজী, আপনি এখানে কেন? খোদার কসম, আপনি এখনই এখান থেকে চলে যান।

হতাশা ভেঙে পড়লো আমার গলায়। বললাম,—কোথায় যাবো?

আনোয়ার বলল,—তাই তো, কোথায় যাবেন। আনোয়ারকে চিন্তান্বিত দেখালো। একটু পরেই অবশ্য ওর মুখে হাসি দেখা দিল। বলল,—আপনার বন্ধু মির্যা, হাজি আর বরক তাজীর বাড়িতে গান শুনতে গেছে। আপনি ওখানে চলে যান।

মির্যার নাম শুনেই খুশিতে আমি আনোয়ারের সঙ্গে করমর্দন করে দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার বোধহয় মাথার ঠিক ছিল না, নইলে এই বিপদের সময়ে মির্যার কথা আমার মনে পড়া উচিত ছিল। মির্যা আমার প্রিয় বন্ধু। হাজী বরকও বন্ধু হবে মির্যার মতো নয়। ও আমার প্রাণের বন্ধু। মির্যা হাজী ও বরকের সঙ্গে কত রাতে কত যে আড্ডা দিয়েছি।

তাজীর বাড়ির পিছন দিককার সিঁড়ি দিয়ে সোজা দোতলায় উঠে গেলাম। তাজীর কামরায় ঢুকে দেখি মির্যা, হাজী আর বরক বসে আছে আর তাজী খুব সেজেগুজে গান গাইছে। তাজীর সঙ্গে চোখা-চোখি হতেই ওর মুখ সাদা হয়ে গেল। হাজীর মুখও যেন রক্তশূন্য ফ্যাকাসে দেখাল কিন্তু মির্যা উঠে এসে একগাল হেসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। বরকও উঠে এল। সে আমার হাত ধরে বসিয়ে দিল ফরাসে।

মির্জা জিজ্ঞেস করল,—কোত্থেকে আসছেন ?

আমি লালগাঁও থেকে এখানে আসা অব্দি সব কাহিনী বললাম।

ভাজী বলল,—পণ্ডিতজীকে এখনই এখান থেকে নিয়ে যান। কিছু ঘটে গেলে আমি দায়ী হতে পারবো না।

মির্জা তাজীর ভাইয়ের একটি লুঙ্গি ও জামা আমাকে পরে নিতে বলল। ওদের নির্দেশমতো আমি ওগুলো পরে নেবার পর সকলের সঙ্গে তাজীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। তারপর মির্জার গাড়িতে চড়ে স্টেশনের কাছে ভরতনগরে ওর বাড়িতে পৌঁছলাম। দোতলা সুন্দর বাড়ি মির্জার।

মির্জার স্ত্রীকে নমস্কার জানাতে উনি কেমন হকচকিয়ে গেলেন। যেন ভূত দেখছেন। আমার নমস্কারের বিনিময়ে কিছুই বললেন না, শুধুই তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। মনে হলো উনি আমাকে দেখছেন না, দেখছেন কোনো মৃত মানুষকে। আমার কাছে ওঁর আচরণ অদ্ভুত ঠেকলো। দশ বছর আমি ও মির্জা মেটাল কোম্পানীতে কাজ করেছি। সম্প্রতি আমি পাবলিশিং কোম্পানী খুললেও আমাদের দুজনের সম্পর্ক এতটুকু নড়চড় হয়নি। শুধু আমাদের দুজনের মধ্যেই নয়, আমাদের দুই বাড়ির মধ্যেও একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। সুখে-দুঃখে, উৎসবে-অনুষ্ঠানে আমরা পরস্পরের পাশে আত্মীয়ের মতো এসে দাঁড়িয়েছি। তাই আজ ভাবীর এমন নির্লিপ্ত অনাত্মীয়সুলভ ব্যবহার আমাকে দারুণভাবে আহত করলো। তবু দুঃখ চেপে মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করলাম। মির্জা আমাকে ওর ড্রইংরুমে নিয়ে গেল। হাজী ও বরকতও সঙ্গে রয়েছে।

ড্রইংরুমে এসে মির্জা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো। আমার জামা-কাপড়ের বোঁচকটা টেবিলের ওপর রেখে বলল,—আপনার ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমি তাজ্জব বনে গেছি। এই সময়ে কেউ লাহোরে আসে? যখন পাড়ায় পাড়ায় খুনের রং খেলা হচ্ছে; হিন্দু মুসলমানকে, মুসলমান হিন্দুকে খুন করার জন্যে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন এখানে না এলেই ভালো করতেন।

আমি বললাম,—বন্ধু, ওসব কথা আর তুলবেন না। হিন্দু-মুসলমানের কথা অনেক শুনেছি আর শুনতে চাই না। আপনি বরং মদ নিয়ে আসুন, আড্ডা জমানো যাক :

আমার কথা শুনে মির্যা হুইস্কির বোতল নিয়ে এল। আমরা সবাই গ্লাস নিয়ে বসলাম। বহুদিন এইভাবে আমরা আড্ডা জমিয়েছি। একসঙ্গে পান করেছি, গান করেছি, কত ফুর্তি করেছি। আজ কিন্তু আড্ডা মোটেই জমছে না। পরিচিত মানুষ, পরিচিত পরিবেশ, উপাদান সবই আছে, নেই শুধু প্রাণ। কেউ-ই স্বাভাবিক মেজাজে নেই। কথা বলছি কিন্তু সবই ছাড়া ছাড়া, কেমন যেন অর্থহীন। এককালে আমি ভালো গান করতাম। মির্যা আমাকে গান ধরতে বলল। শুরু করেই থেমে গেলাম। বেসুরো লাগলো কানে। হাজী মাঝে মাঝেই এমন ভাবে তাকাচ্ছিল আমার দিকে, মনে হচ্ছিল সে যেন আমার গলার সামনে ছুরি তুলে ধরেছে। হতে পারে আমার দেখার ভুল। হাজীও আমার বন্ধু কিন্তু ওর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠতে পারেনি। দু'জনের মাঝে একটা অদৃশ্য পাঁচিল ছিল। বরকের সঙ্গে কিন্তু সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল।

মদের মাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজীর ঠোঁটে কেমন একটা রহস্যময় হাসি ফুটে উঠছিল। আমি অস্বস্তি অনুভব করছিলাম। নিজেকে বোঝাতে চাইলাম, আমারই দেখার ভুল। হাজী আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু না হলেও তার সঙ্গে আমার কোনদিন ঝগড়া হয়নি। কোনদিন সে আমাকে একটিও বাজে কথা বলেনি। তবে সে আমাকে ঈর্ষা করতো। তার কারণ মির্যার প্রথম বন্ধু আমি। সবাই চাইতো মির্যার অন্তরঙ্গ বন্ধু হতে। মির্যার সরলতা, তার ঐশ্বর্য এবং দরাজ হাতে খরচের মেজাজ, প্রাণখোলা অন্তরের জন্যে সবাই চাইতো ওকে জয় করতে। মির্যা বন্ধুদের মধ্যে আমাকেই সবচাইতে ভালোবাসতো। এই কারণেই হাজী ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরতো, আমাকে ভালো চোখে দেখতে পারতো না। বরক ও অন্যান্যরা কিন্তু এটাকে মেনে নিয়েছিল। হাজী মানতে পারেনি।

রাত দশটায় সময় হাজী উঠে পড়লো। তার নাকি কী একটা জরুরী কাজ রয়েছে। মির্যা অনুরোধ করলো রাতে খাবার খেয়ে যাবার জন্যে কিন্তু কাজটা এমনই জরুরী যে সে আর অপেক্ষা করতে চাইলো না। বরক বলল তারও কাজ আছে, সুতরাং সেও উঠে পড়ল।

ওরা চলে যাবার পর মির্যা, ভাবী, আমি ও ওঁদের দুটি শিশু সন্তান তারিক ও তাসনিম রাতের খাওয়া সেরে নিলাম। তারিকের বয়স আট ও তাসনিমের বয়স ছয়। খাবার পর তারিক ও তাসনিমকে আমি গল্প শোনাতে লাগলাম। ওরা আমাকে চাচা বলে ডাকে। গল্প শুনতে শুনতে ওরা দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়লো। মির্যা ওদের শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়ে এলো। মির্যা স্ত্রীকে বলল,—আজ আমি বৈজনাথের সঙ্গে ওপরের ঘরে শোবো।

মির্যার স্ত্রী কিছু বলল না। আমরা ওপরের ঘরে চলে এলাম।

পর পর কয়েকটা রাত ঘুম হয়নি। বিছানায় শোবার পরই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যেই বোধহয় শুনতে পাচ্ছিলাম মির্যার বাড়ির দরজা কারা যেন ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছে। স্বপ্ন না সত্যি ঠিক জানি না। শুনতে পাচ্ছিলাম কারা যেন অস্ফুটস্বরে কি সব বলছে। কান্নার শব্দও শুনতে পেলাম। বোধহয় স্বপ্ন নয়, সবই বাস্তব। ঘুম ভেঙে গেল। আমি উঠে বসলাম। দেখলাম ঘরে মির্যা নেই, ওর বিছানা খালি পড়ে আছে। বাথরুমের দরজা খুলে দেখলাম। না সেখানেও মির্যা নেই। খুব সাবধানে ভেজানো দরজা খুললাম যাতে একটুও শব্দ না হয়। তারপর খালি পায়ে সন্তর্পণে সিঁড়ির ওপর এসে দাঁড়ালাম। থমথমে নিস্তব্ধ পরিবেশ, শুধু দু'জনের নিচুস্বরে কথাবার্তার শব্দ একতলার ঘর থেকে ভেসে আসছে। পা টিপে টিপে নিঃশব্দে নিচে নেমে এলাম। যে ঘরে মির্যা স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছে তার দেয়ালের সঙ্গে মিশে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। ওদের কথা শুনতে লাগলাম।

—এখানে ওকে রাখা চলবে না।

—আমি কি ওকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে এসেছি এখানে? নিজে থেকে এলে তাড়িয়ে দিই কি করে?

—ওসব আমি জানি না, কোনো কৈফিয়ৎ শুনতে চাই না আমি। এখনই ওকে গুণ্ডাদের হাতে তুলে দাও। এই আমার শেষ কথা।

—এতদিনকার বন্ধুত্বকে এভাবে শেষ করে দেব? মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দেব?

মির্যার স্ত্রী চিৎকার করে বলল,—এ ছাড়া কোন উপায় নেই। তুমি যদি ওকে গুণ্ডাদের হাতে তুলে না দিতে পারো তাহলে আমিই ওকে খুন করবো।

মির্যার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর মানবীর মতো নয় মোটেই। আমি যেন মানসচক্ষে দেখতে পেলাম বড় বড় নখগুলো হাত নেড়ে এক ডাইনী মির্যাকে ধমকাচ্ছে। আবার তার ধমক শুনতে পেলাম,—যাও এখনই ওকে গুণ্ডাদের হাতে তুলে দিয়ে এসো।

দেরাজ খোলার শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হলো মির্যা দেরাজ খুলে কিছু বার করছে। আমি দ্রুত পায়ে নিঃশব্দে উপরে উঠে এলাম। দরজা সামান্য ভেজিয়ে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আমার হৃৎপিণ্ড দ্রুত ওঠানামা করছিল। পায়ের খসখস শব্দ শুনে ভয় পেলাম। মনে হলো কে যেন আমার মাথার কাছে পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে। এখনই আমাকে শেষ করে দেবে। না, শব্দটা মির্যার পায়ের। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম মির্যা অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। তার হাতে বোধহয় পিস্তল। ভয় যেন আমার গলা টিপে ধরেছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। মির্যা দরজার হাতল ঘুরিয়ে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল।

আমি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। আলো জ্বাললাম না। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে দরজার কাছে গেলাম। দরজা খোলার চেষ্টা করলাম। খুললো না। বুঝলাম মির্যা বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, খোলা যাবে না। দেশলাই জ্বালার শব্দ শুনতে পেলাম। বোধহয় মির্যা সিগারেট ধরাচ্ছে। একটু পরে মির্যার হাত থেকে

পিস্তলটা পড়ে গেল। বোধহয় ওর হাত কাঁপছে। আমি ভাবলাম মির্ঁা বোধহয় এখানে পিস্তল নিয়ে পাহাড়া দিচ্ছে, গুণ্ডারা এলে আমাকে তাদের হাতে তুলে দেবে। সারারাত মির্ঁা পায়চারি করলো আর ঘরের মধ্যে আমি জেগে বসে রইলাম। এ অবস্থায় ঘুমনো সম্ভব নয়। ভোরের আলো ফুটতে মির্ঁা দরজা খুলে ভিতরে এল। আমি চোখ বন্ধ করে ঘুমের ভান করে শুয়ে রইলাম। মির্ঁা আমাকে ধাক্কা দিয়ে বলল,—উঠুন, বাইরে যেতে হবে।

যেন কিছুই জানি না এমন ভাব করে বললাম,—কি হয়েছে মির্ঁা?

—বাইরে যেতে হবে।

—কোথায়?

—পরে জানতে পারবেন, এখন উঠুন।

—একটু দাঁড়ান। আমি একটু চোখে মুখে জল দিয়ে নিই।

—না, না, সময় নেই। যে ভাবে আছেন সেই ভাবেই চলুন।

তাড়াতাড়ি লুঙ্গি ছেড়ে নিজের জামাকাপড় পরে নিলাম। নিচে নেমে এলাম। ভাবীকে নমস্কার জানালাম। উনি কিছু বললেন না। চোখ দুটি জবাফুলের মতো লাল। থমথমে মুখ।

মির্ঁার অনুসরণ করে হাডসন গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। দু' পাশের কাঁচ বন্ধ। মির্ঁা ড্রাইভ করছে। একটিও কথা বলল না। কাল রাতে যে মির্ঁাকে দেখেছিলাম, আজ তাকে চেনাই যাচ্ছে না। থমথমে কঠিন মুখের চেহারা। কথা বলার ইচ্ছাও আমি হারিয়ে ফেললাম। তবু একবার প্রশ্ন করলাম,—আমরা কোথায় যাচ্ছি?

—লাহোর রেলওয়ে স্টেশনে।

—সেখানে গিয়ে আমি কি করবো? এই নিদারুণ বিপদের সময়ে আমি তোমার আশ্রয়ে থাকতে চেয়েছিলাম।

—তা সম্ভব নয়। আমি অসহায়। আমার বাড়িতে আপনাকে রাখা কোনোমতেই সম্ভব নয়।

স্টেশনের গাড়িবারান্দার নিচে এসে গাড়ি থামালো মির্ঁা।

আমরা দু'জন তাড়াতাড়ি নেমে এলাম। প্লাটফরমে উঠে আসার পর মির্যা আমার হাতে তিনশো টাকা ধরিয়ে দিয়ে বলল,—আপনি ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসুন, আর বলুন আপনি কোথায় যেতে চান, আমি টিকিট নিয়ে আসছি।

আমি বললাম,—লাহোর ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। লাহোর আমার দেশ, আমার জন্মভূমি।

মির্যা বলল,—সবই জানি কিন্তু পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। এখানে আপনি থাকতে পারবেন না। আপনার স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা, মা-বাবা-ভাই-বোন সবাই বোধহয় আপনাদের গ্রামের বাড়িতে চলে গেছেন। আপনি ওখানেই যান।

—কিন্তু মির্যা, এখানেই আমি ছোট থেকে বড় হয়েছি, আমার বন্ধুবান্ধব, ব্যবসা সবই লাহোরে। লাহোরকে আমি ভালোবাসি বন্ধু।

—ভালোবাসাতেও বিচ্ছেদ আসে।

মির্যার নির্বিকার ভাব দেখে, প্রাণহীন কথাবার্তা শুনে রাগে দুঃখে আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম। বললাম,—আমি ভাবতেও পারিনি আপনি এত নীচ, বিশ্বাসঘাতক। কাল রাতে ভাবী আপনাকে বলছিল, আমাকে গুণ্ডাদের হাতে তুলে দিতে। আমি নিজের কানে শুনেছি সে সব কথা। ছিঃ ছিঃ এত ছোট মন আপনাদের?

বিষণ্ণ, ক্লান্ত ভঙ্গিতে মির্যা বলল,—বোধহয় আমার তাই-ই করা উচিত ছিল। তাহলে একজন আহাম্মককে নিয়ে আমাকে এমন বিব্রত হতে হতো না।

—কেন, আমার মধ্যে আহাম্মকের কি লক্ষণ দেখলেন?

—আপনি কিছুই জানেন না, তাই আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছেন। কাল রাতে হাজী আর বরক আমার বাড়িতে গুণ্ডা পাঠিয়েছিল। তারা আপনাকে ওদের হাতে তুলে দিতে বলছিল। আমি সাময়িকভাবে ওদের ঠেকিয়েছি। বলেছি, কাল সকালে আমি আপনাকে জীবিত অথবা মৃত ওদের হাতে তুলে দেব। ওরা জামিনস্বরূপ আমার ছেলে-

মেয়েকে তুলে নিয়ে গেছে।

—তারিক আর তাসনিমকে?

—হ্যাঁ। ওদের সন্দেহ হয়েছিল আমি হয়তো আপনাকে ধরিয়ে দেব না, তাই ক্ষতিপূরণ বাবদ···

মির্যা চোখের জল গোপন করার জন্যে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

আমি আর্তনাদ করে উঠলাম। চিৎকার করে বললাম,—না, না, মির্যা এ হতে পারে না। আমি মির্যার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললাম। বললাম,—আমাকে আপনি গুণ্ডাদের হাতে তুলে দিন।

মির্যা কাঁপছিল। কিছু বলার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। আমার মনে হলো ও বোধহয় এক্ষুনি কান্নায় ভেঙে পড়বে। হঠাৎ-ই মির্যা পা ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে ওর গাড়িতে গিয়ে উঠলো। আমি নিজেকে সামলে নিয়ে দৌড়লাম মির্যার গাড়ির দিকে কিন্তু ততক্ষণে মির্যার গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। আমার চোখের সামনে দিয়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি শ্লথ শরীরটাকে টানতে টানতে স্টেশনে ফিরে এলাম। নিজেকে প্রবোধ দিলাম গুণ্ডারা হয়তো তারিক আর তাসনিমকে হত্যা করবে না। একজন হিন্দুর প্রাণের বিনিময়ে মুসলমান হয়ে দুটি মুসলমান শিশুকে কি ওরা হত্যা করবে? কি জানি, এখন তো আর মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই। এখন সবই সম্ভব। আমার চিন্তাশক্তি আর কাজ করছিল না। ভাবছিলাম শুধু, কোথায় যাবো? আমার পরিবারের সব কোথায় আছে কে জানে? ভাবতে ভাবতে ফার্স্ট ক্লাসের রেস্তোরাঁর দিকে এগোচ্ছিলাম, এমন সময় কে যেন কাঁধের ওপর হাত রেখে বলল,—আরে পণ্ডিতজী আপনি এখানে! কোত্থেকে এলেন?

চিনলাম, আমার পুরনো বন্ধু শাহেদ।

শাহেদ লাহোর স্টেশনের টি. টি.। শাহেদের চোখে মুখে অনেক-দিন পরে বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুশি উপচে পড়ছে। ওর চোখে খুশির ঝলক দেখে খুশি হলাম কিন্তু এই পরিস্থিতিতে "পণ্ডিতজী"

ডাক শুনে আতঙ্কিত হলাম। ভাগ্যিস কাছে পিঠে কেউ নেই। আমি ইশারায় শাহেদকে বললাম ও নামে আমাকে আর ডাকবেন না। শাহেদ বুঝলো এবং লজ্জিত হলো। অনেকবার সে আমার কাছে ক্ষমা চাইলো। শাহেদ আমাকে ওর নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়ালো। চা খেতে খেতে জানতে চাইলো, আমি কোথায় এসেছিলাম কোথায় যাব এখন।

বললাম,—এসেছিলাম নিজের বাড়িতে। গিয়ে দেখলাম সবাই কোথাও পালিয়ে গেছে। তারপর গিয়েছিলাম এক বন্ধুর বাড়িতে, ভেবেছিলাম সেখানে আশ্রয় পাবো। তা আর হলো না, মাঝখান থেকে বন্ধুকে চরম বিপদের মধ্যে ফেলে এসেছি। মির্যাঁর বাড়ি যাওয়ার পর থেকে সব ঘটনা বললাম। তারপর বললাম, ভাবছি আমাদের গ্রামের বাড়িতে যাব, হয়তো ওখানে আমাদের পরিবারের সকলের সঙ্গে দেখা হতে পারে।

শাহেদ জানতে চাইল কোথায় আমাদের গ্রাম। বললাম,—কোটালিসুদকায়।

—ওটা কোন্ জেলায়?

—সৌরদাসপুর জেলায়, সকরগড়ের কাছে।

—ও, তাহলে তো আপনাকে নারুয়াল হয়ে যেতে হবে। সে গাড়ি তো এখনই ছাড়বে। ঠিক আছে আপনি এখানে বসে থাকুন, আমি টিকিট কেটে নিয়ে আসছি।

শাহেদ একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে পড়লো।

শাহেদ আমাকে গাড়িতে তুলে দিল। ট্রেন ছাড়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলো। ট্রেন ছাড়তেই সে আমাকে শুভেচ্ছা জানাল।

গাড়ি পাঞ্জাবের দিকে চলতেই পাঞ্জাবী গানের দুটি কলি আমার মনে পড়ে গেল। পাঞ্জাবের এক বৃদ্ধ কৃষকের দু'টি অশ্রুসজল চোখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

"গাড্ডি আই-ই গাড্ডি আই-ই
নারুয়াল দি।

বুডচার দি দাড়ি ওয়াচ
আগ বাল দি ॥"

আমার দু'চোখ জলে ভরে উঠলো। মনে হলো পাঞ্জাব যেন এক বৃদ্ধের রূপ নিয়ে আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে এক বৃদ্ধ কৃষাণ, সাদা দাড়ি। শয়তানের চেলারা তার সাদা দাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। পাঞ্জাব জ্বলছে। পাঞ্জাবের অতীত, তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, শিক্ষাদীক্ষা, মানবিকতার আদর্শ—সব জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। সেই বুড়ো দাড়িওয়ালা অসহায় পাঞ্জাবী চোখের জল মুছছে আর কাতর কণ্ঠে বলছে,

গাড্ডি আঈয়ি, গাড্ডি আয়ি
নারুয়াল দি।
বুডচার দি দাড়ি ওয়াচ
আগ বাল দি।

—নারুয়াল থেকে গাড়ি এসেছে, বুড়োর দাড়িতে দ্যাখো আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

তিন

নারুয়াল জংশন স্টেশন পেরিয়ে গাড়ি পৌঁছলো দরবার শাহ করতারপুর স্টেশনে। আমি গাড়ি থেকে নেমে এলাম। এবার হাঁটাপথ। আমাদের গ্রাম কোটালিসুদকা প্রায় দেড় মাইল দূরে। আমি মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। পায়ে হাঁটা পথের একদিকে হলুদ আর অন্যদিকে সবুজ খেত। হলুদ আর সবুজ, কী রঙের বাহার; চোখ জুড়োনো দৃশ্য! টিলার ওপর, ঝোপঝাড়ে গরু মোষ কোথাও বা বিশ্রাম নিচ্ছে, কোথাও ঘুরে ঘুরে ঘাস খাচ্ছে। রঙের সমারোহের মধ্যে দূর দিগন্তে সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে। অনেক দূর থেকে জাট

কৃষকদের গান ভেসে আসছিল। কী মনোরম পরিবেশ। অন্য সময় হলে এই পরিবেশে আমি জেগে উঠতাম, আনন্দে ভরে যেতো মন। কিন্তু আজ আমার কিছুই ভালো লাগছে না। না আছে দেখার চোখ, না আছে উপলব্ধির মন। আমার জামা-কাপড় ময়লা, দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। জামাকাপড় এখানে-সেখানে ছিঁড়ে গেছে। কতদিন দাড়ি কামানো হয়নি। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তার চেয়েও বড় কথা বুকের মধ্যে জমাট অন্ধকার, ক্ষতবিক্ষত অন্তরাত্মার অব্যক্ত আর্তনাদ। সব মিলিয়ে তিক্ততায় ভরে গেছে আমার মন। সবুজের সমারোহ আমার কাছে বীভৎস লাগছে। বিশ্রামরত প্রাণীগুলিকে দেখে মনে হচ্ছে ওরাও আমারই মতো ক্লান্ত, অবসন্ন। জাটি কৃষকদের গানের মধ্যে যেন গভীর দুঃখ ও হতাশার সুর।

এই সময় আমার মাথার উপর দিয়ে একঝাঁক রাজহাঁস তাদের শ্বেতশুভ্র পাখা মেলে উড়ে গেল। ওদের দেখে মনে হলো ওরা কত সুখী। একটা দীর্ঘশ্বাস আমার বুক নিঙড়িয়ে বেরিয়ে এল। হায়, আমি যদি ওদের মতো হতে পারতাম! আমার দু'চোখ জলে ভরে উঠলো। হঠাৎ আমার কী যে হলো, আমি ওদের কাছে আমার মনের বাসনা জানালাম।

শ্বেতপক্ষ রাজহাঁসের দলকে আহ্বান করে বললাম,- তোমরা যেখানে উড়ে যাচ্ছো সেখানে আমাকেও নিয়ে চলো। লোকালয় থেকে দূরে, বহুদূরে কোনো এক শান্ত ঝিলের তীরে, যেখানে মৃদুমন্দ পূবালী হাওয়া পদ্মের পাপড়িকে আন্দোলিত করে যায়, যেখানে হিমশুভ্র রাজহাঁসের দল তাদের পাখায় লাবণ্য ছড়িয়ে, গ্রীবা দুলিয়ে জোড়ায় জোড়ায় ফুলেভরা ঝিলের জলে সাঁতার কাটে, আমাকে সেখানে নিয়ে চলো। যেখানে কর্ণিকার তার নুয়েপড়া ডাল থেকে থোকা থোকা হলুদ ফুল জলের ওপর ঝরঝর করে ঝরায় আমাকে সেখানে নিয়ে চলো। ওগো রাজহাঁসের দল যেখানে নানা রঙের মাছ আর পাখি রামধনুর মতো রঙ ছড়িয়ে দিচ্ছে আমাকে সেখানে নিয়ে চলো। তোমাদের বাচ্চাদের সঙ্গে সেখানে গিয়ে আমি

খেলবো, লম্বা লম্বা ঘাসের শয্যায় শুয়ে থেকে দেখবো শান্তির শ্বেত পতাকার মতো শরের ফুলগুলি বাতাসে দুলছে। শরবনের নিবিড় ছায়ায় শাঁদাকে যেমন দেখতাম, ওখানে শুয়ে সেই মধুর স্বপ্নে আমি বিভোর হয়ে থাকবো। আমার প্রাণের বন্ধুরা, অন্ধকার নীচতায় ভরা এই পৃথিবীতে তোমরা আমাকে ফেলে যেও না।

প্রিয় বন্ধুগণ, মানুষের পৃথিবী আজ নিঃসীম পাশবিকতা ও সংকীর্ণতায় ভরে গেছে। এই অন্ধকার আমাকেও স্পর্শ করেছে, সংকীর্ণতায় আমারও মন পঙ্কিল হয়ে উঠেছে। আমিও নিশ্চয় কোনো না কোনো সময়ে কারো ওপর অন্যায় আচরণ করেছি। কিন্তু মানুষে মানুষে এই যে হানাহানি এতে গোটা মানবজাতিই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই গাঢ় অন্ধকার, হীনতা, সংকীর্ণতা আমার আর সহ্য হচ্ছে না। আমি এখান থেকে পালিয়ে যেতে চাই। যেতে চাই হিংসা-দ্বেষের ঊর্ধ্বে তোমাদের সেই অবিমিশ্র সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের দেশে।

ওগো সুন্দর রাজহাস, তোমার পিঠের ওপর আমাকে বসিয়ে নাও। কতকাল আমি ঘুমইনি। ঘুমে আমার শরীর অবশ হয়ে আসছে কিন্তু নিশ্চিন্তে ঘুমোবার মতো জায়গা পাচ্ছি না। আমি তোমাদের কোমল রেশমী পালকের ওপর মুখ গুঁজে শুয়ে থাকবো। তারপর আমার সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত নিদ্রা এসে আমাকে নিয়ে যাবে স্বপ্নের দেশে।

কিন্তু রাজহাঁসের দল আমার মিনতি শুনলো না। আমার সব স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে ওরা দূর দিগন্তে মিলিয়ে গেল। আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানেই রয়ে গেলাম। বাস্তব বুদ্ধিও আমি ফিরে পেলাম। তাই নিজেকে প্রশ্ন করলাম। কি করে তুমি ভাবলে যে ওরা তোমাকে পাখায় বসিয়ে নিয়ে যাবে? এ কি কখনো সম্ভব? কিন্তু মানুষকে বোধহয় কখনো কখনো এমন আজগুবি চিন্তায় পেয়ে বসে। আর সেই ভাবনা যখন বাস্তব সত্যের আঘাতে খান খান হয়ে যায় তখন তার চোখে জল আসে। চোখের জল মুছে আমি কোটালি-

সুদকায় অর্থাৎ আমাদের গ্রামের দিকে রওনা হলাম।

এই গ্রামে আমার ঠাকুর্দার বাড়ি। বাড়ি পৌঁছে দেখলাম সেখানে আমার বাবা, মা, ভাইবোন, স্ত্রী পুত্র সকলেই আছে। সবাই আমাকে দেখে খুব খুশি হলো। ওরা ধরেই নিয়েছিল আমি হয় লালগাঁওতে অথবা লাহোরে মুসলমানের হাতে খুন হয়েছি। ঠাকুর্দা আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, অন্যেরা সবাই খুশি ছড়ানো চোখে আমাকে দেখছিল।

ঠাকুর্দা এখানকার প্রাচীন জমিদার। ছ'ফুটের ওপর লম্বা, মজবুত গড়ন, মাথায় পাকা চুল আর সাদা দাড়ি। রাশভারি প্রকৃতির মানুষ। সবাই তাঁকে সমীহ করে চলে। গ্রামের মানুষ তাঁর দাপটে কাঁপে। গ্রামে তহশীলদার, দারোগা, হাকিম থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ কারোরই ক্ষমতা নেই ঠাকুর্দার হুকুম অগ্রাহ্য করার। সমৃদ্ধিশালী জমিদার ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হিসেবে তাঁর মান মর্যাদা শুধু গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, গ্রামের বাইরেও বহু দূর বিস্তৃত।

ঠাকুর্দা ও অন্যান্যকে আমি লাহোরের অবস্থা বর্ণনা করলাম এবং কিভাবে নানান অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমি অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছি তাও বললাম। সবাইকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে এখানেও আমাদের থাকা সম্ভব হবে না। নিরাপদ কোনো অঞ্চলে এখনই চলে যাওয়া দরকার। এখানকার অবস্থা এখনো শান্ত তাই পালানোর সুবিধা আছে। দেরী করলে হয়তো পরে……।

আমি যেন আহাম্মোকের মতো একটা কথা বলে ফেলেছি, ঠাকুর্দার ধমক শুনে তাই মনে হলো। উনি উত্তেজিতভাবে বলতে থাকলেন,—কি সব আজেবাজে কথা বলছো বৈজনাথ। এ জায়গাটা যদি পাকিস্তান হয়ে যায়, হোক না, তাতে আমাদের কি? আমরা এখানকার মানুষ এখানেই থাকবো। সাতপুরুষ ধরে যেমন করে এ দেশের যশ পেয়ে আসছি, ভবিষ্যতেও তাই করবো।

আমি বললাম, মুশকিল কি জানেন দাদু, আপনারা সাতপুরুষ ধরে আরাম করেছেন আর নিজেদেরই যশগান শুনে বিভোর হয়ে

থেকেছেন। আর মুসলমান চাষীরা শুধু প্রতিকারহীন অভিযোগ জানিয়েই এসেছে। আজ তাঁদের সামনে সুযোগ এসেছে। তারা এখন বদলা নিতে চাইছে।

আমার কথা ঠাকুর্দা নস্যাৎ করে দিতে চাইলেন। গর্বোদ্ধত ভঙ্গিতে উনি বললেন,—আরে মুসলমান চাষীরা তো আমার সন্তানেরই মতো।

আমি মন্তব্য করলাম,—হাঁ, ওই ফসলকাটার সময়টুকু পর্যন্ত।

ঠাকুর্দা লাঠি নিয়ে আমাকে তেড়ে এলেন। বাবা আর দাদা মাঝখানে ঝাঁপিয়ে না পড়লে আজ আমাকে ভালোরকম মার খেতে হতো।

পরদিন বিকেলে ঠাকুর্দা দালানে চৌকিতে বসে গড়গড়ায় তামাক টানছিলেন। করিম খাঁ তাঁর পা টিপে দিচ্ছিল, ফজলু মাথা মালিশ করছিল আর আল্লাদাদ পিঠ কোমর টিপে দিচ্ছিল। আমি ঠাকুর্দার পাশ দিয়ে বাইরে যাচ্ছিলাম। উনি আমাকে দাঁড়াতে বললেন। আমি ওঁর নির্দেশ মতো দাঁড়ালাম। এখন উনি আমাকে শুনিয়ে ওদের এক এক করে প্রশ্ন করতে লাগলেন। আর ওরাও উত্তর দিতে লাগলো।

—কি রে ফজলু এখানেও গোলমাল হবে নাকি?

ফজলু বলল,—সাতপুরুষ ধরে এ গ্রামে কোনোদিন হাঙ্গামা হয়নি, আজও হবে না হুজুর।

—আল্লাদাদ, তুই কি বলিস?

আল্লাদাদ কাজ করতে করতেই বলল,—আমরা তো আপনার সন্তানের মতো হুজুর।

—করিম খাঁ, এবার তোর কথা বল্।

করিম খাঁ পা টেপা বন্ধ করে হাত কচলিয়ে বিগলিত ভঙ্গিতে বলল,—হুজুর, আমি আর কি বলবো। তবে এইটুকু জানবেন, এ গ্রামে যে হাঙ্গামা করতে আসবে তার ঘাড়ে আর মাথা থাকবে না।

ঠাকুর্দা আমার দিকে বিজয়ীর ভঙ্গিতে তাকিয়ে অর্থবহ হাসলেন।

তারপর আমাকে বললেন,—এবার তুমি যেতে পারো।

এই একগুঁয়ে বৃদ্ধকে আমার কিছু বলার ছিল না, তাই মাথা নিচু করে চলে এলাম।

এর পর আট দশদিন খুব আরামে কাটলো। দুঃসহ অভিজ্ঞতার তিক্ত স্মৃতি আমি এক সময় ভুলে গেলাম। আমার মন হাল্কা হয়ে উঠলো। সকালে টাটকা ঘোল খাই, দুপুরে রসালো আখ চিবুই। সব কাজ শেষ করে বিকেলের দিকে আমি একেবারে মুক্ত। তখন আর আমাকে কে পায়! আমি তখন চলে যাই দূরের কোনো পুকুরের ধারে। শাহতুঁত গাছের নিবিড় ছায়ার নিচে বসে ঠাকুর্দার মজুরদের সঙ্গে তাস খেলি। সঙ্গে নিয়ে যাই আমার ছোট ছেলে মুন্নাকে। এই ক'দিনে ও আমার খুব ন্যাওটা হয়ে গিয়েছে। আমি যখন তাস খেলি, ও তখন আমার কোলে বসে নিজের ভাষায় বক্‌বক্‌ করে। কখনো তাস তুলে নিয়ে মুখে পুরে ছায়, আর লাল ফেলে ফেলে আমার জামার হাতা ভিজিয়ে ছায়। বেশ গোলগাল সুন্দর স্বাস্থ্য ওর। মুন্নাকে কোলে নিয়ে শাহতুঁত গাছের ঘন ছায়ার নিচে বসে যখন তাস খেলতাম তখন জীবনটাকে মনে হতো আকাশে ভেসে বেড়ানো একখণ্ড হাল্কা মেঘের মতো।

একুশে আগস্টের সন্ধ্যা। বাড়ির মেয়েরা তখন রান্নাবান্নায় ব্যস্ত। রান্নাঘরে সবাইয়ের রুটি সেঁকা হচ্ছে। দইবড়ার সুগন্ধে সারা বাড়ি ম ম করছে। বাড়ির পরিজনদের জন্যে মেয়েরা থালায় থালায় খাবার সাজাচ্ছে। ঠাকুর্দাকে দালানে চৌকির সামনে টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে। এমন সময় ঠাকুর্দার কৃষাণেরা দালান সংলগ্ন আঙ্গিনায় এসে দাঁড়াল। ফরিয়াদীর মতো সঙ্কোচ ওদের চোখে মুখে। বিনম্র, লজ্জিত। ঠাকুর্দা থালা সরিয়ে বিরক্ত হয়ে ওদের দিকে তাকালেন। ঝাঁঝালো গলায় বললেন,—কি হয়েছে তোদের?

ওদের মধ্যে করিম খাঁ, আল্লাদাদ, ফজলু, রহমানকে আমি চিনতে পারলাম। আরো কয়েকজন রয়েছে যাদের আমি চিনি না। করিম খাঁ মাথা নিচু করে বললো—হুজুর ওপর থেকে নির্দেশ এসেছে আপনাদের

সব কিছু লুঠ করে নেবার।

ঠাকুর্দা বললেন,—ওপরওয়ালা তো ভগবান রে। তিনি কি তোদের বলেছেন লুঠ করতে?

দাদুর কণ্ঠে কৌতুকের হাসি।

ওরা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ফজলু বিব্রত ভাব ঝেড়ে ফেলে ধীরে ধীরে বলল—হুজুর আপনারা এখান থেকে চলে যান। ওপরওয়ালার নির্দেশ অমান্য করবার ক্ষমতা আমাদের নেই।

ঠাকুর্দা রাগে চিৎকার করে উঠলেন। বললেন,—কেন চলে যাবো? কেন?

করিম খাঁ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল,—হুজুর রাগ করবেন না। আমাদের কিছু করার নেই। করিম খাঁর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল।

ঠাকুর্দা বললেন,—যত সব আহাম্মোকের দল। গুণ্ডাদের এত ভয় করিস তোরা? আমার কাছে দু' বোরের রিভলবার আছে, থ্রি নট থ্রিও আছে একটা। দেখবো কোন্ বাপের ব্যাটার এত হিম্মৎ আছে যে কোটালিসুদকার জমিদারবাড়ি লুঠ করতে আসে। ঠাকুর্দা ফের ওদের ধমক দিয়ে বললেন, যা তোরা এখন চলে যা।

ওরা চলে যাবার পর আমি আর বাবা ঠাকুর্দাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, যে এখানে থাকা আর আমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়। কিন্তু ঠাকুর্দার সেই এক কথা। কেন আমরা চোদ্দ পুরুষের ভিটা ছেড়ে যাবো? আমাদের মধ্যে দুটো দল হয়ে গেল। আত্মারাম কাকা ও তাঁর পরিবারের লোকজন দাদাজীর পক্ষে। তাঁরা বললেন,—এ হাঙ্গামা সাময়িক। এখানে কিছু হবে না। শুধু শুধু তারা কেন এই নিশ্চিন্ত আরামের জীবন ছেড়ে রিফিউজি হতে যাবেন।

আমি, আমার বড় ভাই ও বাবা চলে যাবো ঠিক করলাম। স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা স্বাভাবিক নিয়মেই তাদের স্বামীদের পক্ষেই মত দিলো। মাঝরাত পর্যন্ত আমাদের আলোচনা চললো। তারপর যে যার মতো শুয়ে পড়লাম।

কাকভোরেই হামলা শুরু হলো। তখনো সকলের ঘুম ভাঙেনি।

বাচ্চারা তো সবাই অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমার রাতে ঘুম হয়নি। সবে চোখের পাতা জুড়ে এসেছিল। এমন সময় আমার পরিচিত সেই ভয়াবহ ঢোলের আওয়াজ শুনে আমি ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লাম। ঢোলের আওয়াজ, লুটেরাদের উল্লাস, শিশু ও স্ত্রীলোকদের আর্ত চিৎকারে ভোরের শান্ত পরিবেশ খান খান হয়ে ভেঙে পড়লো। আমার পরনে ছিল ফতুয়া আর লুঙ্গি। সেই অবস্থাতেই আমি ঘরের জানলা দিয়ে নিচে লাফিয়ে পড়লাম। দিশেহারার মতো ছুটতে লাগলাম। অদূরেই আখের ক্ষেতের শুরু। আখের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে অন্ধের মতো ছুটতে লাগলাম। আখের ধারালো পাতায় আমার হাত পা ছড়ে গিয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো। ফতুয়া লুঙ্গি এখানে সেখানে ছিঁড়ে গেল। আমার অবস্থা তখন যন্ত্রণাবোধের উর্ধ্বে। শরীরের সব শক্তি জড়ো করে আমি ছুটতেই লাগলাম। বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে এসে আমি থামলাম। ঢোলের আওয়াজ আর কান্নার শব্দ তখন ক্ষীণ হয়ে ভেসে আসছে। আমি আখের ক্ষেতের মধ্যে বসে পড়লাম। ঘামে বৃষ্টিতে ভেজার মতো আমার শরীর জবজবে হয়ে গেয়েছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছেড়ে আমি ধাতস্থ হবার চেষ্টা করছি। আতঙ্কে তখন আমার শরীর থরথর করে কাঁপছে। আমি এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখলাম। নিরাপদ দূরত্বে চলে আসতে পেরেছি কি না বুঝতে চাইলাম। না, কাছে পিঠে মানুষের অস্তিত্ব নেই বলেই মনে হলো। যে দিকে চোখ যায় শুধু আখ আর আখ। শব্দের ঢেউটাও ক্রমশঃ নিথর হয়ে এল। পলায়নরত মানুষের পদধ্বনি, আর্তমানুষের চিৎকার, রক্তপায়ী জীবদের উল্লাসের ধ্বনি সব কিছুই থেমে গেল। ঘন্টাখানেক পরে চতুর্দিকে শ্মশানের স্তব্ধতা নেমে এল। অনুভূতিহীন এক জড়ভরতের মতো আমি আখ ক্ষেতের মধ্যে বসে রইলাম।

এক দিন, এক রাত কাটলো। দু দিন দু রাত কাটলো। তৃতীয় দিন বিকেল পর্যন্ত এক ভাবেই কাটলো আমার। একটুও নড়াচড়া করিনি। পাছে শব্দ হয়, কেউ টের পায়। কি ভাবে সময় কাটলো আমি জানি না। মৃত্যুভয় আমার বোধশক্তি লুঠ করে নিয়ে থাকবে।

দ্বিতীয় রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হলো। জলে কাদায় মাখামাখি হয়ে আমি একই ভাবে বসে রইলাম। বৃষ্টি হওয়াতে একটা লাভ হলো আমি জিভটা ভেজাতে পারলাম। বৃষ্টিভেজা পাতা চিবিয়ে তৃষ্ণা মেটালাম। কিন্তু তৃষ্ণা মিটলে কি হবে, খিদের জ্বালায় তখন আমি অস্থির হয়ে উঠেছি। তৃতীয় দিন বিকেলে মরিয়া হয়ে আমি ধীর পায়ে বাড়ির দিকে এগোতে লাগলাম। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই পচা দুর্গন্ধে আমার গা গুলিয়ে উঠলো।

বাড়ির দালানে ঠাকুর্দার মৃতদেহ পড়ে ছিল। একটা হাত দালানের বাইরে ঝুলছিল। শরীর ফুলে ঢোল। ঠাকুর্দার পোষা কুকুর রুমি একপাশে চুপ করে বসে আছে।

ঠাকুর্দার মৃতদেহ ডিঙিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম। প্রথমেই কল খুলে কিছুটা জল খেয়ে নিলাম। তৃষ্ণা মিটলে কিছু খাবার পাওয়া যায় কিনা খোঁজ করতে গেলাম রান্নাঘরে। একটা পাত্রে কাপড়ে জড়ানো কয়েকটা রুটি পেলাম। কিছুটা মাখনও পেলাম। আরো খোঁজ করতে খানিকটা গুড় পেলাম। ছুটো রুটি মাখন ও গুড় দিয়ে প্রায় গিলেই খেয়ে ফেললাম। আবার খানিকটা জল খেয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

এবার আমি চোখ মেলে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। পশ্চিম দিকের পাঁচিল সংলগ্ন দালানে যে তক্তপোশে ঠাকুর্দা শুয়ে থাকতেন, সেখানে চাদরের অর্ধেকটা নিচে ঝুলছে তাতে রক্তের কালো কালো দাগ। মাটির ওপর হুঁকোর নল আলগা হয়ে পড়ে আছে। চৌকি, পিঁড়ি মুন্নার কিছু খেলনা সব এলোমেলোভাবে ছড়ানো। আমি তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফেরালাম অন্যদিকে। তাকালাম দক্ষিণের পাঁচিলের দিকে। চোখে পড়লো সবুজ কুমড়ো লতায় কচি কচি কুমড়ো ঝুলছে। এক কোণে উনুনের পাশে একটা লোহার চিমটে পড়ে আছে।

পুব দিকের পাঁচিলের দিকে আমি চোখ ফেরালাম। চোখ গেল পাঁচিলের গায়ে হেলান দেওয়া একটা কাঠের ফ্রেমের ওপর। তাতে ইজেরের ফিতে তৈরি করার জন্যে কিছু রেশমী সুতো ঝুলছে। আমার

ছোট ভাইয়ের বউ আশাকে দেখেছি এখানে বসে বুনতে। আমার চোখের সামনে ওর চেহারাটা ভেসে উঠলো। শ্যামলা মেয়ে, কপালে টিপ, নাকে নাকছাবি, পাতলা ঠোঁটে লজ্জাজড়ানো হাসি। মেহেদী রঙে রাঙানো লম্বা লম্বা আঙুলের মাঝখানে রেশমী সুতোর গোছা নিয়ে সে যেন ফিতে বুনছে আর সঙ্গে সঙ্গে বুনে চলেছে তার হৃদয়ের স্বপ্ন।

আমার বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। না, ওই দৃশ্য আর কোনোদিন দেখা যাবে না। পুরনো দিনের অজস্র ছবি একের পর এক আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। প্রাণের স্পন্দনে পূর্ণ একটি সুখী সংসারের ছবি। পুরনো গন্ধ, পুরনো শব্দ আর অতি-পরিচিত অনেকগুলি মুখের ছবি মুহূর্তের জন্যে আমার কাছে জীবন্ত হয়ে উঠলো। ওইতো রান্নাঘরে আমার মা আটা মাখছেন, আমার স্ত্রী রুটি বেলছে। মায়ের পাশে বসে মুন্না মাখা আটা দিয়ে গরু ছাগল যা খুশি বানিয়ে চলেছে। ঠাকুর্দা দালানে তক্তাপোশে বসে হুঁকো টানছেন। আর পূবদিকের দেয়ালের পাশে বসে আমার ভাইয়ের নতুন বউ আশা রেশমী সুতো দিয়ে ইজেরের ফিতে তৈরি করছে। বোনার সঙ্গে সঙ্গে সে গুনগুন করে গাইছে।

গাড়ি এল, গাড়ি এল। সিপাইগুলা ওকে এখন টিকিট দিও না। রাতের বেলায় ওকে যেতে দিও না।

স্বপ্নে দেখার মতো রূপের জগৎ, রসের জগৎ মুহূর্তের জন্যে দেখা দিয়ে আবার হারিয়ে গেল। দেখলাম ফিতে বোনার ফ্রেম আর রেশমী সুতো তেমনি রয়েছে শুধু আশা নেই। তক্তপোশের ওপর বিছানার চাদরে রক্তের কালো কালো দাগ, শূন্য শয্যা!

উঠোনে বসে রুটি চিবোতে চিবোতে আমি এই সব ভাবছিলাম। এক সময় দেখলাম আমার থেকে কিছুটা দূরে রুমী বসে আছে। ঠাকুর্দার পোষা কুকুর। বড়ো ভালবাসতেন ওকে। রুমীর পেটে বাচ্চা। পেটটা ঝুলে গেছে। বোধহয় এক মাসের মধ্যেই মা হবে সে। রুমী সজল চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিল। আমি ওকে এক টুকরো

চার

এবার আমার বিপদের কথাটা আপনাদের একটু বুঝিয়ে বলি। আমাদের গ্রাম কোটলিসুদকার একদিকে প্রায় দেড় মাইল দূরে দরবার সাহেব কর্তারপুর স্টেশন। অন্যদিকে প্রায় আড়াই মাইল দূরে কনজরুড় কসবার গ্রাম। এই হচ্ছে আমাদের গ্রামের অবস্থান মাঝখানে রেলপথ। এই পথ চলে গিয়েছে নারুয়ালের দিকে আগেই বলেছি নারুয়াল হয়েই আমি এখানে এসেছি সুতরাং সেখানে ফেরার প্রশ্নই ওঠে না।

তাহলে আমি কোনদিকে যাবো? বাঁচার একটাই পথ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। সেটা হচ্ছে যে কোনো উপায়ে গুরুদ্বার করতার-সাহেবে গিয়ে পৌঁছনো। এখানে ইরাবতী নদীর ওপর যে সেতু রয়েছে, সেই সেতুই পাকিস্থানকে হিন্দুস্থানের সীমান্ত থেকে পৃথক করে রেখেছে।

আমি যে কথা ভাবছিলাম ঠিক সেই কথাই ভাবছিলো হিন্দু শরণার্থীর দল। এই দলটি এসেছে কনজরুড় ও তার আশপাশের এলাকা থেকে। ওরা দরবারসাহেব করতারপুর স্টেশন পার হয়ে বাবা নানকের ডেরার দিকের রাস্তা ধরে এগোচ্ছিল। এই দলে প্রায় তিরিশ চল্লিশ হাজার লোক। এদের মধ্যে এক একটি সংসার কিংবা এক একটি গ্রাম মিলে অসংখ্য উপদল।

আমি কিন্তু সম্পূর্ণ একা। আমার আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই হতবুদ্ধি, বিভ্রান্ত, প্রাণভয়ে ভীত আমি একা হেঁটে চলেছি।

শান্তিপ্রিয় মানুষ আমি। নিরীহ, নির্বিরোধী।

জীবনে কারো সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ কিংবা মারপিট করিনি কারোকে দুঃখ দিইনি, কারো কাছ থেকে দুঃখ পাইনি। দিন কেটেছে শান্তি ও আরামের মধ্যে। না, ঘৃণার মনোবৃত্তি আমার ছিল না আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার কল্যাণে আমার মন থেকে উঁচ-নীচুর ভেদা-

ভেদ, জাতিধর্মের বৈষম্য ঘুচে গিয়েছিল। বিচ্ছিন্নতাবাদ ও ধর্মের গোঁড়ামিকে আমি অন্তর থেকে ঘৃণা করি। ওসব নিয়ে মাথা ঘামানো আমার একটুও পছন্দ নয়। বাসি দই-এর টক গন্ধের মতো বিশ্রী লাগে আমার। অনেক সময় ভেবেছি এইসব বিভেদপন্থী চিন্তাধারাকে নর্দমার পচা জলে ফেলে দেওয়া যায় কি না।

আমার বন্ধুদের মধ্যে যেমন হিন্দু ছিল তেমনি মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, ইহুদি, ইংরেজও ছিল। ব্যবসাদারদের প্রয়োজনের খাতিরে নানা ধরনের লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হয়। ব্যবসায়ী হলেও আমি তেমন কোনো স্বার্থের প্রয়োজনে নয়, নেহাৎই আনন্দ পাবার জন্যে পরিচিতির পরিধি প্রসারিত করে নিয়েছিলাম। প্রত্যেকের সঙ্গেই আমার সৌহার্দ্য ছিল এবং সে সৌহার্দ্য সবরকম স্বার্থবুদ্ধির ঊর্ধ্বে। আমার মনের গভীরে কি আছে, কি আমার কামনা-বাসনা তাও ভালো করে ভেবে দেখিনি কোনোদিন। কোনো ব্যাপারেই কোনোদিন অভাববোধ করিনি। দিলদরিয়া, বেপরোয়া মেজাজের লোক আমি। জাতপাত নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় ছিল না আমার। আজও সে অবসর নেই।

আজ আমি একা। ভয়ঙ্কর ভাবে একা। এক ভয়াল অরণ্যে নিরীহ দুর্বল অসহায় এক জানোয়ারের মতো আমি এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। নিজেকে অত্যন্ত বিপন্ন, বিমূঢ় মনে হচ্ছে আমার। আরণ্যক জীবন তো মানুষ কবেই পেরিয়ে এসেছে। জঙ্গল-জীবনের সেই কাহিনী ইতিহাসে পড়েছি। এতদিন মানুষের অগ্রগতি, মানুষের সভ্যতার সমৃদ্ধিতে আমি গর্ব বোধ করতাম। কিন্তু এই সভ্যতার অন্তরালে যে একটা বিরাট ফাঁকি আত্মগোপন করে আছে তা জানতাম না। এ দিকটা তলিয়ে দেখার চেষ্টা করিনি কোনোদিন। আজ ইতিহাসের এক মহাসংকটের মুহূর্তে আমার চোখের সামনে থেকে মোহের আবরণ সরে যেতেই, মানব সভ্যতার আপাত চাকচিক্যের অন্তরালে তার কুৎসিত চেহারাটা আমি দেখতে পেলাম। আমি আতঙ্কিত, শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। আরণ্যক জীবনের

আদিম হিংস্রতার রূপ দেখে মানুষ হিসেবে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল।

মানুষের মধ্যে আমি থেকেছি। মানুষের সভ্যতার জন্যে গর্ববোধ করেছি। এই সভ্যতাকে জানতাম সত্য এবং শাশ্বত। এখন দেখছি যা এতদিন জেনে এসেছি সব ভুল। ফাঁকিতে ভরা এই সভ্যতা। এখন ভয় হচ্ছে এই জঙ্গলে দিন কাটাব কি করে? কতদিন এভাবে থাকতে হবে তা ও তো জানি না। ভয় চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে আমাকে। আখের খেত তার সৌন্দর্য হারিয়েছে। মনে হয় আখের খেত তো নয়, যেন শত্রু-শিবির। প্রতিটি টিলার আড়ালে বুঝি মৃত্যু ওত পেতে আছে। রেল স্টেশনের অন্ধকারে যেন নেকড়ে হাঁক করে বসে আছে। অথচ এই রেল লাইন নিয়ে আমি কতো গর্ববোধ করতাম। রেল লাইন দূরকে করেছে নিকট, অনাত্মীয়কে করেছে আত্মীয়। গতির প্রতীক রেল লাইনকে আমার মনে হতো বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার অন্যতম মূল্যবান সম্পদ। হায়, আজ কী তার পরিণতি! আজ তাকে মৃত্যুর ভারী বোঝা বহন করতে হচ্ছে!

হাঁটতে হাঁটতে কখন যে আমি পথ ভুল করে ফেলেছি খেয়াল ছিল না। খেয়াল যখন হলো তখন দেখলাম আমি গুরুদ্বার করতার-সাহেবের দিকে না গিয়ে দরবারসাহেব করতারপুর স্টেশনের দিকে চলে এসেছি। আখের খেতের আড়াল থেকে দেখলাম, ঢিবিটার পিছনে কুলগাছের ঝোপের মধ্যে, আখের খেতের মধ্যে একেবারে আমার সামনে একদল মুসলমান মুখে ফেট্টি বেঁধে, হাতে বল্লম ছুরি কুড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আখের খেতের ওপাশে রেল লাইনের অন্যদিকে রাস্তা ধরে কনজরুড়ের দিক থেকে যে হিন্দু শরণার্থীর দলটি আসছিল ওদের নজর সেই দিকে। আমি ওদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ওরা আমাকে দেখতে পায়নি কারণ আমি ছিলাম ওদের পিছন দিকে। ওরা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়েছিল। দক্ষ শিকারীর মতো হাতের বল্লম উঁচিয়ে অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গিতে ওরা দাঁড়িয়েছিল। ওদের দেখে আমার মনে হচ্ছিল আমি কেন মানুষ নই, একটা

খরগোস কিংবা শিয়াল। চারদিকে অন্ধকার ঘন জঙ্গলে, সবুজ পাতার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে হিংস্র জন্তু। ওদের জবাফুলের মতো লাল চোখ, লম্বা ছুরির মতো ধারালো নখ যেন আমার শরীরটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে নেবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে।

জীবনে এই প্রথম আশ্চর্য এক অনুভূতি হলো আমার। মৃত্যু খুব কাছে জেনেও আমি এক গভীর ভাবনার মধ্যে তলিয়ে গেলাম। মন যে একই সময়ে ভিন্নমুখী চিন্তার স্রোতে ভাসতে পারে তার প্রমাণ এই প্রথম পেলাম। আমার সামনে আখের খেতে, কুলগাছের ঝোপে, রেল লাইনের এ পাশের নিচু জমিতে দাঙ্গাবাজরা তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রেল লাইনের ওপার থেকে বৃদ্ধ, যুবক, শিশু, নারী, হিন্দু, শিখ, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, চামার, কুমোর, রাজপুত, তেলী, জমিদার মহাজন, কৃষক—সবাই নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে একই দলভুক্ত হয়ে এগিয়ে আসছে। এরা কখনো কখনো একজন আরেকজনের সঙ্গে লড়াই করেছে, একজন আরেকজনকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে, একজন অন্যের সম্পত্তি দখলের চেষ্টা করেছে, ঘৃণায় একজন অন্যের ছায়া মাড়ায়নি আজ কিন্তু সবাই কেমন এক হয়ে গিয়েছে সবাই মিলে জোট বেঁধে চলেছে। হ্যাঁ, আবার আমার জঙ্গলের সাদৃশ্যই মনে আসছে। জঙ্গলে যখন কোনো বিপদ দেখা দেয়,—বন্যা, ঝড়-তুফান কিংবা আগুন লাগার মতো কোনো ঘটনা ঘটে তখন সব জানোয়ার একই সঙ্গে পালাতে চেষ্টা করে। খাদ্য-খাদক সম্পর্ক তখন সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে। হরিণ, বাঘ, হাতি, সাপ, শিয়াল, খরগোশ একই সঙ্গে পালায়। সেই সময় কেউ কারোর ক্ষতি করে না, কেউ কারোর প্রাপ্যটা কেড়েও নেয় না। প্রাণ বাঁচাবার তাগিদটাই তখন সকলের কাছে মুখ্য ব্যাপার। ওই শরণার্থী দলের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হচ্ছিল ওদের আচরণও জঙ্গলের জীবনের মতোই। ওদের চলার পথটাকেও এখন আমার জঙ্গলের সরু পথের মতোই মনে হচ্ছে। সেই পথে হাজার হাজার ভিন্ন ভিন্ন জাতের জন্তু যেন প্রাণভয়ে পালাচ্ছে।

শরণার্থীর দলটা কাছাকাছি আসতেই আখ খেতে লুকিয়ে থাকা মুসলমান দলের সর্দার একটা সংকেত করলো। সঙ্গে সঙ্গে গোটা দলটা 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি করতে করতে বল্লম ছুরি লাঠি কুড়াল নিয়ে দলটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

শরণার্থীর দলটির মধ্যে পালানোর হিড়িক লেগে গেল। যে যেদিকে পারল নিজের নিজের প্রাণ নিয়ে পালাতে লাগল। অধিকাংশই আক্রমণের বলি হলো। সমবেত প্রতিরোধের চেষ্টা কারো মধ্যেই দেখা গেল না। আত্মরক্ষার অন্য কোনো উপায় আছে কিনা তাও ভেবে দেখার কোনো প্রয়াস এদের মধ্যে দেখতে পেলাম না। ইরাবতী নদীর সেতু পর্যন্ত কোনো উপায়ে পৌঁছনো, এ ছাড়া অন্য কোনো পরিকল্পনা কারো মাথায় ছিল না। তাই আকস্মিক আক্রমণে বিমূঢ় হয়ে ওদের আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। আসলে মানুষগুলো অনেক আগেই মরে গিয়েছিল। জীবিত ব্যক্তিসুলভ কোনো আচরণ এদের মধ্যে দেখা গেল না। এর জন্যেই কয়েক হাজার লোককে স্বল্প সংখ্যক দাঙ্গাবাজ আধ ঘন্টার মধ্যে মুলো-গাজরের মতো কেটে টুকরো টুকরো করে দিয়ে চলে গেল।

আমি সবই দেখলাম এবং শুনলাম। আমার চোখের সামনেই এই বীভৎস কাণ্ড ঘটে গেল। কিন্তু আমিও নিস্তেজ হয়ে গেছি। নিস্তেজতা বোধহয় ধীরে ধীরে আমার চেতনার গভীরে থিতিয়ে জমাট বেঁধে পাথর হয়ে গেছে।

আমি এখন বাঁচার কথা ভাবছি। ভেবে দেখলাম কোনো দলের সঙ্গ নেওয়ায় বিপদের ঝুঁকি বেশি। আয়ু যদি থাকে তো বাঁচবই। আয়ু না থাকলে মরতে হবে, সে দলেই থাকি আর একলাই থাকি। ভেবেচিন্তে একলা চলাই আমার কাছে সমীচীন মনে হলো। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি আখ ক্ষেতের মধ্যেই লুকিয়ে রইলাম সন্ধ্যার মুখেই আমি অবশ হয়ে পড়লাম। তৃষ্ণায় আমার কণ্ঠতালু শুকিয়ে এল। থুতুও শুকিয়ে গেছে। গায়ে কাঁটার মতো কি যেন বিঁধছে। তখন স্থির

করলাম জলের খোঁজে এবার কোথাও যাবো। সামনে শত্রু থাকলেও আমাকে বেরোতেই হবে কারণ জল না খেলে আমি বাঁচবো না। যে ভাবেই হোক দরবারসাহেব করতারপুর স্টেশনে আমাকে পৌছতেই হবে। ওখানে নিশ্চয়ই জল পাবো। একবার প্রাণভরে জল তো খেয়ে নিই তারপর কেউ যদি আমাকে মেরে ফেলতে চায় তো মারুক।

আখ খেত থেকে বেরিয়ে এসে রেল রাস্তার নিচু ঢালু কিনারা ধরে হামাগুড়ি দেবার মতো করে আমি এগোতে লাগলাম। এক-সময় নিরাপদে স্টেশনে এসে পৌছলাম। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। স্টেশনটাকে একটা প্রেতপুরীর মতো মনে হচ্ছে। প্ল্যাটফর্মের সব বাতি কারা ভেঙে দিয়েছে। স্টেশন মাস্টার তার কামরার মধ্যে মরে পড়ে আছে। প্ল্যাটফর্মের চারদিকে শিখ ও হিন্দুর অজস্র মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে। আমি কোনোদিকে না তাকিয়ে হিন্দুদের জল খাওয়ার কলের দিকে এগিয়ে গেলাম। চোরের মতো নিঃশব্দে কলের কাছে পৌছে পেট ভরে জল খেলাম। জল খেয়ে একটু সুস্থবোধ করতে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব নেই। যেদিকে তাকাই শুধু শব আর শব।

হঠাৎ দেখলাম প্ল্যাটফর্মের পশ্চিম দিকে শবের স্তূপের মধ্যে অস্পষ্ট ছায়ার মতো কি যেন নড়াচড়া করছে। আমি তাড়াতাড়ি হিন্দুদের জল খাওয়ার কলের নিচে লুকিয়ে পড়লাম। হিন্দুদের জল খাওয়ার ঘরের কিছুটা দূরে মুসলমানদের জল খাওয়ার ঘর। একটু দূরে প্লাটফর্মের চকচকে পিতলের ঘন্টাটা ঝুলছে। তার সামনেই সেই ছায়াটা নড়াচড়া করছে। লাশের ওপর ঝুঁকে কি যেন খুঁজছে সেই ছায়ামূর্তি। একটু পরে ছায়াটা সোজা হয়ে দাঁড়াল। তখন আমি দেখতে পেলাম একটি ছোটখাটো রোগা মানুষ, সাদা দাড়িওলা এক বৃদ্ধ। হাতে একটি লণ্ঠন নিয়ে লাশের স্তূপের মধ্যে কি যেন খুঁজে চলেছে। ভাবলাম হয়তো ওর কোনো নিকট আত্মীয়ের মৃতদেহ খুঁজছে সে। তাই মৃতদেহগুলো উল্টেপাল্টে দেখছে।

লোকটি ধীরে ধীরে আমার অনেক কাছে এসে গেলো। তখন

দেখলাম সে মোটেই মৃতদেহ খুঁজে বেড়াচ্ছে না। মৃতদেহগুলোর পকেট হাতড়াচ্ছে সে। তাদের পকেটে টাকা-পয়সা যা পাচ্ছে, তাদের কাছে দামী যা কিছু পাচ্ছে তা টেনে বের করে একটা থলিতে পুরছে।

ভয়ঙ্কর একটা প্রতিক্রিয়া হলো আমার মধ্যে। সব ভুলে গিয়ে লুকোনো জায়গা থেকে বের হয়ে নিঃশব্দে বুড়োর পিছনে গিয়ে অতর্কিতে ওর হাত দুটো চেপে ধরলাম। ও তখন একটা মৃতদেহের দিকে ঝুঁকে নিরীক্ষণ করছিল কিছু পাওয়া যাবে কি না। আমি ধমক দিয়ে রুক্ষস্বরে জিজ্ঞেস করলাম—কে তুমি? কি খুঁজছো এখানে?

বুড়োর নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। ঘোলাটে চোখের সাদা মণিটা যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ঠোঁট কাঁপছে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে অতিকষ্টে সে গলা থেকে একটা স্বর বের করতে পারলো।

—আমি···আমি···মুসলমান।

আমি বললাম,—মুসলমান, দাঁড়া বুড়ো তোকে এখনই আমি শেষ করছি।

সঙ্গে সঙ্গেই আমি ওর ঘাড় চেপে ধরলাম। বুড়োর মুখ দিয়ে একদলা কফ বেরিয়ে এসে দাড়িতে আটকে গেল। থলিটা ফেলে দিয়ে হাত জোড় করে বলল,—না, না, আমি মুসলমান নই, আমি হিন্দু। আমার নাম বুলাকী শা। কনজরুড়ের বুলাকী শা। ওখানে সবাই আমাকে চেনে, তুমিও হয়তো আমার নাম শুনে থাকবে।

হ্যাঁ আমি ওর নাম শুনেছি। আমাদের এলাকায় কেই বা ওর নাম শোনেনি। ওই এলাকায় সবচেয়ে বড় মহাজন। এ অঞ্চলে এমন কোনো চাষী নেই যে ওর কাছ থেকে ধার নেয়নি। এমন কোনো ঘর নেই যে ঘরের গয়না ওর কাছে বন্ধক নেই। মানুষের রক্তশোষণ করাতেই ওর সবচেয়ে বড় আনন্দ।

এই সেই বুলাকী শা। আমি ওকে কোনোদিন দেখিনি নাম

শুনেছি মাত্র। জিজ্ঞেস করলাম,—তা, বুলাকী শা তুমি এখানে কি করছিলে?

—আমার পরিবারে কেউ বেঁচে নেই। আমার টাকাকড়ি সব লুঠ হয়ে গেছে।

—যা লুঠ হয়েছে সব কি তোমারই ছিল?

বুলাকী শা আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল,—আমার শুধু একটি মেয়েই বেঁচে আছে। সে সামনের দলের সঙ্গে এগিয়ে গেছে। তুমি আমাকে ছেড়ে দিলে এগিয়ে গিয়ে দেখবো তাকে খুঁজে পাই কি না।

—মেয়ের সঙ্গে না গিয়ে তুমি এখানে কি খুঁজে বেড়াচ্ছো?

হি হি শব্দ করে বুলাকী শা হেসে উঠলো। ও বুঝতে পেরেছে আমি যখন হিন্দু তখন ওর প্রাণের ভয় নেই। আমাকে দেখে ও সাহস ফিরে পেয়েছে।

বুলাকী শা বলল,—বাবা আমার তো একটিই মেয়ে যদি বেঁচে যাই মেয়েটার বিয়ে তো দিতে হবে। আমি তো নিঃস্ব হয়ে গিয়েছি, বিয়ে দেব কি করে? সেই ভেবেই আমি···।

কথা শেষ না করে বুলাকী মাটিতে পড়ে থাকা থলিটার দিকে লোভীর মতো তাকালো। ওর আগ আমিই থলিটা তুলে নিলাম। খুলে দেখলাম। ওতে কিছু দশ টাকার পাঁচ টাকার নোট, কয়েকটা ঘড়ি ও কয়েকটা আংটি রয়েছে।

বুলাকী বলল,—ভাবলাম এরা তো মরেই গেছে, এসব জিনিস এদের তো কোনো কাজে লাগবে না কিন্তু আমার কাজে লাগবে। মুসলমানরা যে আমার সব সম্পত্তি নিয়ে গেছে।

—তোমার সম্পত্তি?

—হ্যাঁ, আমারই তো। এখন আমি নিঃস্ব। তাই ভাবলাম এগুলো আমার মেয়ের বিয়ের যৌতুকের কাজে লাগবে।

—তুমি মৃত মানুষদের জিনিস নিয়ে তোমার মেয়েকে যৌতুক দেবে?

ঘৃণা ও বিদ্বেষে আমার মন ভরে উঠলো। যদি এই মানুষটার কথাগুলো বিশ্বাস করতে না পারতাম তাহলে বোধহয় শান্তি পেতাম। কিন্তু বুলাকী আবার বলল, যখন সম্পত্তি ফিরে পাবার কোনো আশা নেই তখন এই ভাবেই সে মেয়ের বিয়ের যৌতুক সংগ্রহ করবে।

বুলাকী আমাকে জিজ্ঞেস করল,—তুমি এখানে কি খুঁজছো?

আমি কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর এক সময় বিষণ্ণ উদাস স্বরে বললাম,—আমি সেই দেশকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, যে দেশটা তোমাদের মতো মানুষের লোভের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

বুলাকীর ঘাড় থেকে আমি হাত সরিয়ে নিলাম। একটা বিষধর সাপের স্পর্শে যেন আমার গা ঘিন ঘিন করে উঠলো। এক ধাক্কায় ওকে শবস্তূপের মধ্যে ফেলে দিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম। কিছু দূরে গিয়ে একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম। দেখলাম অস্পষ্ট একটি ছায়ামূর্তি লণ্ঠন নিয়ে মৃতদেহের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বুলাকী শা আবার মেয়ের বিয়ের যৌতুকের সম্পত্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটতে হাঁটতে আমি একটা কাঁচা রাস্তায় এসে পড়লাম। রাস্তার দুধারে আখের খেত। রাতের অন্ধকারে দূরের আখ ক্ষেতগুলিকে দুর্ভেদ্য দুর্গের প্রাচীরের মতো দেখাচ্ছিল। রাত্রি যেন মানুষের কাণ্ডকারখানা দেখে লজ্জিত। লজ্জায় রাত্রি যেন মুখ লুকিয়েছে আখের ঝোপে চারদিকে ভয়াবহ নিস্তব্ধতা। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিল মাঝে মাঝে আমার পিছু নেওয়া সেই কুকুরটা। কমীটা বড় অদ্ভুত। মাঝে মাঝে আকাশের দিকে মুখ তুলে ও কেঁদে উঠছিলো। আশ্চর্য দিনের বেলা ও কাঁদে না। কোনো সাড়াশব্দ করে না। আখের ক্ষেতে আমার কাছাকাছি চুপচাপ বসে থাকে। আমি চলতে শুরু করলে কমীও চলে, আমি যখন থামি, ও তখন থেমে যায়। আমার থেকে সব সময় কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে চলে। কারণ একবার রেগে গিয়ে আমি ওকে লাথি মেরে-

ছিলাম। সেই থেকেই ও একটা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলে। লাথিটা অবশ্য ওর গায়ে লাগেনি, পা তোলা মাত্রই ও দ্রুত সরে গিয়েছিল। সেই থেকে ও হুঁশিয়ার থাকে। পেটে ওর বাচ্চা রয়েছে, তাকে ও রক্ষা করে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। দিনে আক্রমণের আশংকা থাকে সেটা ও বোঝে তাই দিনের বেলায় চুপ করে থাকে। এত বুদ্ধি ও পেল কোত্থেকে কে জানে। সারা দিনের জমে থাকা দুঃখ রুমী রাতের বেলায় প্রকাশ করে। আকাশের দিকে তাকিয়ে ইনিয়েবিনিয়ে কাঁদতে থাকে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম ওকে,—আকাশে তোর কে আছে রে, যার কাছে তুই কেঁদে কেঁদে নালিশ জানাস? আজ তো আকাশটাও কালো হয়ে আছে। একটাও তারা দেখা যাচ্ছে না। ধরিত্রী নিস্তব্ধ, শোকাচ্ছন্ন। দিগন্তজোড়া এই নিস্তব্ধ পরিবেশে বাতাসও যেন বইতে ভুলে গিয়েছে। দুর্গের প্রাচীরের মতো আখের ঝোপের কালো দেয়ালকে বড় কঠিন ও দুর্ভেদ্য মনে হচ্ছে। অন্ধকারের এই দেয়াল ভেদ করে রুমীর অভিযোগ তো কোথাও পৌঁছতে পারবে না। অন্ধকারের হৃদয় থাকে না, তার শুধু পেট আছে, ক্ষুধা আছে। যার হৃদয় নেই সে কি করে নালিশ শুনবে? উদরসর্বস্ব শুধু রক্তপান করতে জানে।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর ভাবলাম বোধহয় নদীর ধারে পৌঁছবার সেই রাস্তায় পৌঁছে গেছি। যে রাস্তা আমাকে নিরাপদ গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবে। কয়েক মাইল হাঁটার পর বুঝতে পারলাম আমার ভুল হয়েছে। আমি ভুল রাস্তা ধরে হাঁটছি। এ অন্য রাস্তা। জানি না এ রাস্তা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে। সরু রাস্তারা ক্রমশঃ প্রশস্ত হচ্ছে। রাস্তার ধুলোয় যাত্রীদের পায়ের চিহ্ন। হাজার হাজার পায়ের ছাপে মাটি এলোমেলো।

একটা আর্তনাদ শুনে আমি থমকে দাঁড়ালাম। দেখলাম রাস্তার এক পাশে এক বৃদ্ধ জাঠ কাতরাচ্ছে। আমাকে দেখতে পেয়েই বুড়ো চুপ হয়ে গেল। ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে আমার দিকে এমন

তাকে তাকাল যেন স্বয়ং যমরাজ তার সামনে দাঁড়িয়ে।

ওকে অভয় দিয়ে বললাম,—ভয় নেই, আমিও হিন্দু শরণার্থী।

বৃদ্ধ যেন প্রাণ ফিরে পেল। দু-তিনবার ঢোক গিললো সে। তারপর অনেক চেষ্টায় কাশতে কাশতে ফ্যাসফেঁসে গলায় সে বলল,—জয়গুরু, জয়গুরু, আমি তো ভেবেছিলাম···।

—ভুল বুঝেছিলেন, বাবা। তা এখানে পড়ে রয়েছেন কেন?

আমার ছেলেরা আমাকে এখানে ফেলে দিয়ে চলে গেল। সঙ্গে নিল না আমায়।

—কেন?

—আমি যে চলতে পারি না, বাবা। খুব বুড়ো হয়ে গেছি তো।

—তা বাবা, আপনার ছেলে ক'টি।

—তিনজন, বাবা। তিনজনই শক্তসমর্থ। এ পর্যন্ত ওরাই আমাকে বয়ে এনেছিল। কিন্তু এখানে যখন হামলা হলো তখন ওরা আমাকে এখানে রেখে পালিয়ে গেল। ঈশ্বরের দয়ায় এখনো বেঁচে আছি আমি।

সমবেদনাসূচক একটা শব্দ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। বৃদ্ধ বোধহয় সেই শব্দের মধ্যে একটা আশ্বাস খুঁজে পেল। উৎসাহিত হয়ে সে আমাকে অনুরোধ করলো,—বাবা আমাকে তুমি সাঁকো পর্যন্ত নিয়ে চলো। শুনেছি ইরাবতী নদীর সাঁকোটা এখান থেকে বেশি দূরে নয়। যদি আমাকে সাঁকো পর্যন্ত পৌছে দাও, তোমাকে জীবনভোর আশীর্বাদ করবো বাবা।

—আমিও তো ওই সাঁকো পর্যন্ত যেতে চাই। ওই পর্যন্ত যেতে পারলে হয়তো এ যাত্রা বেঁচে যাবো। নিজেই পৌছতে পারবো কি না ঠিক নেই, আপনাকে কি করে নিয়ে যাবো?

বৃদ্ধের সেই এক অনুরোধ। আমাকেও নিয়ে চলো, বাবা। আমাকে ফেলে যেও না।

বৃদ্ধের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে আমি পা চালালাম। বৃদ্ধ হামাগুড়ি দিয়ে আমার পিছনে পিছনে আসতে লাগলো। সে একই

আবেদন জাওড়ে যাচ্ছিল।

—আমাকে নিয়ে চলো, বাবা। আমাকে ফেলে যেও না, বাবা।

সে আমার পা জড়িয়ে ধরলো আর বলতে লাগলো,—আমাকে সাঁকো পর্যন্ত নিয়ে চলো, বাবা। আমাকে এখানে একা ফেলে রেখে যেও না, বাবা।

বৃদ্ধ আমার পা জড়িয়ে ধরে মিনতি করতে লাগলো। আমি সজোরে এক ঝটকায় আমার পা ছাড়িয়ে নিলাম। বৃদ্ধ ধাক্কা খেয়ে গড়াতে গড়াতে রাস্তার পাশে একটা গর্তের মধ্যে গিয়ে পড়লো। রুগী ডুকরে কেঁদে উঠলো আর ভয়ার্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

অনেকদিন আগে জ্যাক লণ্ডনের একটা গল্পে পড়েছিলাম আমেরিকার প্রাচীন বাসিন্দাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত ছিল। বাপ বুড়ো হলে জওয়ান ছেলেরা তাদের বাপকে বরফাবৃত প্রান্তরে ছেড়ে দিয়ে আসে। সঙ্গে সাতদিনের খাবার, জল আর কিছু তামাক ও অনুকম্পাবশত রেখে আসে।

কিন্তু এসব তো আদিম যুগের কাহিনী। মানুষ যখন আরণ্যক জীবনযাপন করতো, হিংস্রতা ও বর্বরতাই যখন ছিল জীবিকার উপায়, এ নিষ্ঠুর প্রথা তখনকার। তখন খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় কম হতো, উষ্ণ ও শুষ্ক হাওয়ায় তৃণাঞ্চল শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যেতো। প্রকৃতির নিষ্ঠুর নিপীড়নের হাত থেকে বাঁচার জন্যে যাযাবরের মতো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হতো তখনকার দিনের মানুষদের।

কিন্তু এখন তো সভ্যতা ও সমৃদ্ধির যুগ। সভ্যতা নিয়ে মানুষের কত না বড়াই! আমার দু পাশে আখের খেত। দূরে কোথাও নদীর ওপর বিশাল সেতু। আর কাছাকাছি কোথাও রেলগাড়ি চলেছে সিটি মারতে মারতে। মানুষের শক্তির মাহাত্ম্য ঘোষিত হচ্ছে ওই ধ্বনি-পুঞ্জের মধ্যে।

কিন্তু খাদের মধ্যে পড়ে যাওয়া ওই বৃদ্ধ নির্বাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে কি জানতে চাইছে? খানাখন্দের এই গভীর অন্ধকারের

মধ্য থেকে মানুষের সত্যিকার মনুষ্যত্ব কবে জ্যোতির্ময় রূপ নিয়ে দেখা দেবে ? এই প্রশ্নই কি করছে ওই শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ ?

চুলোয় যাক্। আমি মনের দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলতে চাইলাম। মনে মনে বললাম, মনুষ্যত্বের ধ্বজা উড়োবার দায়িত্ব কি একা আমার ওপর বর্তেছে নাকি ? বৃদ্ধের জোয়ান ছেলেরা বাপকে রাস্তার ওপর ফেলে চলে গেল, তাকে বাঁচাবার দায়িত্ব কি আমার ? মরুক বুড়ো। আমার কিছু করার নেই। হারামজাদা কুকুর তুই যদি এর জন্যে ফের আমাকে ভর্ৎসনা করিস তাহলে লাথি মেরে তোর হাড়গোড় চুরচুর করে দেবো। রুমীকে লাথি মারার জন্যে পা তুলতেই ও দ্রুত সরে গেল।

রাস্তাটা কিছুদূর পর্যন্ত গিয়ে একটা চওড়া রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। এ রাস্তা দিয়ে একটা দল চলে গিয়েছে বোঝা গেল। কারণ রাস্তার ওপর একটা হাত পড়ে আছে। শুধুই একটা হাত, দেহের বাকি অংশ নেই। ধড়, মাথা, দুটো পা, আর একটা হাত কিছুই নেই। জানি না সেগুলো কোথায় ? হাতখানা আমার রাস্তা বন্ধ করে পড়ে আছে। হাতের আঙুলগুলো আকাশের দিকে ছড়ানো।

শুধুই একটা হাত; একটা বাহু। হাতটা খোলা, যেন আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। যার হাত সেই মানুষটা হয়তো কোনোদিন এই হাত দিয়ে হালচাষ করেছে; হয়তো ডাণ্ডাগুলি খেলেছে। এই হাত দিয়ে হয়তো কোনো মেয়ের কোমর বেষ্টন করেছে; কোনো শিশুকে কোলে তুলে নিয়েছে; হয়তো কারোর নাকের কাছে সুগন্ধী ফুল তুলে ধরেছে কিংবা কারো চুলে বিলি কেটেছে। এই হাত হয়তো সাঁকো বানিয়েছে, ঘরবাড়ি, রাস্তা তৈরি করেছে। ফুলের গাছ রোপণ করেছে এই হাত। প্রিয়তমার গালে হাত বোলাতে বোলাতে মানুষটা হয়তো ভবিষ্যতের কত মধুর স্বপ্ন রচনা করছে।

শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হাতটা আজ মাটিতে পড়ে আছে। একেলা একটা হাত শুধু খোলা আকাশের নিচে বিছানো। এই হাত কার ? কোনো হিন্দুর ? না কোনো মুসলমানের ? শিখ না কোনো খ্রীষ্টানের ?

হাতটা কিছুই বলছে না, শুধু হাতের পাঁচটা আঙুল আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। চুপচাপ যেন আকাশ দেখছে। কার হাত? যার হাত সেই মানুষটা আজ কোথায়?

হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে আমি হেসে উঠলাম। বোকার মতো কী সব আজেবাজে প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলে হয়তো শরণার্থীদের একটা দলকে ধরা যাবে।

এক লাফে আমি হাতটা ডিঙোলাম। তারপর চলতে শুরু করলাম।

কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর একটা শব্দ কানে এল। যন্ত্রণা-কাতর একটি মেয়ের করুণ আর্তনাদ।

কাছে গিয়ে একটি মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ালাম। রাস্তার একধারে তিনটি শিশুর মৃতদেহ পড়ে আছে। তাদেরই পাশে একজন স্ত্রীলোক রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তার কোমরের কাছে চাপ চাপ রক্ত পড়ে আছে। কোমর থেকে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে।

আমাকে দেখেই স্ত্রীলোকটি বলল,—আমাকে মেরে ফেল, আমি আর পারছি না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম,—কে মেরেছে তোমাকে? কোনো মুসলমান কি?

স্ত্রীলোকটি বলল,—না, আমার স্বামী। আমার সন্তান তিনটিকে হত্যা করে তিনি আমাকেও শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যু আমাকে নেয়নি। এমন কঠিন প্রাণ, কিছুতেই বেরুতে চাইছে না।

—কেন তোমার স্বামী এমন করলো? কি হয়েছিল তোমাদের?

স্ত্রীলোকটি যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বলল,—আমরা একটা দলের সঙ্গে যাচ্ছিলাম। পিছনের দিকে ছিলাম আমরা। মুসলমানরা যখন আমাদের দলটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার স্বামী তখন দাঙ্গাবাজদের মোকাবিলা করার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছিল। আমি তার হাত টেনে ধরে বললাম,—তুমি কোথায় যাচ্ছ? তুমি চলে গেলে আমাকে ও আমাদের বাচ্চাদের কে দেখবে? আমার স্বামী রেগে

গিয়ে ছুরি বের করে তিনটি বাচ্চাকে খুন করলেন। ভয় পেয়ে আমি পালিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার স্বামী আমাকে তাক করে ছুরিটা ছুঁড়লেন। ছুরিটা আমার কোমরে বিঁধে গেল। তারপর আমি আর কিছু জানি না। দলটা বোধহয় চলে গেছে। আমার স্বামীও। আমি আর পারছি না ভাই, তুমি আমাকে শেষ করে দাও। প্রাণটা কিছুতেই বেরুচ্ছে না।

আমি বললাম,—কাল সকালের মধ্যেই তোমার প্রাণটা এমনিতেই বেরিয়ে যাবে। আমাকে আর পাপের ভাগী কেন করতে চাইছ।

ওকে অতিক্রম করে আমি এগিয়ে চললাম। কিন্তু ওর শাপ-শাপান্তের ভাষা অনেক দূর পর্যন্ত আমার কানে এসে বাজতে লাগলো।

ওরে হারামজাদা, আমার কথা রাখলি না। ভাল হবে না তোর বলে দিলাম। তোর ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যাক (সম্ভবত পুড়ে ছাই হয়েই গেছে), তোর মা মরে যাক (সম্ভবতঃ তিনি আর বেঁচে নেই), তোর ছেলেপুলেরা না খেতে পেয়ে মরুক (সম্ভবতঃ মরেই গেছে তারা), ওরে বদমাশ, আমার সামান্য একটা অনুরোধ রাখলি না। ভালো হবে না তোর।

হাঁটতে হাঁটতে আমি এতই অবসন্ন বোধ করলাম যে মনে হলো আমি বোধহয় হাজার হাজার মাইল হেঁটে আসছি। ক্লান্তি আমার শেষ শক্তিটুকু নিঙড়ে নিয়েছে। আর চলার ক্ষমতা নেই আমার। আখের খসখসে পাতার মধ্যে টাল খেয়ে আমি পড়ে গেলাম। আমার চোখের সামনে একরাশ অন্ধকার, মাথার মধ্যে সুতীব্র যন্ত্রণা। আচ্ছন্নের মতো পড়েছিলাম কিংবা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম এবং শরীরে খানিকটা শক্তিও, তখন সকাল। সূর্য উঠেছে। দেখলাম রুমী আমার পায়ের কাছে শুয়ে আছে : শরণার্থীদের একটা দল যাচ্ছিল। আখখেত থেকে বেরিয়ে এসে একলাফে আমি ওই দলে ভিড়ে গেলাম। আমার দেহমন অবসাদে এমনই আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে যে ভাবনা চিন্তা করার মতো

ক্ষমতা নেই। চিন্তাভাবনাহীন, বেপরোয়ার মতো আমি ওদের দল নিলাম। ওরা প্রাণভয়ে ছুটছিল। আমিও যন্ত্রচালিতের মতো ওদের পিছু নিলাম। জানি না ওরা কোথায় যাচ্ছে, আমিই বা কোথায় যাচ্ছি। তবে এটা বুঝতে পারছি কোথাও না কোথাও যাচ্ছি, কোথাও না কোথাও পৌঁছবোই। দিক্‌ভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত এই শরণার্থীর দল কোথায় পৌঁছবে জানি না। যেখানেই হোক পৌঁছবে তো। যা হবার তা হোক।

অনেক ভেবেছি। আর নয়।

পাঁচ

শরণার্থীদের মধ্যে যে ছোট্ট দলটি গোটা দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছিল আমি তাদের সঙ্গে মিশে গেলাম। আমার সামনে চারজন শিখ যুবক তাদের বাপকে খাটে শুইয়ে বয়ে নিয়ে চলেছে। খাটের ওপর নানা আকারের পোঁটলাপুঁটলি বৃদ্ধের চারপাশে রাখা হয়েছে। আমার কাছাকাছি এক শিখদম্পতি চলেছে। দু'জনের মাথায় ভারী বোঝা। শিখটির মুখে কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা হাতে উন্মুক্ত কৃপাণ। আমার পিছনে ছই দেওয়া একটা গরুর গাড়ি আসছে। দুটো বলদ গাড়িটাকে টেনে আনছে। এই গাড়ির মধ্যেও রয়েছে একটা শিখ পরিবার। সংসারের দামী মালপত্রে গাড়িটা ঠাসা। বেশ বড় জমিদার পরিবারের লোকজন বলেই মনে হয়।

আমার পাশাপাশি চলেছে এক বেনিয়া। গায়ের রঙ কালো, সাদা চুল, সাদা গোঁফ। ধুতিটা মালকোচা দিয়ে পরা। বেনিয়ার এক হাতে একটা বোঁচকা, অন্য হাতে সে তার মেয়ের হাতটি শক্ত করে ধরে রেখেছে। মেয়েটি পরমাসুন্দরী। পরিপূর্ণ যৌবনের রসে ভরপুর। আয়ত চোখের ঘন পল্লবের ফাঁকে মেয়েটি যখন কারোর দিকে তাকাচ্ছে, তার বুকের মধ্যে তখন তরঙ্গ হিল্লোলিত হয়ে উঠছিল। মেয়েটি বেশ সচেতন। ওর শরীরে যৌবনের এমনই একটি

আকর্ষণ রয়েছে যা সবাইকেই টানছে। ওর যৌবনের আকর্ষণ এমনই অমোঘ যা এড়িয়ে চলা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। মেয়েটিকে দেখে মনেই হয় না যে সে আর পাঁচজনের মতো ভয় পেয়ে পালানো কোনো প্রাণী। সে যেন রূপের পসরা নিয়ে সবাইকে টেনে নিয়ে চলেছে। ন্যুব্জ, কুব্জ, ভীত সন্ত্রস্ত যাত্রীদলের মধ্যে মেয়েটিকে একটি উজ্জ্বল শিখা প্রদীপের মতো মনে হচ্ছিল। সবাই চলতে চলতে তার দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। কিংবা বলা যায় সবাইয়ের চোখকে মেয়েটি চুম্বকের মতো তার দিকে টেনে আনছে। এক লহমার জন্যে হলেও যাত্রীরা মেয়েটির শরীর একবার জরিপ করে নিচ্ছিল। মাথার ওপর মৃত্যুর সামিয়ানা টাঙানো তবু ক্ষণিকের জন্যে হলেও মেয়েটি সবাইয়ের মন থেকে মৃত্যুচিন্তা দূর করে দিয়েছে।

আমি বেনিয়ার পাশাপাশি হাঁটছিলাম। মেয়েটির সান্নিধ্যের উত্তাপে বলা বাহুল্য আমিও বেশ তাজা হয়ে উঠেছি। আমি বুড়োর সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলাম।

—কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

—আসছি কোথাও থেকে। তোমার কি দরকার? বুড়োর কণ্ঠস্বরে তীব্র ঝাঁঝ।

আমি পাত্তা দিলাম না। আবার প্রশ্ন করলাম।

—এটি তোমার মেয়ে?

—আমার নয় তো কার? তোমার?

চোখের আগুনে বুড়ো আমাকে ভস্ম করে দিতে চাইল, তারপর মেয়ের হাত আরো জোরে চেপে ধরে হাসতে লাগল। মেয়েটি এবার আমার চোখের দিকে তাকাল। মনে হলো নীল সরোবরে দুটি শ্বেত পদ্ম যেন! সরোবরের স্বচ্ছ জলে ঢেউ উঠেছে। আমার মনে হলো আমি যেন নীল সরোবরের গভীরে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছি। নির্মল বিকশিত ফুলের মতো মুখমণ্ডল, চোখে মদির দৃষ্টি, শ্যাম্পেনের মাদকতায় আমি আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছি।

অননুভূত এক উপলব্ধি। আমি কেমন অস্বস্তি বোধ করলাম

চোখ ফিরিয়ে নিলাম আমি। এ সব ব্যাপারে আমি আনাড়ি। দুর্বল চিত্তের মানুষ। বরক, মির্যা, হাজী আমার এই দুর্বলতার কথা জানতো।

এ সব ব্যাপারে ওরা খুবই দক্ষ। প্রেমঘটিত ব্যাপারে গোপনীয়তা ও নিজেদের দুর্বলতা কি ভাবে ঢেকে রাখতে হয় তা ওরা জানে। আমি বোকার মতো, গাধার মতো কিছুই গোপন রাখতে পারতাম না। সহজেই ধরা পড়ে যেতাম।

বেনিয়ার রাগী চেহারা আর তপ্ত মেজাজ সত্বেও ওর সঙ্গে গল্প করার লোভ আমি সম্বরণ করতে পারলাম না। কিন্তু মেয়েটির পাশে এক তরুণ শিখকে আসতে দেখে আমি ঈর্ষা বোধ করলাম। মনে হলো আমার অধিকারে যেন ভাগ বসাতে এসেছে সে। শিখ যুবকটি ছ' ফুটের ওপর লম্বা। বলিষ্ঠ ও কমনীয়তার সংমিশ্রণ। তার ওপর ওর দাড়ি যেন সৌন্দর্যের আর একটি মাত্রা যোগ করেছে। মেয়েটির সঙ্গে শিখ যুবকটির আলাপ হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে ওরা পাশাপাশি হাঁটছে এবং দৃষ্টি বিনিময়ের মাধ্যমে নীরব ভাষায় একটা সমঝওতা হয়েছে বলে মনে হয়।

আমি বুকের মধ্যে জ্বালা অনুভব করতে লাগলাম। একদিকে জ্বালা অন্যদিকে শিখ যুবকটির সঙ্গে আমার যোগ্যতার তুলনার কাজটাও চলছে মনের মধ্যে। নিজেকে ওর তুলনায় খুবই অযোগ্য মনে হলো। তা ছাড়া এও বুঝলাম এ খেলায় আমার হার অনিবার্য। শিখ যুবকটি আসার পর মেয়েটি একবারও আমার দিকে তাকায়নি।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রূপসী মেয়েটিকে শেষবারের মতো দেখে নিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম। নিজের গ্রামের লোক, কিংবা চেনা জানা কোনো মানুষ আছে কি না খোঁজ করতে লাগলাম। গ্রামের কোনো মানুষের সঙ্গে দেখা হলে দুটো লাভ। হয়তো তাদের কাছে আমার পরিবারের, স্ত্রী-পুত্রের সংবাদ পেতে পারি। কিছু খাবারও জুটতে পারে। ক্ষুধা তৃষ্ণায় খুবই কাতর হয়ে পড়েছি আমি। অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম কিন্তু কোনো চেনা মানুষকেই পেলাম না।

আখের খেত শেষ হয়ে গিয়েছে। নদীতীরের লম্বা লম্বা ঘাসে ভরা মাঠের শুরু এখান থেকে। কয়েকটা ঢিবির ওপর মেটে রঙের পাতায় ছাওয়া ঝোপ। দূরে দিগন্তরেখায় ইরাবতী নদীর তটরেখা গিয়ে মিশেছে। আকাশ ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মাটি শুকনো, কোথাও কোথাও ফেটে গেছে। সকলেরই মাথা থেকে পা পর্যন্ত ধুলো কাদায় ভরা। অনেকেই উঁচু ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে কপালের ওপর আড়াআড়ি ভাবে হাত রেখে বাবা নানকের পুলটা দেখা যায় কি না সেই চেষ্টা করছিল। কিন্তু না, পুলটা ওরা দেখতে পেল না। হতাশায় ওরা ভেঙে পড়লো। পুলটাকে কি আকাশ কিংবা মাঠ গ্রাস করে নিয়েছে? পুলটাকে দেখা না গেলেও অবেবু চোখের দৃষ্টি দূরে প্রসারিত করে উদভ্রান্ত ব্যাকুলতায় ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দলের নেতা অনেক চিন্তা ভাবনা করে, জায়গার অবস্থান দেখে বুঝতে পারলেন তাঁরা রাস্তা ভুল করেছেন। পুল পর্যন্ত পৌঁছতে হলে পশ্চিম দিকে আরো মাইল তিনেক হাঁটতে হবে। তারপর ডান দিক থেকে বাম দিকে আরো মাইল খানেক গেলে পুলটা পাওয়া যেতে পারে। দলনেতা বললেন সবাইকে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে নিতে, তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার যাত্রা শুরু হবে।

এখন দুপুর। একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে সবাই হাত পা ছড়িয়ে বসেছে। কোথাও দশজন, কোথাও বিশজন এ ভাবে দলবদ্ধভাবে সবাই বসে গেল খেতে। হিন্দু ও শিখ যুবকেরা লাঠি ছোরা তরোয়াল নিয়ে সব দিকে নজর রাখছিল। কারো কারো কাছে পিস্তলও ছিল। তারাও চতুর্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে ঘোরাফেরা করছিল। যাদের কাছে শুধু লাঠি রয়েছে তারা লাঠি নিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় সে দিকে তাকিয়ে ছিল। সকলেই স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করছে কিন্তু মনের মধ্যে যে আতঙ্কের মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে তা আর গোপন থাকছে না। প্রত্যেকের দৃষ্টিতেই প্রকাশ পাচ্ছিল মৃত্যু আশঙ্কার ছিন্নভিন্নতা। জীবনের চাইতে মৃত্যু-চিন্তাই প্রবল সকলের মধ্যে। বেশিক্ষণ ওদের সঙ্গে থাকতে পারলাম না। মনের ভার বদলের

প্রয়োজন খুব বেশি করে অনুভব করলাম। তাই যে দলের সঙ্গে সেই বেনিয়া ও তার মেয়ে খেতে বসেছিল পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেলাম।

মেয়েটি বাপের পাশে মাথা নিচু করে চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছিল। সেই সুশ্রী শিখ যুবকটি মাথা খাটিয়ে চমৎকার বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। মেয়েটির দিকে পিঠ রেখে সে খেতে বসেছে। তার মুখ দেখলেই বোঝা যায় যে খাওয়ার মধ্যে সে বিশেষ একটা তৃপ্তি ও তাৎপর্য খুঁজে পাচ্ছে। সবাই কাছাকাছি থাকতে চায় তাই জায়গা সংকীর্ণ। অল্প জায়গায় ঘেঁষাঘেঁষি করে সবাই খেতে বসেছে। শিখ যুবকটি পরিস্থিতির ষোল আনা সুযোগ নিয়েছে। তার পিঠ মেয়েটির পিঠ স্পর্শ করেছে। আমি অনুভব করছিলাম এই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে দু'জনের দেহেই বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলা করছিল। বলা বাহুল্য আমি ভিতরে ভিতরে জ্বলছিলাম। একই সঙ্গে পেটের জ্বালা ও মনের জ্বালায় আমি যেন ক্রমশঃই নিস্তেজ হয়ে পড়ছি। তবে শেষ পর্যন্ত পেটের জ্বালাই প্রবল হয়ে উঠল। তাই কিছু খাবার সংগ্রহ করার চেষ্টায় আমি সুন্দরী মেয়ের আকর্ষণ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলাম।

দু'চারজনের কাছে খাবার চাইলাম। দিল না তারা। উদ্বৃত্তটা তারা আগামী দিনের জন্যে রেখে দিতে চায়। এখন দান ধ্যানের সময় নয়। সেই ধনী পরিবারটি যারা গরুর গাড়ি করে চলেছে তারাও কিছু দিল না। অনেক কিছুই তারা পিছনে ফেলে এসেছে কিন্তু গর্বের ভাবটুকু ছেড়ে আসতে পারেনি। ওদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় ওরা যেন গরুর গাড়িতে চড়ে যাচ্ছে না, যাচ্ছে দামী বুইক গাড়িতে চেপে।

তবু খেতে পেলাম। এক শিখদম্পতি আমাকে ডেকে কিছু খাবার দিলেন। ভদ্রলোকের নাম সর্দার লহনা সিং। খুব ভালো লাগলো ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে। প্রকৃতই ভদ্র এবং তেজোময় ব্যক্তিত্ব।

আমার আধাআধি খাওয়া হয়েছে এমন সময় শিবির পিছন দিকে

ধুলোবালির ঝড় উঠল। যারা পাহারা দিচ্ছিল তারা চিৎকার করে জানিয়ে দিল মুসলমানের দল আসছে। অমনি ছুটোপাটি শুরু হয়ে গেল। কান্নার রোল উঠল। যে যেদিকে পারল পালাতে শুরু করল। খাবারদাবার মাটিতেই পড়ে রইল। সেই জমিদারদের ছেলেরা গরুর গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে কাঁদতে শুরু করল : ওদের মা বুক চাপড়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল।

আমার অন্নদাতা লহনা সিং-এর স্ত্রী স্বামীর হাত শক্ত করে ধরে ছিল। কিন্তু লহনা সিং স্ত্রীর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বিদ্যুৎবেগে দাঁড়িয়ে পড়ল। লহনা সিং স্ত্রীকে বললেন,—তোমার হাতের চুড়িগুলো ভেঙে ফেল। মনে কর তোমার স্বামী মরে গেছে।

লহনা সিং দাঁতে দাঁত চেপে কথাগুলো বলল।

লহনা সিং-এর স্ত্রী এক হাতের কব্জির ঘায়ে অন্য হাতের কাঁচের চুড়িগুলো ভেঙে ফেলল। তার দু চোখ জলে ভরে গেল কিন্তু একটি কথাও সে বলল না।

এক লহমার জন্যে স্ত্রীর দিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে ছুরি বাগিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্যে প্রতিরোধবাহিনীর সঙ্গে এগিয়ে গেল লহনা সিং।

মাথার ওপর বোঁচকা নিয়ে তার স্ত্রী সজল নয়নে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

এদিকে বেনিয়া বুড়ো জিনিসপত্র সামলাতে সামলাতে চিৎকার করে উঠল,—আমার মেয়েকে নিয়ে গেল। ওগো তোমরা আমার মেয়েকে এনে দাও।

যমুনা, যমুনা···মেয়ের নাম ধরে সে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল।

যমুনাকে কোথায় পাবে বুড়ো? পালাবার হিড়িক উঠতেই সেই শিখ যুবক পাঁজাকোলা করে তাকে নিয়ে আখ খেতের দিকে পালিয়েছে। সবাই তখন যে যার নিজের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত। নিজেদের প্রাণ বাঁচাবে, না কার মেয়ের ইজ্জত নষ্ট হচ্ছে তা দেখবে!

বুড়োর কান্নায় কর্ণপাত করার মতো অবস্থা কারোরই ছিল না। সবাই পালাচ্ছে। আমিও পালালাম।

বুনো গাছপালার ঝোপের দিকে মুসলমানরা থাকতে পারে এই ভেবে অন্যদিকে নদীতীরের দিকে ছুটতে লাগলাম। কিন্তু কিছুটা গিয়েই দেখতে পেলাম মুসলমান ঘোড়সওয়ারের দল নদীর দিকে যাওয়ার রাস্তা আটকে ফেলেছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। আখ খেতের দিকে ছুটতে লাগলাম। কিন্তু আখ খেত পর্যন্ত পৌঁছতে পারলাম না। আখ খেত থেকে একদল মুসলমান বেরিয়ে এল। তাদের মধ্যে একজন আমার বুকের ওপর বল্লম উঁচিয়ে ধরল।

ওই মুহূর্তটির স্মৃতি আমার অক্ষরে অক্ষরে মনে আছে। কোনো-দিনই বোধহয় ভুলতে পারব না। বল্লম আমার বুক স্পর্শ করেছে। চারপাশে মুসলমান দাঙ্গাবাজ, তাদের পিছনে একজন ঘোড়ার পিঠে রেকাবে পা রেখে বসে আছে। মাথার পাগড়ীতে মুখের অর্ধেকটা ঢেকে রেখেছে সে। চোখ দুটিই শুধু দেখা যাচ্ছে।

আঘাত ঠেকাবার জন্যে আমি দ্রুত দুটি হাত তুলে ধরে ঘোড়-সওয়ারের চোখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হেসে বললাম :

—ভাগ্যের কী অদ্ভুত পরিহাস! জীবনভর কম্যুনিস্ট হয়ে পাকিস্তানের জন্যে প্রোপাগাণ্ডা করলাম। মুসলমানেরা যাতে তাদের প্রাপ্য স্বাধীনতা পায় তার জন্যে সারা জীবন লড়াই করলাম, ক্ষক্ষতি স্বীকার করলাম, আর আজ যখন স্বপ্ন সফল হলো, পাকিস্তানের জন্ম হলো, তখন আমারই বুকের কাছে বল্লম উঁচিয়ে ধরা হয়েছে।

জানি না কেমন করে এমন সংলাপ আমার মুখ থেকে উচ্চারিত হলো। জানি না সে কোন্ শক্তি যা আমাকে দিয়ে এমন লাগসই কথা বলাল। কস্মিনকালেও আমি কম্যুনিস্ট ছিলাম না। রাজ-নীতিতে আমি কোনোদিনই অংশ গ্রহণ করিনি। রাজনীতির প্রতি আমার কোনো আসক্তিই ছিল না। আমি আহার-বিহার-প্রিয় একটি আমুদে মানুষ। বন্ধুদের সঙ্গে মিলে হৈহল্লোড় করতেই আমার ভালো লাগে। আর বন্ধু নির্বাচনেও জাতি-ধর্ম-বর্ণের কথা কোনো-

নি বিচার করিনি। হিন্দু-শিখ-মুসলমান সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই আমার বন্ধু আছে। সকলের সঙ্গেই আমার হৃদ্যতা, অন্তরঙ্গতা।

লাহোরে আমার নিজের ব্যবসা ছিল। কাজের পরে সন্ধ্যায় আমরা চার বন্ধু মিলিত হতাম। তাস খেলতাম। গান-বাজনায় অংশ নিতাম। পান-আহার নিয়ে মত্ত থাকতাম। রাজনীতি তার চৌহদ্দিতে প্রবেশ করতে পারত না। রাজনীতি সম্পর্কে আমার জ্ঞান বলতে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কিছু আলোচনা করা, খবরের কাগজের পরস্পর-বিরোধী কিছু লেখা ও খানকতক বই পড়া—এর বেশি কিছু নয়। আর কম্যুনিজম-এর বিন্দুবিসর্গও আমি জানি না। কম্যুনিস্টরা ভুখা মানুষদের কথা বলে এটুকুই শুধু জানি। যে ভাবেই হোক, প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে কথাগুলি বলে ফেলেছি। এ নিয়ে পরে অনেক ভেবেছি, উত্তর পাইনি।

যাই হোক, দাঙ্গাবাজদের সর্দার ঘোড়সওয়ারের ওপর আমার সংলাপ কিন্তু বিদ্যুতের মতো কাজ করল। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার নির্বিকার হাসি হাসি মুখের দিকে তাকাল। তারপর হাতের ইশারায় সাকরেদদের ইঙ্গিত করলো।—ছেড়ে দাও ওকে।

বল্লমধারী আমার বুকের ওপর থেকে বর্শা সরিয়ে নিল। তারপর 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনিতে চতুর্দিক কাঁপিয়ে ওরা এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো একটা দলের ওপর।

আমার কাছেপিঠে কেউ নেই দেখে আমি উল্টো দিকে দৌড়তে শুরু করলাম। কি ভাবে পালালাম, কোন্ দিকে গেলাম সে সব কথা আমার মনে নেই। শুধু এইটুকু মনে আছে যে শরীরের সবটুকু শক্তি জড়ো করে আমি ছুটছিলাম। কখনো আখ খেতের ভেতর দিয়ে, কখনো উঁচুনিচু জমির ওপর দিয়ে ছুটছিলাম। কখনো খানাখন্দে পড়ে যাচ্ছি, কখনো নালা লাফিয়ে পার হচ্ছি, কখনো রেল লাইন ধরে ছুটছি। শিকারীতাড়িত জানোয়ার যে ভাবে পালায় আমিও ঠিক সেই ভাবেই ছুটছিলাম। হ্যাঁ, প্রাণভয়ে ভীত জন্তু ছাড়া আর কী আমি! আমি ছুটছি, ছুটছি। কোন্ দিকে ছুটছিলাম কী উদ্দেশ্যে

ছুটেছিলাম, কেন ছুটেছিলাম এসব প্রশ্নের জবাব আমার জানা নেই।

তবু মনে আছে নিজেকে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম দরবারসাহেব করতারপুরের গুরুদ্বারের সামনে। তখন সন্ধ্যে। গুরুদ্বারের দরজায় একটা বড় মজবুত তালা ঝুলছিল। দরজার পাশে একটি পুরনো তক্তপোশের ওপর বসে এক বৃদ্ধ শিখদম্পতি উচ্চকণ্ঠে গ্রন্থসাহেব পাঠ করে চলেছেন। আমাকে দেখে তাঁরা থামলেন। ওঁদের দেখে আমি অবাক হলাম। মৃত্যুর তাণ্ডব লীলার মাঝখানে ওঁরা কেমন ধীর, স্থির, ভক্তিভরে গ্রন্থসাহেব পাঠ করে চলেছেন।

আমি শ্রদ্ধাভরে জিজ্ঞেস করলাম,—বাবাজী আপনারা এখনো বসে আছেন? আপনারা কি কিছু জানেন না?

বৃদ্ধ শিখ প্রশান্ত ভঙ্গিতে বললেন,—সবই জানি বাবা। জেনেও এখানে বসে আছি। কোথায় যাবো বলো তো? আমাদের নিজের বলতে কেউ নেই, কিছু নেই। সন্তান নেই, আত্মীয় নেই। ঘরবাড়ি সম্পত্তি কিছুই নেই। গুরুর চরণ আশ্রয় করেই কেটেছে আমাদের সারাটা জীবন। শেষ সময়েও গুরুর কাছে থেকেই মরতে চাই।

কথা শেষ করে দুজনেই আবার গ্রন্থসাহেব পাঠ শুরু করলেন।

আমি লজ্জায় মাথা নিচু করে ওঁদের কাছ থেকে সরে এলাম। গুরুদ্বারের চারপাশ ঘুরে দেখলাম। জনমানবের চিহ্ন নেই কোথাও। এদিকে রাত হয়ে গেছে, রাস্তার হদিশ পাচ্ছি না। কোথায় যাবো স্থির করতে পাচ্ছি না। গুরুদ্বারের চত্বরে একটা কুয়ো চোখে পড়ল। কুয়োর বাঁধানো পাড়ে উঠে পড়লাম। তারপর কপিকলের দড়ি ধরে কুয়োর মধ্যে নেমে এলাম। দড়ি আর জল তোলার পাত্রটা শক্ত করে ধরে ঠাণ্ডা জলে শরীরটা ভিজিয়ে নিলাম। আমার উত্তপ্ত ক্লান্ত শরীরটা জুড়িয়ে গেল। ওই ভাবেই আমি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কি ভাবে, কতক্ষণ, সে সব আমি বলতে পারব না। যখন ঘুম ভাঙলো, দেখলাম সকাল হয়েছে। কুয়োর মধ্যে সূর্যের আলো এসে পড়েছে। আমি কুয়ো থেকে উঠে এলাম। দেখলাম, বৃদ্ধা আকাশের দিকে মুখ তুলে কাঁদছে।

রুমীর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আশ্চর্য একটা জীব। কত বিপর্যয়ের মধ্যে দিন কাটিয়ে এ পর্যন্ত পৌঁছেছি। কি ভাবে এখনো ও আমার সঙ্গে রয়েছে তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি গুরুদ্বারের দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। তক্তাপোশের ওপর বৃদ্ধ শিখদম্পতির মৃতদেহ পড়ে আছে। রাতের অন্ধকারে কখন আততায়ীরা এসে এঁদের খুন করে গেছে টের পাইনি।

ছয়

গুরুদ্বার থেকে বেরিয়ে এসে কয়েক ফার্লং হাঁটার পর পরিষ্কার একটি রাস্তায় এসে পড়লাম। এখান থেকে ইরাবতী নদীর তীর স্পষ্ট দেখা যায়। নদীর ওপর সেতুটিও। কিছু রিফিউজি নদীর দিকে এগোচ্ছিল, তাদের মধ্যে যমুনাকেও দেখতে পেলাম। তবে তার সঙ্গে বৃদ্ধ যোনিয়াও নেই, সেই শিখ যুবকটিও নেই। একটি লালচে মুখ, উদ্ধত পেশোয়ারী যুবকের শক্ত হাতে বন্দিনী হয়ে সে চলেছে। আমি মেয়েটির কাছে এগিয়ে গেলাম। মেয়েটি আমার দিকে একবার তাকাল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চোখ নামিয়ে নিল। ক্ষণিকের জন্যে যখন সে তাকিয়েছিল তখনই দেখেছিলাম দু চোখ তার জলে ভরে গিয়েছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম,—তোমার বাবা কোথায় জানো?

যমুনা উত্তর দিল,—মারা গেছেন।

—আর সেই···তোমার···।

—সেও মারা গেছে?

যমুনা নত মস্তক আরও নত করল। সে যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চায় পেশোয়ারী যুবকটি কটিবন্ধের পিস্তলে হাত রেখে আমার দিকেচোখ রাঙিয়ে তাকাল। তারপর যমুনাকে ধমকের সুরে বলল,—এই এগিয়ে চল্, বকবক বন্ধ কর্।

আমি দ্রুত ওদের কাছ থেকে সরে এলাম। রুমী তখনও ছায়ার

মতো আমার পিছনে রয়েছে। ওকে বারকয়েক ধমক দিলাম কিন্তু ওর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমাকে দেখছিল। ঘন ঘন লেজ নাড়ার মধ্য দিয়ে রুমী ওর খুশির ভাব প্রকাশ করছিল।

কিছুটা এগোবার পর নদীর সেতু আরো স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। কিন্তু সেতুর ওপর দিয়ে নদী পার হওয়া আমার কাছে নিরাপদ মনে হলো না। সেতুর যে অংশ পাকিস্তানের অন্তর্গত সেখানে মুসলমান হামলাকারীদের আস্তানা আবার অন্যদিকে হিন্দু হামলা-কারীদের। দুই দলই যথেচ্ছ লুঠপাট, হত্যা, নারীধর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে। সেতুর ওপর অবশ্য ফৌজী পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে। এক ইংরেজ অফিসার এর দায়িত্বে রয়েছে। তিনি লক্ষ্য রাখছেন সেতুর ওপর দিয়ে যাতে হিন্দু-মুসলমানরা নিরাপদে যাতায়াত করতে পারে। হিন্দুস্থান বা পাকিস্তানে যা ঘটছে ঘটুক তার জন্যে সে দায়ী নয়। তার দায়িত্ব শুধু সেতুর ওপর শান্তি রক্ষা করা।

নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আমি ভাবছিলাম ওপারে যেতে পারলে হয়তো এ যাত্রায় রক্ষা পেয়ে যাবো। কতকগুলি তাঁবু ও চালাঘর দেখতে পেলাম। হিন্দু পুরুষ রমণীরা শুয়ে বসে রোদ পোহাচ্ছিল। একদল মেয়ে একে অপরের মাথার উকুন বেছে দিচ্ছে। কেউ কেউ রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত। কেউ বা নদীতে স্নান সেরে নিচ্ছে। শিশুরা বালি দিয়ে খেলার ঘর বানাচ্ছে, উল্লাসের সঙ্গে ছুটোছুটি করছে। এক কথায় শান্তিপূর্ণ জীবনের এক বর্ণাঢ্য ছবি। নিরাপত্তার আহ্বান। আমি অন্যপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি। সেতুর ওপর দিয়ে এখন মুসলমানদের একটি দল অতিক্রম করছে। এর পর গেট বন্ধ হয়ে যাবে। ভাবছি সেতুর ওপর এখন যাওয়া নিরাপদ নয়। মুসলমানদের দলটিকে অতিক্রম করে যেতে হবে। আবার এখানে দাঁড়িয়ে থাকারও বিপদ আছে। যে জীবনটাকে বহু কষ্টে রক্ষা করে নদীর তীর পর্যন্ত নিয়ে এসেছি, তাকে কূলে এসে শেষ হতে দেবার ঝুঁকি নেওয়ার কোনো মানে হয় না। কিন্তু কোনো সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না। মাথার মধ্যে

চিন্তাভাবনা জট পাকিয়ে যাচ্ছে। পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

রুমী পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে কুঁই কুঁই করছিল। ওকে দেখে আমার মাথায় রাগ চড়ে গেল। ওকে এক লাথি কষিয়ে বললাম,—ভাগ এখান থেকে দূর হ আমার চোখের সামনে থেকে।

রুমী কিন্তু দাঁড়িয়েই থাকলো। একটু দূরে সরে গিয়ে কুঁই কুঁই করতে লাগলো। আরো কিছুক্ষণ ভাবলাম। একটা উপায়ের কথা ভাবছিলাম। মনটাকে দৃঢ় করলাম, সাহস সঞ্চয় করলাম। তারপর পরনের কাপড়টাকে একটানে খুলে ফেলে নদীতে ঝাঁপ দিলাম।

ওপারের কিছু লোক চিৎকার করে উঠলো,—বাঁচাও, বাঁচাও, ওই দেখ একটা হিন্দু ছেলে ডুবে যাচ্ছে।

আমি সাঁতার কাটতে কাটতে ওপারের দিকে এগোতে লাগলাম। রুমী নদীর পারে হতভম্বের মতো নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় ও কেমন বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে। ওর মনের মধ্যে বোধহয় দুটো ভাবনার সংঘাত চলছে। আমাকে অনুসরণ করবে না পেটের বাচ্চাকে বাঁচাবে? ওর চারটি পা থরথর করে কাঁপছিল। কুঁই কুঁই করে আর্তনাদ করছিল ও।

আমি চিৎকার করে বললাম,—রুমী তুই ফিরে যা, ফিরে যা। কিন্তু রুমী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। রুমীর মৃত্যু অবধারিত জেনে আমি আঁতকে উঠলাম। উত্তাল ঢেউ নদীতে। রুমী সমস্ত শক্তি দিয়ে আমার পিছনে আসার জন্যে সাঁতরাতে লাগলো। ওর ছোট্ট থুতনিটা জলের ওপর ভাসছিল। দুটি করুণ চোখে ভয় ও হতাশার সঙ্গে দৃঢ়তা আর সাহসের আশ্চর্য সংমিশ্রণ।

আমি চিৎকার করে বললাম,—এ তুই কী করলি রুমী! ফিরে যাবার চেষ্টা কর। আমার পিছন পিছন আসিস না। বাঁচবি না তুই।

কিন্তু রুমী প্রচণ্ড দৃঢ়তায় আমার পিছনে পিছনে সাঁতরে আসার চেষ্টা করতে লাগলো। দেখতে দেখতে প্রচণ্ড একটা ঢেউয়ের ধাক্কায় ওকে ডুবে যেতে দেখলাম। দেখলাম রুমীর শরীরটা ভেসে অনেক দূরে

সরে যাচ্ছে। ঢেউয়ের মাঝখানে ওর অসাড় চারটি পা এলোপাথাড়ি নড়াচড়া করছে। দেখলাম, ধীরে ধীরে ওর থুতনি, কান জলের তলায় তলিয়ে গেল। ওর শরীরটা বারকয়েক ওলট-পালট হয়ে এক সময় জলের স্রোতে কোথায় হারিয়ে গেল।

তোকেও প্রাণ দিতে হলো রুমী। কেন তুই আমার সঙ্গে এতদূর এলি? আমাকে তো সবাই ছেড়ে চলে গেল। আমার দেশ, আমার সম্পত্তি, ঘরবাড়ি, সংসার সবাই যখন আমাকে পরিত্যাগ করলো তখন তোর কি দায় পড়েছিল আমাকে সঙ্গ দেওয়ার? যে মাটির সঙ্গে আমার হাজার বছরের নাড়ির বন্ধন, সেই বন্ধনের মায়াও ছিন্ন করতে হলো। তুই সামান্য একটা কুকুর হয়ে মায়ার বাঁধন কাটাতে পারলি না? এখনো যে পৃথিবীতে ভালোবাসা আছে, প্রেম যে শক্তিমান, সবরকম ক্ষুদ্রতা নীচতার ঊর্ধ্বে, মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার জন্যেই কি তুই এভাবে জীবন বিসর্জন দিলি? পৃথিবী থেকে মায়া মমতা যে এখনো ধুয়ে মুছে যায়নি তাই কি বোঝাতে চেয়েছিলি মানুষকে? রুমী, কেন তুই এভাবে জীবন বিসর্জন দিলি? কার জন্যে? কে তোর এই আত্মবিসর্জনের মূল্য দেবে? যে মানুষ আজ মনুষ্যত্ব হারিয়ে নিজের লক্ষ্য থেকে বহুদূরে সরে গেছে, জঘন্য হীন কাজে লিপ্ত, নারী শিশু ও বৃদ্ধের রক্তে যাদের হাত কলঙ্কিত তাদের জন্যে তুই পেটের বাচ্চাটাকে পর্যন্ত বলি দিলি?

রুমী আর নেই। ওর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি একটা সত্যেরও মৃত্যু হলো। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। একটা কাহিনী, একটা সভ্যতা, মৃত অতীতে পর্যবসিত হলো।

দু চোখ আমার জলে ভরে গেল। বুঝতে পারছি না, চোখের জলের না নদীর জলের স্রোতে ভেসে চলেছি। কেমন করে আমি ওপারে পৌছলাম সেকথা আমার মনে নেই। হয়তো স্রোতের টানেই আমি পৌঁছে গেছি কিংবা রুমী মৃত্যুর আগে তার সমস্ত শক্তি আমাকে দিয়ে গিয়েছিল। জানি না, কি ঘটেছিল। শুধু মনে আছে

তীরের কাছাকাছি পৌঁছতে কয়েকটি জোয়ান ছেলে আমাকে জল থেকে টেনে তুলেছিল। মনে আছে একটি নারীকণ্ঠ বলেছিল,—হায় হায়, এ যে একেবারে উলঙ্গ। মনে আছে সেই মহিলা তার ওড়না দিয়ে আমার লজ্জা ঢেকে দিয়েছিলেন।

আর কিছু মনে নেই। আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

সাত

সেই দিনটা কাটলো স্থানীয় লোকজনের সেবা শুশ্রূষায়। পরের দিন শরণার্থী শিবিরে খোঁজ করতে গেলাম আমার আত্মীয়স্বজনদের খুঁজতে খুঁজতে তাদের দেখা পেয়ে গেলাম।

আমার জ্ঞানের ভাণ্ডারে দুটি আশ্চর্য শব্দ যুক্ত হলো। ওদিক থেকে যেসব হিন্দু-শিখ এদিকে এসেছে তাদের বলা হচ্ছে শরণার্থী। আর এদিক থেকে যে সব মুসলমান ওদিকে পালাচ্ছে তাদের বলা হচ্ছে মুহাজির। হিন্দুকে কখনই মুহাজির বলা চলবে না। মুসলমানকেও কখনই শরণার্থী বলা চলবে না। মার খাওয়া মানুষদের মধ্যেও এই পার্থক্যটুকু থেকেই গেল।

আমার বাড়ির লোকজন আমাকে দেখে কী যে খুশি হলো বলার নয়। এত খুশি যে তারা কেঁদেই ফেললো। আমার স্ত্রীর পরনে ছিল শুধু ময়লা সায়া আর ব্লাউজ। কারণ ওই অবস্থাতেই সে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। আমাকে দেখে সে একপাশে সরে গেল।

স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম,—মুন্না কোথায়?

আমার স্ত্রী কোনো কথা বলল না। জলে ভরা দুটি চোখ তুলে আমার দিকে একবার তাকিয়েই মাথা নিচু করল। পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগলো। আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। কিছুই আমার মাথায় ঢুকছিল না। আমি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলাম।

অবশেষে আমার ভাই বলল,—মুন্নাকে ওরা মেরে ফেলেছে। আমার বউকেও ওরা ধরে নিয়ে যেতো, কোনোমতে ও পালাতে পেরেছে। সরজুকে ওরা ধরে নিয়ে গিয়েছে।

সরজুকে! আমি আঁতকে উঠলাম। সরজু? আমাদের ছোট বোন? প্রশ্ন দুটো আমার মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল। মাটির ওপর ধপ্ করে বসে পড়লাম আমি। দাঁড়িয়ে থাকার মতো শক্তি আর আমার ছিল না। আমার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছিল। চকিতে আমার মাথায় খুন চেপে গেল। প্রচণ্ড ক্রোধে আমি এমন চিৎকার করলাম যে আমার কানে তালা লেগে গেল। অনুভব করলাম, আমার ধমনির রক্তপ্রবাহ উত্তাল লাভা স্রোতের মতো ফেটে পড়তে চাইছে। চোয়াল, কান সব বুঝি ফেটে যাবে।

আবার জোরে চিৎকার করে উঠলাম,—না, না, এ কখনই হতে পারে না।

আমার ভাই সান্ত্বনা দিতে চাইল। বলল,—হাজার হাজার লোকের জীবনে এমনটি ঘটেছে। তুমি একা তো নও। উত্তেজিত হয়ে লাভ কী! শান্ত হও।

এতদিন আমি নিজেকে পরমতসহিষ্ণু, উদার, প্রগতিশীল হিন্দু বলে মনে করতাম। আমার পরিচিতদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই বেশি। আমি কোনোদিন সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বা সমাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিনি। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে ভেদবুদ্ধির যে রাজনীতি দেশের আবহাওয়াকে কলুষিত করে রেখেছে আমি তাতে কোনো-দিনই অংশ নিইনি। এদের সঙ্গে আমি কোনোদিনই সংস্রব রাখিনি। উদার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, আধুনিক চিন্তাধারার অনুগামী বলেই নিজেকে জানতাম। এই নিয়ে একটা প্রচ্ছন্ন গর্ববোধ ছিল আমার মনে। কিন্তু আজ নিজের সন্তানের হত্যার সংবাদ, নিজের বোনের ধর্ষিতা হবার সংবাদ শুনে আমার রক্তে তুফান উঠলো। জ্বলন্ত আগ্নেয়-গিরির অগ্নিস্রোত আমার সমগ্র সত্তার মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। আমি মুসলমানদের উদ্দেশ্যে গালাগালি দিতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য

তয়ে ভাবতে লাগলাম এত ঘৃণা আমার মধ্যে এলো কোথা থেকে ? এই নতুন ঘৃণার উপলব্ধির জন্যে নিজের ওপরেই বিরক্তবোধ করলাম। নিজের ওপর বিতৃষ্ণা এলো। কিন্তু মুহূর্তেই তা আবার কেটে গেল। প্রতিশোধ নেবার উদগ্র বাসনার স্রোতে আমার শুভবুদ্ধি খড়কুটোর মতো ভেসে গেল। প্রতিশোধ নেবার উন্মত্ততায় একটা পৈশাচিক শক্তির ওপর ভর করে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে আমি চিৎকার করে বলতে লাগলাম,—আমাকে কেউ একটা চাকু দাও। একটা চাকু একটা ছুরি।

আমার ভাই আমার হাত দুটি ধরে বলল,—কি করছো তুমি ?

—সব শেষ করে ফেলবো, সবাইকে খতম করবো। মুসলমান দেখলেই গলা কেটে ফেলবো আমি। আমি চিৎকার করে বলতে লাগলাম।

—দাদা অমন করো না, শান্ত হন।

ছোট ভাই আমাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরলো। আমি এক ধাক্কায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম। তারপর প্রতিশোধ নেবার সঙ্কল্প সবাইকে চিৎকার করে জানাতে জানাতে সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম।

কিছুটা পথ এসে আমি থমকে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম। আমার মতো অবস্থা তো অনেকেরই, তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আমারই মতো প্রতিশোধ নেবার বাসনায় অধীর হয়ে উঠেছে। খোঁজ করে তাদের কয়েকজনকে সঙ্গে নিলে ভালো হয়।

এ জাতীয় লোকের দেখা পেতে বেশি দেরী হয় না। পেয়ে গেলাম তাদের। পাঁচিলের পাশে একটা গাছের নিচে লম্বা লাইন দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেলাম। ছেঁড়া জামা ও ময়লা পাজামা পরা একটি যুবককে জিজ্ঞেস করলাম,—এখানে কি রেশন দেওয়া হচ্ছে ?

—হ্যাঁ, রেশন দেওয়া হচ্ছে সেক্সের। মুচকি হেসে যুবকটি বলল।

—সেটা আবার কী ?—আমার বিস্মিত প্রশ্ন।

—একটি মুসলমান মেয়ে পাওয়া গেছে, আমরা তাকে বেইজ্জত করছি।

আমি লাইনের পিছনে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমার সামনে ছিল পঁচিশজন। দেখতে দেখতে আমার পিছনে আরো পনেরোজন দাঁড়িয়ে গেল।

—এই রেশনের লাইনটা কতদিন থাকবে ভাই?—সেই যুবকটিকে প্রশ্ন করলাম।

—যতদিন না মেয়েটি মারা যায়। যুবকটি উত্তর দিল।

আমি কিছুক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে রইলাম। লাইন ক্রমশঃই দীর্ঘ হচ্ছে। লোক এগিয়ে যাচ্ছে, তবু লাইনের দৈর্ঘ্য কমছে না। হঠাৎ মেয়েটির মর্মস্পর্শী চিৎকার আমার বুকে এসে বিঁধলো। আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। বুকের মধ্যে তোলপাড় হতে লাগলো।

আবার মেয়েটির চিৎকার কী করুণ চিৎকার! চিৎকার করে সে বলছে,— ওরে শয়তান, আমি তোর বোন হই, বোন।

আঙুল দিয়ে দুটো কানের ফুটো চেপে এখান থেকে ছুটে পালালাম। সেই যুবকটি তার ময়লা পাজামা সামলাতে সামলাতে আমার দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে হাসতে লাগলো আর বলতে লাগলো, বুদ্ধু কোথাকার।

নিজের গালে কয়েকটা থাপ্পড় কষিয়ে কাঁদতে লাগলাম। বুকের মধ্যে কষ্ট হচ্ছিল। ভাবলাম, এর চাইতে কিছুক্ষণ আগের মানসিকতায় ফিরে যাওয়াই ভালো। সেই চেষ্টাই করতে লাগলাম। হৃদয়ের সুবৃত্তিগুলিকে মেরে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলাম।

মুন্নার কচি, সুন্দর হাসিমুখটি বুকের মধ্যে আঁকা ছিল। সেই ছবিটি মুছে দিতে চাইলাম। প্রতিশোধ-বাসনাকে উদগ্র করার জন্যে সরজুর সরল, নিষ্পাপ মুখটি মনে করতে চাইলাম। কিন্তু শত চেষ্টাতেও ছোট বোন সরজুর মুখ স্মরণ করতে পারলাম না। তার বদলে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো ধর্ষিতা মুসলমান মেয়েটির করুণ মুখ। আমার হৃদয়ের গভীরে ধ্বনিত হতে লাগলো সেই করুণ আর্তনাদ!

—ওরে শয়তান! ওরে, ওরে আমি তোর বোন।

আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগলাম। দৌড়তে দৌড়তে আমি সেই

সেতুর দিকের রাস্তায় এসে পড়লাম। মুসলমানদের একটি দল কিছু আগে সেখান থেকে চলে গেছে। কিছু লোক তখনো সেখানে অপেক্ষা করছে। তারা মাটিতে একটা কবর খুঁড়ছিল। পাশেই পড়েছিল একটি তরুণের মুণ্ডহীন লাস। মৃতদেহের পাশে বসে মাথাটি কোলে নিয়ে একটি বৃদ্ধ মুসলমান হাউ হাউ করে কাঁদছে। কখনো চোখের জল মুছছে, কখনো মাথাটির কপালে চুমু খাচ্ছে আর বলছে—আমার ছেলে, আমার ছেলে।

বৃদ্ধ মাথাটি নিয়ে ছেলের মৃতদেহের কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসলো। ধড়ের সঙ্গে মাথাটি জুড়ে দেবার বার বার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলো। তার হাত দুটি থর থর করে কাঁপছিল। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নির্বাক মানুষদের দিকে তাকিয়ে সে আবার বলতে লাগলো,—আমার এই একটিই মাত্র ছেলে ছিল। আমার একমাত্র ছেলে।

কবর খোঁড়া চলতে থাকলো, গর্ত যখন গভীর হলো তখন তারা থামলো। বৃদ্ধ শেষ বারের মতো তার ছেলের মুখে চুমু খেল। ছেলেটির মাথা ভর্তি কালো চুল—কপালের ওপর এসে পড়েছে, কোঁকড়ানো কালো চুল। সুন্দর দুটি পাতলা ঠোঁট। ছেলেটির নিষ্প্রাণ মুখটি দেখে মনে পড়ে যায় তক্ষশীলার যাদুঘরে রক্ষিত বুদ্ধমূর্তির কথা।

কবর খোঁড়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় দূর থেকে "সৎশ্রী আকাল" ও "হর্ হর্ মহাদেও" ধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল। শিখ ও হিন্দুরা তাদের ঈশ্বরের জয়ধ্বনি করছে। মুসলমানদের কাছে এ জয়ধ্বনি আতঙ্কের। কবর খননকারীরা তাই তাড়াতাড়ি কবরের মধ্যে লাশ ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দিতে লাগলো। বৃদ্ধ ওদের বাধা দিতে চেষ্টা করছিল। সে চাইছিল তার পুত্রের শেষকৃত্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হোক। কয়েকজন বৃদ্ধের হাত জোর করে সরিয়ে দিতে সে হতাশ হয়ে মোনাজাত করার জন্যে দু হাত তুললো।

দূরাগত ধ্বনি নিকটবর্তী হলো। "সৎশ্রী আকাল", "হর্ হর্

মহাদেও।" মুসলমানেরা তাড়াহুড়ো করে কবরের ওপর মাটি ফেলে দিয়ে পালাতে শুরু করলো।

সবাই পালালো, পড়ে রইল শুধু সেই বৃদ্ধ। কবরের পাশে বসে সুরা ফাতেহা (কোরাণ শরীফের অংশ বিশেষ) পড়তে লাগলো।

'আল্লাহ সব প্রশংসা তোমারই জন্যে। উপরওলা, সারা দুনিয়ার মালিক, রুজি রোজগারের মালিক, তোমারই ধর্ম পালন করছি আমি—তোমার কাছে সাহায্য চাইছি, তুমি পথ দেখিয়ে দাও। সহজ সরল, পবিত্র পথ। যে পথে আমার প্রিয়জনেরা গেছে, সেই পথ আমাকে দেখিয়ে দাও। অন্যায় আর ভুলে ভরা পথ থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখো।'

'সৎশ্রী আকাল। হর হর মহাদেও।'

বৃদ্ধের প্রার্থনা তখনো শেষ হয়নি, একটা বর্শা এসে তাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে গেল। ছেলের কবরের ওপর বৃদ্ধের দেহ লুটিয়ে পড়লো।

মৃত্যুর সময় বৃদ্ধের মুখ থেকে শেষ যে নাম উচ্চারিত হয়েছিল তা ঈশ্বরের-হত্যাকারীদের মুখেও ছিল ঈশ্বরের নাম। নিহত ও নিধন-কারীদের ওপর উর্ধলোকে সত্যিই যদি কোনো ঈশ্বর থেকে থাকেন তবে আমি বলতে বাধ্য তিনি বড়ই কৌশলপ্রিয় অত্যাচারী ঈশ্বর।

আমি সেখান থেকে চলে এলাম। ছুটতে লাগলাম। কিন্তু কোথায় যে পালাবো বুঝতে পারলাম না।

আট

পরের দিন সকালে আমাদের ক্যাম্পে আগুনের মতো একটা খবর ছড়িয়ে পড়লো। খবর এসেছে মুসলমানদের একটা বড় দল সেতুর ওপর দিয়ে পার হয়ে যাবে। দুপুরের দিকে একসঙ্গে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার মুসলমানকে আক্রমণ করা যাবে। খবরটা শুনে হিন্দু ও শিখ যুবকেরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো। প্রচণ্ড উল্লাসে তারা নৃত্য করতে শুরু করলো। তার পরেই শুরু হয়ে গেল আক্রমণের প্রস্তুতি। সময় কম তাই দ্রুত আয়োজন সম্পন্ন করতে সবাই উঠে পড়ে লেগে গেল।

এটা জানাই ছিল সেতুর ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ অফিসার গোটা দলটিকে একসঙ্গে যাবার অনুমতি দেবেন না। তা ছাড়া সময়সীমাও আগের চাইতে কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নদীর এপার ওপার থেকে যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমানদের সেতু অতিক্রম করার সময় দেওয়া হয়েছিল দু' ঘণ্টা করে। এই ভাবেই যাত্রীদের পার হবার রীতি স্থির করা হয়েছিল। কিন্তু দলগুলি এতই বড় যে দু' ঘণ্টার মধ্যে গোটা দলটির পার হওয়া সম্ভব নয়। প্রথমাদককার যাত্রীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা ভালোই থাকতো কিন্তু শেষ দিকে ঢিলে হয়ে যেতো। দু' তরফের লোকেরাই প্রথম দিককার যাত্রীদের চলার পথে বাধা সৃষ্টি করতো না। কারণ তা করতে গেলে ইংরেজ অফিসারের কোপ তাদের ওপর এসে পড়বে। যখন সেতুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইংরেজ অফিসার হাতের ইশারায় জানিয়ে দিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তখন যাত্রীদের মধ্যে ছুটোপাটি পড়ে যেতো। সবাই চেষ্টা করতো পার হয়ে যাবার। যারা দলের পিছনে থাকতো তারা মুষড়ে পড়তো কারণ তারা জানতো যে তাদের জন্যে পথ আবার দু' ঘণ্টা পরে খুলবে এবং এই সময়ে তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। যে যাত্রীরা আটকে পড়তো তাদের ওপর তখন প্রতিপক্ষ আক্রমণ চালাতো। অসংখ্য শরণার্থীদের মুহাজিরদের হত্যা করে, তাদের ধন-

সম্পদ লুঠ করে হামলাকারীরা পালাতো। ইরাবতী নদীর দুই পারে, সেতুর এদিকে ওদিকে হিন্দু, শিখ মুসলমানের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতো।

দুপুর বেলায় সেতু থেকে কয়েকশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে মুহাজিরদের চলে যাওয়া দেখছিলাম। রাস্তার দু' পাশে হিন্দু ও শিখেরা জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। ওরা যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে হাসছে, মসকরা করছে। মুসলমানদের ওরা গালিগালাজ করছে। মুসলমানেরা সব সহ্য করে মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে। মাথায় বোঁচকা, কারো কারো কোলে ছোট বাচ্চা। খাটিয়াতে করে বৃদ্ধ ও অসুস্থদের বহন করে নিয়ে যাচ্ছে কেউ কেউ। বাচ্চাদের বকাবকি করে সামলাচ্ছে কেউ কেউ, অনেকেই এগিয়ে চলেছে মেয়েদের হাত ধরে।

ছোট একটি মুসলমান ছেলে তার বাবার হাত ধরে যাচ্ছিল। রোগামতো একটি ছোট হিন্দু ছেলে মুসলমান ছেলেটির গায়ে থুতু ছিটিয়ে দিল। ছেলেটির মুখ রাগে লাল হয়ে উঠলো। বিদ্যুৎ বেগে ঘুষি পাকিয়ে সে হিন্দু ছেলেটির দিকে ছুটে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি তার বাবা ছুটে এসে তাকে ধরে ফেললো। ছেলেকে নিয়ে ফিরে যাবার সময়ে সেই হিন্দু ছেলেটি ও তার অভিভাবকদের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে সে বলল,—মাফ করো বাবারা, ও নেহাৎ-ই ছেলেমানুষ।

হিন্দু ছেলেটি মুসলমান ছেলেটিকে এগিয়ে আসতে দেখে প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়ে পিছু হটছিল কিন্তু যখন সে দেখল, ছেলেটির বাবাই ক্ষমা চেয়ে ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছে তখন সে বীর বিক্রমে এগিয়ে এসে আবার সরু গলায় মুসলমানদের গালাগালি দিতে শুরু করল। আশ-পাশের লোকেরা ছেলেটির পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল,—'সাবাশ বেটা, সাবাশ বেটা।' বাহাদুর ছেলেকে এইভাবে সবাই তারিফ করলো।

এক আধবয়সী হিন্দু বলল,—দেখুন দেখুন, শালাদের মুখে এখন রা নেই। মরতে বসেছে তো। এর আগে যখন আমাদের দেশে জামাই-আদরে ছিল তখন ওদের রোয়াব দেখে কে? মসজিদের

সামনে কাঁসর-ঘন্টা বাজালেই হুলুস্থুলু কাণ্ড বাধিয়ে বসতো। আর এখন গালি শুনে ও মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছে। এদের মশাই ···। এমন ভাষায় সে মুসলমানদের গালিগালাজ করছিল যা ছাপার যোগ্য নয়। কিন্তু হঠাৎ তার গালিগালাজ থেমে গেল। দেখা গেল মুসলমান যাত্রী-দলের মধ্যে একটি বিশেষ মানুষকে সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে। ধীরে ধীরে তার মুখখানি খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। খুশির ঝলকে সে চিৎকার করে উঠলো—"আরে আহমদ ইয়ার!" আহমদ মাথার ঝোঁচকাটা ওপরের দিকে তুলে যে তার নাম ধরে ডাকছিল তাকে দেখার চেষ্টা করলো। চোখাচোখি হতেই সেও চিনতে পেরে আবেগে, আনন্দে চিৎকার করে উঠলো,—'আরে, নাথু যে!'

দুজনেই ছুটে এসে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। জানা গেল দুজনেই মুচি। একই এলাকাতে তারা ছিল। শৈশব, কৈশোর আর যৌবনের দিনগুলিতে ওরা একই সঙ্গে কাটিয়েছে। পরে জীবিকার সুবিধার জন্যে একজন লাহোরে অন্যজন জলন্ধরে চলে গিয়েছিল। অনেকদিন পরে দেখা। দুজনই তাদের আবেগ যেন ধরে রাখতে পারছে না। চোখের জলেই সেই আবেগের প্রকাশ। নাথু বলল,- চল্ তুই আমার ঘরে, দেখি কোন্ শালা তোকে কি বলে?

আহমদ সংযত স্বরে বলল,—এখন নয়, যদি কোনোদিন সুদিন আসে তখন যাবো। তোর এলাকার হিন্দুরা আমার কি অবস্থা করেছে ভাখ্। কোনোমতে প্রাণে বেঁচেছি কিন্তু কী মারটাই না খেয়েছি।

আহমদ লুঙ্গি তুলে পায়ের গোছার ক্ষতস্থান দেখালো। নাথুও চোখের জল সামলাতে সামলাতে বেদনাহত কণ্ঠে বলল,—আমার ভাগ্য আরো খারাপ ভাই। জোয়ান ছেলেটাকে রাস্তায় ওরা মেরে ফেললো।

আহমদের কণ্ঠ থেকে সহানুভূতি ঝরে পড়লো।

—কে মারলো? কে এমন করলো ভাই? হায়, নাথু, আমাদের জমানায় এ কী হলো? কেন এমন হলো? আমি জলন্ধরেও জুতো

বানাতাম, লাহোরে গিয়েও জুতো বানাব। আমি তো বুঝতে পারছি না এই খুনখারাপির খেলায় কার কী লাভ?

নাথুও বুঝতে পারে না। মাথার চুল টানতে টানতে সেও বলে,—এ জমানার হাওয়াই খারাপ ভাই!

—এখন যাই ভাই, নইলে যাত্রীরা চলে যাবে, আমি আটকে পড়বো।—আহমদ বলল।

দুই বন্ধু শেষবারের মতো আলিঙ্গনাবদ্ধ হলো। তারপর আহমদ বিদায় নিয়ে যাত্রীদলের সঙ্গে মিশে গেল।

পিছন থেকে নাথু চিৎকার করে বলল,—আহমদ, আবদুলগণি চাচাকে আমার সালাম জানিও।

যাত্রীদলের মধ্য থেকে আচ্ছা আচ্ছা আওয়াজ ভেসে এলো।

নাথু পুরনো বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ফেরার পর দেখলো সবাই তাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখছে। নাথু বিব্রত বোধ করলো। মাথা নিচু করে সে নিজের ছোট ছেলেটিকে কি যেন বলতে চাইলো। কিন্তু তার ঠোঁট দুটিই নড়লো। আওয়াজ বেরুলো না। তারপর সে ছেলের হাত ধরে অন্যত্র সরে গেল।

মুহূর্তেই আমার মধ্যে কী যেন ঘটে গেল। এগিয়ে গিয়ে আমি মুসলমান যাত্রীদের সঙ্গে মিশে গেলাম। যাত্রীদলের একজন আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো,—তুমি এখানে কেন?

—এ পর্যন্ত হিন্দু সেজে এসেছি। এখন পাকিস্তানে যাচ্ছি। আমার নিজের দেশ।—আমি চটপট উত্তর দিলাম।

"আলহামদো লিল্লাহ"—কোরাণের একটি বাণী উচ্চাচরণ করে লোকটি হাসলো। বুঝলাম তার সন্দেহের নিরসন হয়েছে। সন্দেহ থাকলেও আমার কিছু এসে যেতো না। আমি তখন বেপরোয়া। প্রত্যয়ের সঙ্গে পা ফেলে ফেলে যাত্রীদলের সঙ্গে মিলে মিশে এগোতে লাগলাম। আর দুশো গজ গেলে সেতুর কাছে পৌঁছবো। ওই পর্যন্ত আমি নিরাপদ। রাস্তার একপাশে সেতু পর্যন্ত সারি সারি হিন্দু ও শিখ দাঁড়িয়েছিল। এরা আর এখন মুসলমানদের ভয় করে না বরং

কৃপার দৃষ্টিতে দেখছে। আমি বেপরোয়াভাবে মুসলমান যাত্রীদলের সঙ্গেই চলতে লাগলাম। আমার বাঁ পাশের দাড়িওলা এক বৃদ্ধকে প্রশ্ন করলাম,—কোত্থেকে আসছো বাবা ?

—মৌরেণ্ডী থেকে, বাবা।

—তোমার পরিবারের লোকজন কোথায় ?

—কবরে।

এমন সংক্ষিপ্ত অথচ মর্মান্তিক উত্তর শুনে আমি থমকে গেলাম। চুপ করে রইলাম। বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকাতেই দেখি খানিক আগের ওর মুখের রং বদলে গেছে। রক্তহীন, ফ্যাকাসে মুখ। ধীরে ধীরে সে মুখ খুললো।

—আমার তিন মেয়েকে শিখেরা রেখে দিয়েছে, আর তিনটি ছেলেকে মেরে ফেলেছে। ওরা যদি দয়া করে আমাকে আর আমার বউকেও মেরে ফেলতো তাহলে বেঁচে যেতাম।

বৃদ্ধের সঙ্গে তার স্ত্রীও চলেছে। মাথার সাদা চুল মুখের ওপর এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। অদ্ভুত একটা দৃষ্টি মেলে সে স্বামীর চোখের দিকে তাকাল। তারপর ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে নিচু স্বরে বলল,—চুপ, গোলমাল করো না, আমার ছেলের ঘুম ভেঙে যাবে।

—তোমার ছেলে ? সবিস্ময়ে আমি জানতে চাইলাম। বৃদ্ধা আমার দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল,—আমি পোয়াতি যে। আমার পেটে বাচ্চা।

হঠাৎই সে ঘুরে আমার পিছনে চলে এল, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের পেটে ঘা মারতে লাগলো আর চিৎকার করে বলতে লাগলো,—আমি পোয়াতি, আমার পেটে বাচ্চা রয়েছে। আমি মা হবো। হাঃ হাঃ।

বৃদ্ধার বীভৎস হাসি ও চিৎকার আমি সহ্য করতে পারলাম না। আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলাম। বৃদ্ধ তার উন্মাদ স্ত্রীকে টানতে টানতে এগিয়ে চললো।

অনেকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর আমি আবার যাত্রীদলের সঙ্গে চলতে শুরু করলাম। হাঁটছি বটে কিন্তু মনের ধন্দ দূর হচ্ছে না। আমার কী যে উদ্দেশ্য তা আমি জানি না। আমি কী চাই? কেন এদের সঙ্গে চলেছি? উত্তর আমার জানা নেই। অথচ এই দল থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেও নিতে পারছি না। আমার সঙ্গে চলেছে একটি ভদ্র, রুচিবান মুসলমান পরিবার। চেহারায় চালচলনে কথাবার্তায় এদের শিক্ষিত বলেই মনে হচ্ছে। পোশাক পরিচ্ছদ ময়লা হলেও বোঝা যাচ্ছে দামী। ফ্রক পরা দুটি আট-দশ বছরের মেয়ে ও একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের তরুণ এঁদের সঙ্গে চলেছে। ছেলেটির মুখে দাড়ি গোঁফ গজাবার আভাস পরিস্ফুট। ডোরাকাটা নীল সার্ট আর কালো রঙের প্যান্ট তার পরনে। দু বোনের হাত ধরে সে চলেছে। ওদের বাবা বোরখা আবৃতা স্ত্রীর হাত ধরে চলেছেন। আমার দিকে তাকিয়ে খুশিতে উদ্ভাসিত চোখ তুলে বললেন,—খোদাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা পাকিস্তানের কাছাকাছি এসে গেছি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম,—পথে কোনো অসুবিধা হয়নি তো?

—পরওয়ারদিগারের (ওপরওলা) কৃপায় আমার পরিবারের সবাই জীবিত আছি আশা করছি আর দু ঘন্টার মধ্যে আমরা পাকিস্তানে পৌঁছে যাবো। আমাদের নতুন দেশ।

সকলের চেহারাতেই খুশির ছোঁয়া লেগেছে। স্বপ্নের দেশ পাকিস্তান ওদের দেহ মনে রামধনুর সাত রং ছড়িয়ে দিয়েছে। যতই সামনে এগুচ্ছে ততই যেন ওরা শক্তি ফিরে পাচ্ছে। চলার গতি দ্রুততর হচ্ছে।

আমি ইচ্ছা করেই পিছিয়ে পড়লাম। ওরা এগিয়ে গেল। এখন আমার পাশাপাশি চলেছে একটি তরুণী। মনে হলো যাত্রীদলের মধ্যে এই মেয়েটিও আমারই মতো নিঃসঙ্গ। মেয়েটির প্রতি তাই আমি কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। ভালো করে দেখার জন্যে ওর মুখের দিকে তাকালাম। আমার সন্দেহ ঘনীভূত হলো। আমার মতো

এই মেয়েটিও মুসলমান নয়।

—তোমাকে হিন্দু বলে মনে হচ্ছে। তাই না?

আমার প্রশ্ন শুনে মেয়েটি চমকে উঠলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে মুখ ফিরিয়ে নিল। আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে সে হাঁটছিলো। আমি লক্ষ্য করলাম মেয়েটির মুখের রং পাল্টিয়ে গিয়েছে। বুঝতে পারলাম, আমার অনুমান অভ্রান্ত। আমার প্রশ্ন তীরের মতো লক্ষ্যভেদ করেছে। মেয়েটি সুশ্রী সুন্দরী। ওর চলার ছন্দে লাবণ্য ও সুষমার মহিমা। ছোটখাটো গড়ন, মাথায় চুলের বন্যা, সুন্দর চিবুক পাতলা সোনালী ঠোঁট, উন্নত বক্ষ, সরু কোমর। পরমা সুন্দরী কিন্তু স্নিগ্ধ বিষণ্ণ দুটি চোখ। লক্ষ্যে পৌঁছবার দৃঢ়তা নিয়ে সে এগিয়ে চলেছে। আমি আবার তাকে প্রশ্ন করলাম।

—তুমি কে? কি নাম তোমার?

—আমার নাম পার্বতী।

—কোথেকে আসছো?

—চিমদাকালা থেকে।

—কোথায় যাচ্ছ?

—পাকিস্তানে।

—পার্বতী তুমি কেন পাকিস্তানে যাচ্ছো?

—পাকিস্তান আমার প্রিয়তমের দেশ।

—তোমার প্রিয়তম? কে সে?

—আমাদের গ্রামেই সে থাকতো। তাকে আমি ভালোবাসতাম, আজও বাসি। ইমতিয়াজ তার নাম। তার বাবা ছিলেন বড় জমিদার এবং মুসলিম লীগের কট্টর সমর্থক। আর আমার বাবা গাঁয়ের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী, কট্টর আর্যসমাজী। ইমতিয়াজ ভালোবাসতো আমাকে। আমিও ভালোবাসতাম তাকে। আমরা দুজনে একই কলেজে এম.-এ. পড়তাম। যখন পাকিস্তান হয়ে গেলো তখন ইমতিয়াজের মা বাবা প্লেনে লাহোর চলে গেলেন। ইমতিয়াজকেও তাঁরা সঙ্গে নিয়ে যাবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পারেননি।

ইমতিয়াজ বলেছিল পার্বতীকে ছেড়ে সে তার নতুন দেশে যেতে রাজি নয়। আমি কথা দিয়েছিলাম তাকে বিয়ে করবো।

—তারপর ?

মাথা নিচু করে ও আমার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিল। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো ও। তাপর একসময় মৃদুস্বরে বলল,—আমার বাবা ষড়যন্ত্র করছিলো ইমতিয়াজকে মেরে ফেলার। একদিন বাবার ভাড়া করা হিন্দু গুণ্ডারা ওকে মেরে ফেললো। আমার ওপর ওর অনেক ভরসা ছিল কিন্তু আমি বাবার ষড়যন্ত্রের কথা টের পাইনি। নিজেকে বাঁচাবার মতো শক্তি তার ছিল। সে ছিল একাধারে শক্তিমান ও সুপুরুষ। কিন্তু সে যখন একলা ছিল তখনই একদল গুণ্ডা গিয়ে তাকে হত্যা করলো। যখন খবর পেয়ে আমি ইমতিয়াজকে শেষবারের মতো দেখতে গেলাম, তখন শকুনেরা তার শরীরটাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

এমন মর্মান্তিক কাহিনী বিবৃত করার সময়ে পার্বতীর কণ্ঠস্বর ক্ষণিকের জন্যেও কেঁপে ওঠেনি। তার চোখে এক ফোঁটা জল নেই। তার চলার মধ্যেও এতটুকু আড়ষ্টতা নেই। সত্যিই এ এক আশ্চর্য মেয়ে। আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম।

কিছুক্ষণ পরে আমি প্রশ্ন করলাম,—ইমতিয়াজ তো মরে গেছে, তাহলে তুমি পাকিস্তানে যাচ্ছো কেন ?

পার্বতী দৃপ্ত ভঙ্গিতে উত্তর দিল,—ওর মার কাছে আমি ওর বিধবা স্ত্রীর মতো থাকবো।

অবাক হয়ে আমি পার্বতীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ইতঃমধ্যে আমরা সেতুর কাছে এসে পড়েছি। পার্বতী সেতুর ওপর পা রাখলো।

পার্বতীর দৃঢ়তা দেখে আমি ভয় পেলাম। ওকে ফিরে আসার জন্যে অনুনয় করতে লাগলাম।

—পার্বতী, কোথায় যাচ্ছ তুমি ? অবোধ, বোকা মেয়ে! কাল্পনিক জগতের হাতছানিতে এভাবে কেউ নিজের দেশ ছেড়ে চলে যায় ? মেয়েরা স্বামীর জন্যে মরে, মা সন্তানের জন্যে প্রাণ দেয়,

বোন ভাইয়ের জন্যে স্বার্থত্যাগ করে—এ সবের তবু একটা মানে বোঝা যায়। কারণ এ সম্পর্ক রক্তের সম্পর্ক, নাড়ীর সম্পর্ক, আত্মার সম্পর্ক। কিন্তু ইমতিয়াজের সঙ্গে তো তোমার কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। ইমতিয়াজের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়নি। তুমি তার স্ত্রী নও, তোমার কোলে তার সন্তানও নেই। তুমি ওর সম্প্রদায়ের, দেশের, বংশের কেউ নও। তবে কেন তুমি তোমার দেশের মানুষদের ছেড়ে ওদেশে যাচ্ছো? আমাদের ছেড়ে কল্পনার কোন্ মন্দিরের দিকে তুমি চলেছ। এ যুগে প্রেমের জন্যে কেউ মরে নাকি? পাগলী কোথাকার। এই পৃথিবীতে নানা কারণে মানুষ প্রাণ বিসর্জন দেয়। অর্থের জন্যে, যশের জন্যে, দেশের জন্যে, সম্প্রদায়ের জন্যে, পর-কালের শান্তির জন্যে—মানুষ মরে তার নজির আছে। কিন্তু কাল্পনিক সুখ চরিতার্থ করার জন্যে কেউ মৃত্যু বরণ করে না। ভেবে ভাখো, পার্বতী অবুঝ হয়ো না। জীবনভোর শুধু স্মৃতি নিয়ে অচেনা, অজানা বিরুদ্ধ পরিবেশে বাঁচা যায় না পার্বতী। ফিরে এসো পার্বতী। সদ্যফোটা ফুলের মতো তোমার সৌন্দর্য সম্পর্কে তুমি সচেতন নও। একবার চোখ মেলে চারদিকে তাকালেই তুমি দেখতে পাবে কতো হিন্দু যুবক রূপমুগ্ধতায় বিভোর হয়ে তোমাকে দেখছে। ওদের মধ্যে কোনো একজনের মুগ্ধ দৃষ্টিকে মূল্য দাও তুমি।

দাঁড়াও পার্বতী। একবার ভেবে ভাখো। ফিরে এসো আমাদের মধ্যে। ধীরে ধীরে ইমতিয়াজের স্মৃতি তোমার মন থেকে আমরা মুছে দেব। তোমার ধর্ম আর আমাদের ধর্ম এক। একই দেশের, একই সমাজের মানুষ আমরা। তোমার ভালোমন্দের বিচার করার ক্ষমতা আমাদেরই আছে। আমরাই তোমাকে ধীরে ধীরে সঠিক পথে নিয়ে আসবো। এমন একটা পরিবেশ আমরা তোমার সামনে তুলে ধরবো যাতে তুমি সহজেই নিজস্ব জগতের মধ্যে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবে। আমরা তোমাকে এমনভাবে গড়ে তুলবো যে তোমার মুখে আবার হাসি ফুটবে, কণ্ঠে সুর ফিরে আসবে। তারপর খুব ধীরে, একটুও তাড়াহুড়ো না করে তোমার মন থেকে আমরা অতীতের স্মৃতি মুছে

দেব। আর তখনই আমরা তোমাকে পবিত্র হোমাগ্নির কাছে নিয়ে যাবো। হোমকুণ্ডের চারদিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে তুমি কোনো নতুন মানুষের গৃহলক্ষ্মী হয়ে উঠবে। তারপর হাসিমুখে বধূবেশে পালকিতে চড়ে তুমি তোমার শ্বশুরবাড়িতে চলে যাবে। হ্যাঁ, এই কাজে আমাদের অভিজ্ঞতা অনেক। হাজার বছর ধরে আমরা এ কাজ করে আসছি। প্রেমের সমাধি রচনায় আমাদের দক্ষতার তুলনা তুমি কোথাও খুঁজে পাবে না। ফিরে এসো পার্বতী ··ফিরে এসো ··ও পথ তোমার জন্য নয়।

কিন্তু পার্বতী আমার আহ্বানে সাড়া দিল না। ফিরেও তাকালো না আমার দিকে। আত্মপ্রত্যয়ী পার্বতী দৃঢ় পদক্ষেপে সেতুর ওপর দিয়ে হেঁটে চললো। সেতুর মাঝামাঝি যখন সে পৌঁছেছে তখনই ইংরেজ অফিসার এগিয়ে এসে সেতুর মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। ঘোষণা করলেন তিনি, পারাপারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল।

দশ

যারা সেতুর ওপারে চলে যেতে পেরেছিল তারা খুশিতে উদ্বেল। আর যারা এপারে পড়ে রইলো তারা ভয়ে কাঁপতে লাগলো। ভয়াতুর চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তারা এদিক ওদিক দেখতে লাগল। সেই সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের ছেলেটি তার দুই বোনকে নিয়ে ওপারে চলে গিয়েছিল কিন্তু ওদের মা বাবা যখন পার হতে যাবেন তখনই ইংরেজ অফিসার নিয়মের ধ্বজা তুলে ধরলেন। তাঁরা এপারেই পড়ে রইলেন। মুসলমান ভদ্রলোকটি সাহেবকে অনেক অনুনয় করলেন।

—দেখুন আমার ছেলেমেয়েরা ওপারে চলে গেছে। আমাকে আর আমার স্ত্রীকে যেতে দিন, সাহেব। প্লীজ কমাণ্ডার সাহেব, দয়া করুন আমাদের।

কিন্তু ইংরেজ অফিসারের হৃদয় গললো না। কোনো কথাই তিনি শুনতে রাজি নন। নিরুপায় হয়ে স্বামী-স্ত্রী সেতুর একপ্রান্তে সরে এসে কাতর দৃষ্টিতে সন্তানদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু ইংরেজ অফিসার সেই সুযোগটিও তাঁদের দিতে প্রস্তুত নন। সেতুর ওপর তাঁদের দাঁড়াতে দিলেন না। এখন ওদিক থেকে হিন্দু শরণার্থীর দল আসবে। তাই সেতু খালি করার জন্য মুহাজিরদের [আগেই বলেছি মুসলমানদের ক্ষেত্রে শরণার্থী শব্দ প্রযোজ্য নয়, তারা হলো মুহাজির] ধাক্কা দিতে লাগলেন। অগত্যা অন্যান্য মুহাজিরদের সঙ্গে সেই মুসলমান দম্পতিও সেতু ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। মুসলমান ভদ্রলোকটি মাটিতে পা ঠুকে দাপাতে লাগলেন।

—কি ধরনের আক্কেল এদের? হাতের ইশারায় একটা পরিবারকে দু টুকরো করে দিল? আইন কি বলছে একটা হাতকে দু টুকরো করে দাও? এমন আহাম্মক ইংরেজ অফিসার তো দেখিনি কোনো-দিন। কী ক্ষতি হতো ওর আমাদের দুজনকে যেতে দিলে?

ভদ্রলোকের স্ত্রী স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,—তুমি অত অধৈর্য হচ্ছো কেন? আর দু ঘন্টা পরেই তো আমাদের জন্যে সেতু খুলে যাবে।

ভদ্রমহিলা স্বামীকে সান্ত্বনা দিলেন বটে কিন্তু নিজেই সন্তানদের জন্যে ব্যাকুল হচ্ছিলেন। স্বামীর সঙ্গে তিনিও গোড়ালিতে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে সন্তানদের দেখার চেষ্টা করছিলেন।

এদিক থেকে হিন্দু শরণার্থীর দলটি এগিয়ে আসছিলো। তারা সেতু পেরিয়ে রাস্তায় এসে পৌঁছল। রাস্তার ওপর দণ্ডায়মান মুহাজিররা হিন্দু শরণার্থীদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। হিন্দু শরণার্থীরাও যেতে যেতে তাদেরই মতো সর্বস্ব-লুণ্ঠিত মুহাজিরদের দেখছিল। প্রথমে উভয় পক্ষের দৃষ্টিতেই একই প্রশ্ন, একই উত্তর ফুটে উঠছিল। সে দৃষ্টিতে প্রথমেই যে ভাষা ফুটে উঠেছিল তা হচ্ছে ঘৃণার। সে ভাষা মুছে গিয়ে কিছুক্ষণ পরেই দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল অপরাধবোধের চিহ্ন। পরস্পরের দৃষ্টি এড়িয়ে তারা চলে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল

তৃপ্তীকৃত অপরাধের চিহ্ন দেখতে তাদের কষ্ট হচ্ছে। বুকের মধ্যে বেদনা উথলে উঠছে।

আমি মুহাজিরদের দল থেকে বেরিয়ে এসে হিন্দু শরণার্থীদের দলে মিশে গেলাম এবং ওদের সঙ্গে বিপরীত দিকে চলতে লাগলাম। কিন্তু দল বদল করার কোনো প্রতিক্রিয়া আমি বুঝতেই পারলাম না। এ যাত্রীদলের সঙ্গে সেই যাত্রীদলের কোনো পার্থক্য আমার চোখে পড়লো না। মনে হচ্ছিল আমি একই যাত্রীদলের সঙ্গে হেঁটে চলেছি।

কিছুক্ষণ পরে এই দলে আমার কয়েকজন আত্মীয়ের দেখা পেলাম। আমার দুই জ্ঞাতি ভাই, এক কাকা, এক পিসে ও কয়েকজন বৃদ্ধা মহিলা। এরা খাটিয়ায় করে আমার বাবার মৃতদেহ বয়ে নিয়ে আসছিলেন। তিনি নাকি কিছুক্ষণ আগেই সেতুর ওপারে দুর্বৃত্তদের হামলায় নিহত হয়েছেন।

* * * *

সাদা কাপড়ে ঢাকা আমার বাবার মৃতদেহ এক পাশে রেখে আত্মীয়স্বজনরা চুপচাপ বসে আছেন। কান্নাকাটি করে তাঁরা বোধহয় এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। মেয়েরা রান্নাবান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আগেকার দিন হলে প্রতিবেশীদের বাড়ি থেকে খাবারদাবার আসতো কিন্তু এটা তো ক্যাম্প। এখানে সবই নিজেদের করতে হয়। সবাই তো নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। কে কাকে সাহায্য করবে? সবাই সর্বস্বান্ত, ক্ষুধার্ত, অর্ধনগ্ন।

আমার বড় ভাই শবদাহের ব্যবস্থা করতে গেলেন। আমি নড়বড়ে খাটিয়ার পায়ার ভর দিয়ে বসেছিলাম। এই সময় হিন্দু ও শিখদের মিলিত একটি স্বেচ্ছাসেবকের দল সেখানে এসে হাজির হলো। লাহোরের কুখ্যাত গুণ্ডা বিল্লু এদের দলপতি। বিল্লুর একটা চোখ নেই। অন্যটা বিড়ালের চোখের মতো। সবাই তাই ওকে বিল্লু বলে ডাকতো। বিল্লু লাহোরী গেটের মোতী শা'র আখড়ায় হিন্দু পালোয়ানদের জড়ো করে একটা দল গঠন করেছিল। ধনী হিন্দুদের স্বার্থে

যখন দাঙ্গা বাধাবার প্রয়োজন হতো, এই দলটি তখন সেই কাজ করতো। দাঙ্গার সময়ে হিন্দুদের পক্ষে এরা লড়াই করতো। যখন আমি লাহোরে থাকতাম তখন বিন্নু বার কয়েক এসেছিল আমার কাছে চাঁদা চাইতে। আমি দিইনি।

আমার দুর্দশা দেখে বিন্নুর চোখে মুখে উল্লাস, বিদ্রূপের বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো। দর্পভরে সে আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল,—কিছুক্ষণ পরেই আমরা মুহাজিরদের দলটার ওপর হামলা করবো। ছ' কিস্তি চলে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। পড়ে থাকা দলটার ওপর হামলা করার উপযুক্ত সময় এখনই।

বিন্নুর ভাবভঙ্গি দেখে বিরক্ত হয়ে আমি বললাম,—করো না হামলা, আমার তাতে কি?

—তোমার তাতে কি?

বিন্নু বিকৃত ভঙ্গিতে হেসে উঠলো। বিদ্রূপের খোঁচা দিয়ে বলল,—এইসব বোকা, ভীরু হিন্দুদের জন্যেই তো পাকিস্তান তৈরি হতে পেরেছে। এদের বাপকে মুসলমানরা মেরে ফেললেও এরা বলবে 'আমার তাতে কি'? কাপুরুষ কোথাকার!

আমি খাটিয়ার পায়াতে ঠেস দিয়ে উঁচু হয়ে বসেছিলাম। বিন্নুর বিদ্রূপের খোঁচা সহ্য করতে না পেরে সোজা উঠে বিন্নুর মুখোমুখি দাঁড়ালাম। আমাকে উত্তেজিত করতে পেরে বিন্নু খুশি হলো। বন্ধুর মতো ভদ্রতার সুরে বলল,—আক্রমণ করার জন্যে আমরা প্রতি ঘর থেকে একজন করে স্বেচ্ছাসেবক নিচ্ছি। তুমি আধঘণ্টার মধ্যে রেশন ডিপোর পাশে চলে এসো। বল্লম, বন্দুক, ঘোড়া—সব কিছুর ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

আমাকে দ্বিধান্বিত দেখে সকলেই ক্রোধের দৃষ্টিতে আমাকে ভস্ম করে দিতে চাইছিল। আমি চোয়াল শক্ত করে বললাম,—আমিও যাবো।

বিন্নু বাঁকা চাহনিতে আমাকে দেখে নিয়ে, দাঁত বার করে হাসতে হাসতে এগিয়ে গেল। ওর হাসিটা আমার কাছে অসহ্য লাগল।

আমি তখুনি ওর সঙ্গে এগিয়ে গেলাম। প্রত্যেক পরিবার থেকে আমরা একজন, দুজন করে লোককে নিয়ে নিলাম। ক্রমশঃ সংখ্যা বাড়তে বাড়তে শেষে বড় একটি বাহিনী তৈরি হয়ে গেল। কুচ-কাওয়াজের ভঙ্গিতে আমরা রেশন ডিপোর দিকে এগোতে লাগলাম। মুসলমানদের প্রতি ধিক্কার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে দিলাম। আমাদের চোখের দৃষ্টি তীব্র, হাতের আঙুলগুলো চঞ্চল ও মুখে রগরগে ঘৃণার ভাব ফুটে উঠল।

* * * *

যখন আমরা রেশন ডিপোর কাছে পৌঁছলাম তখন দেখলাম শ'পাঁচেক লোকের একটি বাহিনী তৈরি হয়েছে। সকলের মিলিত চিৎকারে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানাবিধ শ্লোগানে বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। এই পরিবেশে নিজের চৈতন্য হারিয়ে ফেললাম আমি। ঘোরের মধ্যে আমি ওদের সঙ্গে চলতে লাগলাম। মনে হলো আমি স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে আছি। আমার চারপাশের লোকজনদের দেখে মনে হচ্ছে যেন দুঃস্বপ্নের মিছিল।

রেশন ডিপোর সামনে হিন্দু-শিখ যুবক নেতারা বল্লম, তরোয়াল, বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ভাগ করে দিচ্ছিল। মাস্তানদের দেওয়া হচ্ছিল বন্দুক। আমাকে দেওয়া হলো একটা বল্লম। আমি বল্লমটাকে শক্ত মুঠিতে ধরলাম। একটা ঘোড়া দেখিয়ে একজন আমাকে বলল, —এই ঘোড়াটায় উঠে বসো।

আমি বল্লম হাতে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসলাম। তারপর নেতার নির্দেশে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। রাস্তার পাশে বটগাছের ছায়াচ্ছন্ন একটা জায়গায় কিছু মুসলমান বিশ্রাম নিচ্ছিল। আমরা সেখানে গিয়ে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। "সৎশ্রী আকাল", "হর্ হর্ মহাদেও" ধ্বনির সঙ্গে মুসলমানদের ভয়ার্ত চিৎকার মিলে মিশে চতুর্দিক কেঁপে উঠলো।

মুহাজিররা প্রাণভয়ে ছুটতে লাগল। অনেকেই ডকের দিকে ছুটে যাচ্ছিল। কিছু মুসলমান যুবক "আল্লাহো আকবর" ধ্বনি দিতে দিতে

প্রাণপণ লড়াই চালাতে লাগল। কিন্তু তারা সংখ্যায় খুবই কম। আক্রমণকারীরা তকে যাবার পথ আগলে মুসলমানদের তাড়াতে তাড়াতে ময়দানে এনে ঘিরে ফেললো। তারপর চললো এলোপাতাড়ি হত্যা পর্ব। এর আগেই অনেক মুসলমানকে সেখানে হত্যা করা হয়েছে। অসংখ্য বিকলাঙ্গ মৃতদেহ এখানে-সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

আমার চারদিকে যুদ্ধক্ষেত্রের চেহারা। অসংখ্য মশাল জ্বলছে আমার চারপাশে। আমি বল্লম উঁচিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে এদিকে ওদিকে শিকারের খোঁজে ঘোরাফেরা করছিলাম। আমার দৃষ্টির সীমানায় এসে পড়লো এক বৃদ্ধ মুসলমান। একটি ছোট ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে পালাচ্ছিল সে। লোকটির ময়লা ফতুয়া ছিঁড়ে গেছে। অন্য হাতে তার একটি পুঁটলি। বার বার সে শঙ্কিত দৃষ্টিতে পিছন ফিরে তাকাচ্ছিল আর দৌড়চ্ছিল। কচি হাতে শিশুটি বৃদ্ধের গলা জড়িয়ে ধরেছিল। বৃদ্ধের মাথা ঘুরে গিয়ে থাকবে। হোঁচট খেয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। হাত থেকে ছিটকে পুঁটলিটা মাটিতে পড়ে গেল। সে যখন সামলে নিয়ে পুঁটলিটা তুলতে যাচ্ছে তখনই ঘোড়া ছুটিয়ে আমি তার সামনে গিয়ে হাজির হলাম। বর্শাটা তার বুকের মাঝখানে ঠেকালাম।

বৃদ্ধের হাত থেকে পুঁটলিটা পড়ে গেল। সে হাতখানি বুকের কাছে নিয়ে এল। মিনতিভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল,—বেটা আমাকে দয়া করো। না না, আমাকে মেরো না।

বৃদ্ধের জলেভরা চোখের দিকে তাকিয়ে আমি তার বুকে বর্শা গেঁথে দেবার কথা ভুলে গেলাম। সেই মুহূর্তটির ছবি আমার বুকের মধ্যে চিরকালের মতো গাঁথা হয়ে রইলো। আতঙ্কে বিস্ফারিত তার চোখ, অর্ধোত্থিত হাতটি ভয়ে কম্পমান, চোখের দৃষ্টিতে নিঃসীম অসহায়ত্ব, আমার বুকের মধ্যেও তুফান তুলেছিল। বৃদ্ধের বুকের যেখানটায় আমার বল্লম স্পর্শ করেছে সেখানটা সাদা লোমে ভরা। আমার বাবারও ছিল এমনি শুভ্র রোমশ বুক। এই বৃদ্ধের গলার স্বরটিও আমার বাবার মতোই কোমল ও শান্ত। শঙ্কামিশ্রিত সেই স্বরে যখন সে

বললো—"বেটা আমাকে দয়া করো, আমাকে মেরো না" তখন আমি আমার বাবার কণ্ঠস্বরেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পেলাম। আমার মৃত পিতার মুখখানি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। বৃদ্ধের বুকের ওপর থেকে বল্লমটি তুলে নেব যখন ভাবছি ঠিক তখনই আমার পিছনে একটা কর্কশকণ্ঠ বেজে উঠলো,—আরে বামুন, বামুন কুত্তা, তোকে দিয়ে কিছু হবে না। সরে যা, বিশ্বাসঘাতক।

আমাকে ধিক্কার দিতে দিতে বিল্লু কালো ঘোড়ার সওয়ার হয়ে দ্রুত এগিয়ে এসে বল্লম দিয়ে বৃদ্ধকে একোঁড়-ওকোঁড় করে দিয়ে এগিয়ে গেল। বৃদ্ধ মুসলমানটির মৃতদেহ কালো ঘোড়ার পায়ের ধাক্কায় গড়িয়ে যাচ্ছে দেখতে পেলাম আমি। আর দেখলাম সেই শিশুটি বৃদ্ধের কাছ থেকে ছিটকে একটা গর্তের মধ্যে গড়িয়ে পড়লো।

হাজার হাজার দাঙ্গাবাজদের দল জায়গাটাকে পদদলিত করে এগিয়ে যাচ্ছে দেখতে পেলাম। হঠাৎ আমার চোখের আলো বুঝি নিভে গেল কিংবা চোখের জলে আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। ঘোড়ার ওপর বসে আছি বটে কিন্তু আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। বিবেকের প্রচণ্ড দংশনে আমার অন্তর ক্ষতবিক্ষত, ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছিল!

হাতের বল্লমটা ঘৃণাভরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম দূরে। ঘোড়া ছুটিয়ে বধ্যভূমি থেকে মাথা নিচু করে পালিয়ে এলাম।

পরে শুনেছি, চার-পাঁচ ঘণ্টা পরে আক্রান্তদের সাহায্যার্থে সামরিক বিভাগের লোকেরা এসেছিল। তবে সাহায্যের প্রয়োজন হয়নি কারোরই কারণ ততক্ষণে দাঙ্গাবাজদের কাজ সমাধা হয়ে গিয়েছিল।

অসংখ্য মুসলমান সেদিন নিহত হয়েছিল।

দশ

সে রাত্রে আমি কিছুতেই ঘুমোতে পারলাম না। মাঝে মাঝে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে আর তখনই চোখের সামনে ভেসে ওঠে আমার বাবার মুখ, সেই বৃদ্ধের ভয়ার্ত করুণ দৃষ্টি, তার শুভ্র রোমশ বুক। আর তখনই তন্দ্রা টুটে যায়। চলচ্চিত্রের দৃশ্যপট পরিবর্তনের মতো একটার পর একটা দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

দেখলাম দাঁদাকে। আলুথালু বেশ, মাথার খোলা চুল হাওয়ায় উড়ছে। সাদা শরবনের মধ্য দিয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটছে। শরবনে আগুন লেগেছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে। চোখ খুলে তাকালাম। বুঝলাম স্বপ্ন দেখছিলাম। আবার তন্দ্রা এল। আবার অন্য ছবি ভেসে উঠলো। দেখতে দেখতে এইভাবে রাতের তিনটি প্রহর কেটে গেল। এভাবে চোখ বন্ধ করে, শুয়ে জেগে থাকতে আর পারলাম না। চোখের জল ফেলে মন থেকে বোঝাটাও নামাতে পারলাম না। তখন উঠে ক্যাম্পের বাইরে চলে এলাম।

তখনো ভোরের আলো ফোটেনি। গাঢ় অন্ধকার চারদিকে। শুধু একখানি আলোকরশ্মি আকাশ ও মাটির মধ্যে কিছুটা ব্যবধান রচনা করেছে। বুঝতে পারছি ভোর আসন্ন। একটু পরেই সূর্য উঠবে। সেই ক্ষীণ আলোকিত পথ ধরে আমি ক্যাম্পের বাইরে চলে এলাম। অজ্ঞাতসারেই আমি এগিয়ে চলেছিলাম ডকের ময়দানের দিকে। ওদিকে যাবার কোনো বাসনাই আমার ছিল না কিন্তু এক অদৃশ্য শক্তি যেন আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

অন্ধকারের গাঢ় রং ক্রমশঃ হালকা হতে লাগলো। হাঁটতে হাঁটতে সেই অন্ধকারের সঙ্গে পরিচিতও হয়েছিলাম। তাই কোথায় খাদ, কোথায় মাঠ সমতল, কোথায় টিলা, কোথায় গাছ এসব বুঝতে আমার অসুবিধা হচ্ছিল না। আবছা অন্ধকারে গাছের ঝোপ, টিলা, সমতল মাঠ, খানাখন্দ সবই যেন অন্ধকারে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছে।

এখন তারা অন্ধকারে আলোর প্রতীক্ষা করছে। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে একটা খরগোস ভয় পেয়ে ছুটে পালালো। ছুটতে ছুটতে একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল। আমি চমকে উঠলাম। কিছুক্ষণের জন্যে থমকে দাঁড়ালাম। তারপর আবার এগোতে লাগলাম।

সামনেই মোড়ে সেই বটগাছ। জমাট অন্ধকারের একটি স্তূপের মতো দাঁড়িয়ে। দিগন্ত প্রসারিত গাঢ় অন্ধকারের কূলকিনারা নেই। মোড় পার হয়ে, বটগাছ ছাড়িয়ে কিছুটা এগোতেই ডকের ময়দানের কাছে পৌঁছে গেলাম। সান্ত্রীরা এখন ময়দানটাকে ঘিরে রয়েছে। পাহারা দিচ্ছে তারা গত রাতের বধ্যভূমিতে।

হায়, রক্ষিবাহিনীর দল, মানুষের ধন-মান-প্রাণ-সম্পত্তির রক্ষক, তোমরা এখন এসেছ পাহারা দিতে! তখন কোথায় ছিলে, যখন "বাঁচাও বাঁচাও" মর্মভেদী আর্তনাদে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ হচ্ছিল! মানুষের জীবনের প্রতি কী নির্মম পরিহাস! সান্ত্রীরা এখন শ্মশান পাহারা দিচ্ছে!

—হল্ট।

সান্ত্রীর প্রচণ্ড হুঙ্কার কাঁপিয়ে দিল আমাকে। থমকে দাঁড়ালাম আমি।

রাইফেল হাতে সান্ত্রী দর্পভরে আমার কাছে এগিয়ে এল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে দেখলো তারপর গর্জন করে উঠলো।

—কে তুমি?

—আমি একজন হিন্দু।

—কি চাও? কি উদ্দেশ্যে এসেছ এখানে?

—আমার বন্দুকটা গতকাল এখানে খোয়া গেছে। তাই খুঁজতে এসেছি।

আমার মুখ থেকে অতর্কিতে কথাগুলি বেরিয়ে এলো। সান্ত্রীর মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। সম্মতির ভঙ্গিতে সে হাত নাড়িয়ে ইঙ্গিত করলো। যাও, ভাখো পাও কি না।

আমি ময়দানে নেমে এলাম। রাশি রাশি লাশ ছড়িয়ে আছে

চারদিকে। নারী-শিশু-বৃদ্ধ-যুবক, অসংখ্য বিকলাঙ্গ মৃতদেহ। সোজা, উলটো, কাত হয়ে পড়ে থাকা মৃতদেহগুলির কারো একটা হাত নেই, কারো একটা পা নেই। কারোর চোখ খোলা, কারোর চোখ বন্ধ। অনেক শিশু মৃতদেহের হাতে তখনো দুধের বোতল। যে দিকে তাকাই শুধু শব আর শব। ঘৃণায় উন্মত্ত পৃথিবীর গরল পান করে চিরদিনের মতো স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে হাজার হাজার জীবন।

দূর থেকে একটি শিশুর কান্না ভেসে এল।

আমার অজান্তেই পা দুটো চলতে শুরু করলো। যে দিক থেকে শিশুর কান্নার ধ্বনি ভেসে আসছে আমাকে কে যেন সেই দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মৃতদেহগুলো লাফ মেরে ডিঙিয়ে, কখনো পায়ে মাড়িয়ে, টাল সামলাতে সামলাতে আমি পৌঁছে গেলাম সেইখানে, যেখান থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসছিল। দেখলাম মৃতদেহের স্তূপের মাঝখানে বসে একটি শিশু কাঁদছে। চোখ রগড়াচ্ছে আর কাঁদছে। মাঝে মাঝে কান্নার সুরেই বলছে,—বাবা গো···ও বাবা, আমার খিদে পেয়েছে··· বাবা গো!

শিশুটির বাবার মৃতদেহ তার কাছেই পড়ে আছে। বুকের সাদা লোমগুলোর মাঝে বর্শার গভীর ক্ষতের চিহ্ন। ক্ষতস্থানের চারপাশে অন্ধকারের মতো কালো রক্ত জমে আছে—মানুষের মনের জমাট ঘৃণার মতোই কালো। আমি নির্বাক, নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। সময় বয়ে যেতে লাগলো। আমি ক্রন্দনরত শিশুটির দিকে তাকিয়েই রইলাম। কাঁদতে কাঁদতে সেও মাঝে মাঝে আমাকে দেখছিল। সে একসময় চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। এইভাবে চুপ করে আমরা দুজনেই একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমাদের দুজনের সামনে অজানা-অচেনা মৃতদেহের স্তূপ। দুজনের মধ্যে কী দুস্তর ব্যবধান। গভীর সমুদ্রের ব্যবধান, পর্বতের মতো দুর্ভেদ্য প্রাচীর দুজনের মাঝখানে। অপরিচিত, দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে আমরা দুজন দুজনকে দেখছিলাম। শিশুটি মাঝে মাঝে আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে তার চারপাশে ছড়ানো মৃতদেহগুলি দেখছিল। শিশুর সরল, শুভ্র

বুদ্ধিতে এসবের মানে বুঝতে পারছিল না। তাই বোধহয় সে বোঝবার চেষ্টা না করে নিজের একটি আঙুল মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে চুষতে লাগল।

আঙুল চুষতে চুষতে অবাক দৃষ্টি মেলে সে আবার আমার দিকে তাকাল। সেই দৃষ্টিতে কী ছিল জানি না, আমার হৃদয়ের সবগুলি তার একসঙ্গে বেজে উঠলো। অন্ধকারের প্রতিটি কণা একসঙ্গে বেজে উঠে রাত্রির নৈঃশব্দ ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিল। তারা যেন একই সঙ্গে চিৎকার করে নালিশ জানাতে লাগল। সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত সভ্যতা, সপ্ত প্রাচীর আর অভিশপ্ত ঘৃণার দুর্লঙ্ঘ্য বাধা এই নয়, অসহায় শিশুটির আত্মা আমার আত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠলো। আমারই আত্মার এক অভিন্ন রূপ যেন ওই শিশুটি।

আপনা থেকেই আমার হাত ওই শিশুটির দিকে এগিয়ে গেল। মৃতদেহের স্তূপ থেকে শিশুটিকে টেনে তুললাম, তারপর আমার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম। আমার চোখের জল বাধা মানছিল না। কাঁদতে কাঁদতেই ওকে চুমু খেতে লাগলাম। মুসলমান শিশুটি বোধহয় আশ্বাস খুঁজে পেয়েছিল আমার মধ্যে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে তার কোমল দু'খানি হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো। পরক্ষণেই একখানি হাত নামিয়ে নিয়ে আমার বুকের ওপর রাখলো। শিশুর ছোট্ট, কোমল দু'খানি হাতের স্পর্শে আমার ভিতরে যা কিছু পুরনো তা সব কোথায় যেন ভেসে গেল। মনের দুর্মর প্রতিশোধ বাসনা মুহূর্তেই দূর হয়ে গেল। মনের সব বিদ্বেষ, ঘৃণা, জ্বালা-যন্ত্রণা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। আমার হারানো সন্তান মুন্নাকেই যেন আবার ফিরে পেলাম এই শিশুটির মধ্যে।

শিশুটিকে কোলে নিয়ে আবার আমি চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম। কী দেখলাম? শুধু মৃতদেহ আর মৃতদেহ!

মৃত্যুর প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আমি নিজেকেই প্রশ্ন করলাম,—এর পরেও কি আমি মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াবো? কিসের জোরে? কোন্ যোগ্যতায় আমরা সভ্যতা-সংস্কৃতি ঐতিহ্যের বড়াই করি? কেন এত

ঢাক ঢোল পেটানো ? আমাদের অপরাধের বোঝাটা যে দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে তার জন্যে স্বীকারোক্তি কই ? কেন এই সংকোচ ? এই অসম্পূর্ণ, অপরিণত সভ্যতার বাইরের চাকচিক্যের অন্তরালে কী ভীষণ, বীভৎস অন্ধকার ! হিন্দু সভ্যতা, শিখ সভ্যতা, মুসলিম সভ্যতা, খ্রীষ্টীয় সভ্যতা, য়ুরোপীয় সভ্যতা, এশীয় সভ্যতা—এইসব সভ্যতার গজদন্ত মিনারের অন্তরালে স্তূপ স্তূপ পাপ জমে আছে। ওদের প্রবক্তারা তা জানে কিন্তু স্বীকার করে না। ওরা ঢাক ঢোল পিটিয়ে সত্যকে চাপা দিতে চায়। ওরা শুধু বলে বর্ণাঢ্য গৌরবের কথা, জাঁকজমকের কথা। কেউ যদি সাহস করে এইসব সভ্যতার বর্ণাঢ্য আবরণ সরিয়ে সত্যকে প্রকাশ করতে চায় তবে তাকে ওরা বিশ্বাসঘাতক [গাদ্দার] বলে অভিহিত করে কিংবা পিছন থেকে ছুরিবিদ্ধ করে বিলীন করে দিতে চায়।

কিন্তু এখন আমি লজ্জা, সংকোচ ও ভয়ের উর্ধ্বে। কোনো কিছুতেই আমি আর ভয় পাই না। মৃতদেহের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি ভাবছিলাম, ভয় পাবার কোনো কারণই নেই আমার, কারণ গর্বোন্নত মাথাটি আমি নিজের হাতেই ইতিমধ্যে কেটে ফেলেছি। কোনো অত্যাচার, কোনো নির্যাতন আর আমাকে পথ চলায় কষ্ট দেবে না। কোনো মধুর বুলি আর আমাকে বিভ্রান্ত করবে না। ঝলমলে খাপের মধ্যে যে বিষমাখানো ছুরি থাকে তা আমি জেনে গেছি। ওই ছুরিকে আমি আর ভয় পাই না। পাপের সঙ্গে আপোষ করতে আমি আর রাজি নই।

লাশের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যখন আমি নিজের সমাজের তথাকথিত আদর্শগুলোকে বিচার বিশ্লেষণ করছিলাম তখন আমার মনে হলো আদর্শের পুঁথির পোকায় খাওয়া জীর্ণ পাতাগুলো আমার হাত থেকে ঝরঝর করে ঝরে পড়লো। হাওয়ায় হারিয়ে গেল। মুসলমান শিশুটিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আমি আমার সব পুরনো সংস্কার, পুরনো প্রথা ও রীতির জঞ্জালের স্তূপে আগুন লাগিয়ে দিলাম। নিজেকে মুক্ত, নিরাতঙ্ক মনে হলো। হাঁটতে হাঁটতে বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করলাম।

আমার আর কিছু হারাবার নেই, ভয় পাবার নেই। কারণ আজ আমি একটি সবুজ পাতার সন্ধান পেয়েছি।

ময়দানের বাইরে আসতেই সান্ত্রী আমাকে ধরলো। আমার হাতে বন্দুক নেই, উপরন্তু কোলে একটি মুসলমান ছেলে।

আমি বললাম,—বন্দুকটা খুঁজে পেলাম না।

সান্ত্রী ধমক দিয়ে প্রশ্ন করল,—এই বাচ্চাটাকে নিয়ে এসেছ কেন?

বুঝলাম আমার আচরণ সান্ত্রীর মোটেই পছন্দ নয়। তার স্বর বেশ রুক্ষ।

কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে বললাম,—বাচ্চাটা বেঁচে আছে।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। জ্যান্তই হোক আর মরাই হোক একে নিয়ে যাবার কোনো অধিকার নেই তোমার। যাও, এটাকে যেখানে পেয়েছ সেখানেই ছেড়ে দিয়ে এসো।

আমি চোখ টিপে সান্ত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে চাইলাম। বললাম, —আমি তো এটাকে মেরে ফেলতেই চাই। কেউটের বাচ্চাকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই।

সান্ত্রী সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকাল। আমি আবার চোখ টিপলাম। সান্ত্রী যেন আশ্বস্ত হলো। তবু বলল,—তুমি সত্যি বলছো তো? ঠিক মেরে ফেলবে তো?

—মেরে ফেলবো মানে? আমি এটাকে দু' টুকরো করে কেটে ফেলবো। পা দুটো চিরে ফেলবো, তারপর নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।

সান্ত্রীর মুখখানি খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। বলল,—তবে নিয়ে যাও।

শিশুটি হঠাৎ চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলো। আমি দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলাম। এমন সময় সান্ত্রী চেঁচিয়ে বলল,—থামো!

আমি কান দিলাম না চলার গতি আরো বাড়িয়ে দিলাম। শেষ পর্যন্ত দৌড়তে লাগলাম। গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। শেষ পর্যন্ত একটা গুলি আমার পায়ের চামড়া স্পর্শ করে চলে গেল। পা থেকে রক্ত ঝরছিল, অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল। তবু আমি থামলাম না। একটা

টিলার আড়ালে এসে লুকিয়ে রইলাম।

* * * *

নদীর কূল ঘেঁষে নতুন দিনের নতুন সূর্য দেখা দিল। নদীর তীরে দাঁড়িয়ে তখন আমি আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে ভাবতে লাগলাম।

বৈজনাথ, কোথায় যাবি তুই এখন? ঘৃণা, অত্যাচার, নিষ্ঠুরতার তাণ্ডব চলছে নদীর দুই পারেই। কোথায় যাবি তুই? কোথায় পালাবি? যে সংস্কার-প্রথা-রীতির ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে এতদূর পালিয়ে এসেছিস তা তো এখানেও রয়েছে। দুই দেশের দুই সভ্যতার ওপরই তুই আস্থা হারিয়েছিস। হিন্দুস্থান, পাকিস্তান কোনো দেশেরই নাগরিক নোস্ তুই। দুই দলের কাছেই তুই বিশ্বাসঘাতক। মনুষ্যত্ব-হীন, অশান্ত এই পৃথিবীতে শিশুটিকে নিয়ে কোথায় তুই বাসা বাঁধবি?

এই সব আদর্শ ও মহৎ চিন্তাভাবনার কথা ভুলে যা। শিশুটিকে ছুঁড়ে ফেলে দে নদীর জলে। ও স্রোতে ভেসে যাক আর তুই নিজের পরিবারের মধ্যে ফিরে যা। ফিরে যা নিজের দেশ, জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে। ওপারের দেশটা আর তোর নয়, এখন এ পারের এই দেশটাই তোর।

হায়, কি করে বলবো ও দেশটা আমার নয়! ওই দেশের মাটি, প্রতিটি ধূলিকণা আমার মনের আকাশে হীরকচূর্ণের মতো দীপ্তি ছড়াচ্ছে। কেমন করে বলি শুধু এই দেশটাই আমার, যেখানে এখনো আমি আগন্তুক, অপরিচিত? কই নদীর এপার আর ওপারের মধ্যে তো কোনো পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি না আমি। নদীর দুই তীরেই তো রাশি রাশি মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে। মধ্যিখানের এই যে জলস্রোত তা তো হিন্দু-মুসলমান এই দুনিয়াতে আসবার অনেক আগে থেকেই বইছে।

আমি সেই দুনিয়ার কথা ভাবতে লাগলাম যা এখনো আসেনি কিন্তু নিশ্চয়ই আসবে। যখন হিন্দুস্থান থেকেও হিন্দুস্থান থাকবে না, পাকিস্তান থেকেও পাকিস্তান থাকবে না, কোনো ইরান, কোনো জাপান, কোনো আমেরিকা, রাশিয়া বা চীন থাকবে না; যখন এই

ছুনিয়াটা সমস্ত মানুষের বসবাসের উপযোগী একটি সুন্দর গ্রামের মতো হয়ে উঠবে। সেখানে সারা ছুনিয়ার মানুষ, নিজের নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও ভালোবাসার বোধ নিয়ে প্রতিবেশীর মতো চিরকালের জন্যে স্বাধীনভাবে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

আরে! আমি এভাবে কেন চিন্তা করছি? প্রথাবিরুদ্ধ চিন্তা? যেভাবে সবাই ভাবে, যেভাবে সংস্কৃতিবান, জ্ঞানী, গুণীরা চিন্তাভাবনা করেন, তাঁরা যেভাবে নিজের দেশ, নিজের সংস্কৃতি, নিজের ধর্ম, ধর্ম গোত্রের শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন আমিও সেই-ভাবেই চিন্তা করছি না কেন?

এ কি ধরনের চিন্তাভাবনা আমায় পেয়ে বসলো, হৃদয়ে যা তুফান তুলছে! হৃদয়ের সব কটি তার একসঙ্গে বেজে উঠে আমাকে এমন পাগল করে তুলছে কেন? ওই সুরধ্বনি যেন আমার বিবেককে ঘা দিয়ে দিয়ে বলছে বহুজন যা বলছে তা-ই সত্য নয়। যে যাই বলুক, কেউ মানতে চাক আর নাই চাক সেদিন আসবেই। মানুষ যদি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম প্রাণী হয়, যদি তার জীবনের কোনো তাৎপর্য থাকে, যদি তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোনো বিশেষ লক্ষ্য থাকে তাহলে সেদিন নিশ্চয়ই আসবে। আর সেইদিন যখন আসবে তখন মানুষ প্রাণের তাগিদেই তাদের যুগান্তরের সঞ্চিত পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে। নিজেদের ক্রোধ, ঘৃণা, হিংসাকে পরাভূত করবে। এইভাবে যা কিছু কুৎসিত, যা কিছু অসুন্দর তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মানবতার উজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষিত জগতে তারা প্রবেশ করবে।

সেদিন আসবেই। অবশ্যই আসবে।

আর সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় আমাকে বেঁচে থাকতেই হবে। এই শিশুটিকেও প্রাণ দিয়ে রক্ষা করতে হবে। বাঁচিয়ে রাখতে হবে একে। এই বিস্তৃত অন্ধকারের মধ্যে যে আলোকরশ্মি বিলীয়মান তাকে ধরে রাখতে হবে। অন্ধকারের কঠিন আবরণ নখ দিয়ে কুরে কুরে আলোর দীপ্তি প্রকাশের পথ করে দিতে হবে। তারপর সেই

আলো দিয়ে বুকের অন্ধকারে নিভন্ত প্রদীপটির শিখা জ্বালিয়ে দিতে হবে। জানি ওরা আমাকে দেখে হাসবে, ধিক্কার দেবে, ঘৃণা ছুঁড়ে দেবে। বলবে, বিশ্বাসঘাতক। গাদ্দার। তবু সব বিষ পান করে দৃঢ় পদক্ষেপে আমাকে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতেই হবে।

নতুন দিন নতুন সূর্য নিয়ে এসেছে।

প্রভাতের আলো নদীর জল ছাপিয়ে আকাশ ভরে দিয়েছে। শিশুটিকে কোলে নিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম।

রোটি কাপড়া মকান

আজ তার জীবনের শেষ দিন। কাল ভোরে যখন সূর্য উঠবে তখনই তার জীবনটাকে স্তব্ধ করে দেওয়া হবে।

রঘুরায়্যার বয়েস মাত্র বাইশ।

জীবনের শেষ দিনটিতে জেলের অন্ধকার কুঠরিতে বসে সে তার জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির দিকে ফিরে তাকায়। তার সংক্ষিপ্ত কিন্তু ঘটনাবহুল জীবনের মুহূর্তগুলিকে সে মুদ্রার মতো বাজিয়ে দেখতে চায়। কৃষক যেমন তার পণ্যবেচা রোজগারের পয়সা মমতাভরা দৃষ্টিতে দেখে নেয়, তারপর যত্ন করে গুনে গুনে পকেটে রাখে রঘুরায়্যা তেমনি নিজের জীবনের মুহূর্তগুলিকে একবার ভালো করে দেখে নিতে চায়। সেই মুহূর্তগুলি তার কাছে মুদ্রারই মতো। স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে সব মুদ্রাগুলিকে সে এক এক করে তুলে আনে তারপর নিবিষ্ট মনে সেগুলিকে দেখতে থাকে। এই মুদ্রাগুলির মধ্যে অনেকগুলিই সে নিজের হাতে ঢালাই করেছে। তার নিজেরই সৃষ্টি এই মুদ্রাগুলি।

তার হাতে পায়ে লোহার বেড়ি। এমনই ক্ষুদ্র এক কুঠরিতে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে যেখানে পায়চারি করার সুযোগটিও নেই। মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন ও স্বাধীনতা থেকে সে বঞ্চিত। শুধু মনটাই তার স্বাধীন। মনকে শৃঙ্খলিত করা যায় না বলেই বোধহয়। রঘুরায়্যা এতেই খুশি। স্বাধীন মন, স্বাধীন চিন্তা ও ধ্যানধারণা নিয়ে সে আজ মুদ্রাগুলির আসল-নকল পরখ করতে বসেছে।

তার জীবনের কিছুটা জুড়ে রয়েছে মা ও বাবা। যেমন তার জন্ম। তারপর শৈশব। মায়ের কোলে ঘুমপাড়ানী গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়া। কিংবা বাবার কাঁধে চড়ে এখানে-সেখানে বেড়ানো। এই মুদ্রাগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে তার মন কেমন যেন আর্দ্র হয়ে ওঠে।

তার জীবনের কিছু কিছু মুহূর্ত রয়েছে যেগুলি সমাজ ও প্রতি-

বেশের চাঁকশালে ঢালাই হয়েছে। এই সব মুদ্রাগুলি সে আপাতত সরিয়ে রাখে।

এবার সে সেইসব মুদ্রাগুলির দিকে ফিরে তাকায় যেগুলি তার একান্ত আপনার। তার জীবনের সেরা মুহূর্তগুলি। এই সব মুদ্রা সত্যিই সুন্দর এবং দামী। এর যতো সৃষ্টির কারুকার্য তাতে তারই বুদ্ধি ও পরিশ্রমের ছাপ রয়েছে। এতদিন সে যা কিছু চিন্তা করেছে, যে আদর্শ মনের মধ্যে লালন করেছে—সেই বিবর্তনের ধারায় সময়ের ওপর তারই ব্যক্তিত্বের ছাপ রেখে গেছে। এতে কোনো দেবতার অলৌকিক স্পর্শ বা আশীর্বাদ নেই।

প্রতিটি মানুষের জীবনেই কিছু কিছু মুহূর্ত থাকে যা মুদ্রার মতোই কিছু খাঁটি কিছু খাদে ভরা। এবং সেগুলিরও যাচাই হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতে সকলেরই মঙ্গল, নিজের পক্ষে তো বটেই। যদিও রঘুর সময় ফুরিয়ে এসেছে তবু শেষবারের মতন সে নিজের জীবনটাকে একবার জরিপ করে দেখতে চায়। তাই সে অতীতের দিকে ফিরে তাকায়। তার প্রশস্ত কপালে ভেসে ওঠে চিন্তার রেখা।

তার জায়গায় অন্য কেউ হলে হয়তো মনে করতো সময়ের অপচয়। কারণ এই সময় ঈশ্বরের চিন্তা করা ছাড়া মৃত্যুপথযাত্রীর আর কিছু করার থাকে না। কিন্তু সময় সম্পর্কে অন্যদের থেকে রঘু স্বতন্ত্র ধারণা পোষণ করে। সময় তার কাছে পৃথিবীর আয়না এবং মানুষ সময়ের দ্বারা প্রভাবিত।

অনেক চিন্তা ভাবনার পর সময়ের একটি বিশেষ তাৎপর্য রঘু আবিষ্কার করেছে। তার মতে সময় মানুষের হাতে কাদামাটি —মানুষ তাকে ইচ্ছেমতো ঢালাই করে নিতে পারে। নিজের শ্রম আর সংগ্রাম মিশিয়ে সময়কে নিজের আয়ত্তাধীন করতে পারলে মানুষ পৃথিবীর অনেক কিছুই বদলে দিতে পারে।

রঘুর কাছ থেকে সময় কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তবু তার সংক্ষিপ্ত জীবনে সময়কে সে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলতে চেয়েছে। কতখানি সে সফল হয়েছে বা হয়নি জীবনের শেষপ্রান্তে এসে আজ সে বিচার

করে দেখতে চায়। তাই তো জীবনের প্রতিটি মুদ্রাকে সামনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়ে ভালো করে দেখছে সে। একটি একটি করে যত্ন করে তুলে এনে দেখছে।

ইনি রঘুর মা।

রঘুকে তিন বছরের শিশুটি রেখে তিনি মারা যান।

মায়ের ভাসা ভাসা চোখ এখনো সে দেখতে পায়। মায়ের স্তনের কাঁচা দুধে ভরে যেতো তার গাল। মা তাকে জড়িয়ে ধরে বুকের সঙ্গে মিশিয়ে দিতেন। সেও বোধহয় মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে ঘুমিয়ে পড়তো।

এই সব স্মৃতি তার ঝাপসা মনে আছে। কিন্তু মায়ের শরীরের ঘ্রাণ আজও সে অনুভব করতে পারে। মায়ের শরীরের ঘ্রাণ এই মুহূর্তেও সে আস্বাদ করে তৃপ্তি পায়।

রঘু মুদ্রাটিকে তুলে নিয়ে হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়ে চুমু খায় এবং যত্ন করে একপাশে সরিয়ে রাখে।

ইনি রঘুর বাবা। দেরায়্যা।

তিন বছর বয়েস থেকে দেরায়্যা তার কাছে মা ও বাবা দুই-ই ছিল। বাবা তার বন্ধু ও সাথী। সহযোদ্ধা এবং শিক্ষক। বাবার অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে এক হয়ে গিয়েছিলো।

খুবই ভালো হতো যদি বাবার বৈশিষ্ট্যগুলি সে পৃথক পৃথক ভাবে পেতো। হয়তো তার জীবন সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতো।

আরেকটি মুদ্রা সে তুলে নিল।

এটি হচ্ছে সমাজ ও প্রতিবেশ। মানুষের জীবনকে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য করে। একমাত্র সংগ্রাম করেই মানুষ সেই গণ্ডির বাইরে আসতে পারে। নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে।

* * * *

দেরায়্যা ছিল হরিজন সম্প্রদায়ের লোক। বেগার খাটা একটি জীব। বাচ্চাটিকে একা ঘরে রেখে তাকে জোতদারের আদেশে

বেগার খাটতে যেতে হতো। শিশুপুত্রের দোহাই দিয়ে ঘরে থাকার উপায় তার ছিল না। অসহায় সে। ছেলেকে আদর করে চোখের জল মুছতে মুছতে সে বেরিয়ে যেতো। আর বাচ্চাটি কাঁদতে কাঁদতে একসময় ঝিমিয়ে পড়তো। তারপর ঘুমিয়ে পড়তো। এইভাবে ধীরে ধীরে চুপ হয়ে থাকা সে শিখে নিল। তারপর যখন তার হাত পা মাথা বড়ো হলো তখন সে রুটি তৈরি করে বাপের জন্যে মাঠে নিয়ে যেতো।

এসব কাজ রঘুর কাছে তেমন কঠিন ছিল না। তাছাড়া রুটি তৈরির প্রয়োজনও তেমন হতো না। অধিকাংশ দিনই বজরার দানা জলে সিদ্ধ করে তাতে কিছুটা নুন মিশিয়ে কলাপাতায় করে সে তার বাপের জন্যে মাঠে নিয়ে যেতো। অবশ্য কোনো কোনো দিন জোতদারের বাড়ি থেকে ইডলী চাটনী আসতো। সেইসব খেয়ে শরীরে শক্তি সঞ্চয় করে দ্বিগুণ উৎসাহে ফসল কাটতে শুরু করতো তার বাবা। রঘু বাবাকে সাহায্য করতো। কাটা ফসলের আঁটি বাঁধতো সে।

তারপর এমন দিন এলো যখন বীজ বোনা, ফসল কাটার কাজ শিখে নিল এবং ফসলের ভাগ থেকে বঞ্চিত হয়ে মুখ বুজে চুপ করে থাকাও শিখে নিল।

রঘু এখন পুরোদস্তুর ক্ষেতমজুর। তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে। ক্ষেতমজুর দেরায়্যা এখন গর্বভরে নিজের ক্ষেতমজুর ছেলের দিকে তাকায়। বোঝাটানা গাধা বোঝার ভারে ন্যুব্জ সন্তানের দিকে যেভাবে তাকায় সেইভাবেই। বাপের সর্বক্ষণের চেষ্টা কি ভাবে ছেলের বোঝা হালকা করা যায়। ছেলের সর্বক্ষণের চেষ্টা কি করে বাপের বোঝাটা নিজের কাঁধে নেওয়া যায়। আর জোতদারের চিন্তা হচ্ছে কি করে দুজনের বোঝাটাই আরো ভারী করে দেওয়া যায়।

দুই

রঘু মুদ্রাগুলিকে উলটে পালটে ভালো করে দেখে নেয়। কোথায় কোথায় বাপের সঙ্গে তার মিল আছে ভেবে দেখার চেষ্টা করে। বাপের দেহের গড়ন, গায়ের রং, দারিদ্র্য সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে দেখতে থাকে।

এ সবের মধ্যে দারিদ্র্যটাকে নিশ্চয়ই পাল্টানো যেতো। এ ইচ্ছেটা বড় হয়ে নয়, ছোটবেলাতেই তার মনে জেগেছিল। যখন তার চোখের সামনে দিয়ে গাঁয়ের আর সব ছেলে-মেয়েরা পাঠশালায় যেতো সেই তখন থেকে। ছেলে-মেয়েদের বইয়ের বোঝা, সেই পাঠশালা আর তাদের নানা রঙের সুন্দর সুন্দর জামা কাপড়। হ্যাঁ, এখনো তার স্পষ্ট মনে পড়ে, খুব ইচ্ছে হতো একটু ছুঁয়ে দেখতে। কী অসম্ভব প্রবল ছিল সেই ইচ্ছেটা!

বাপও বুঝতো ছেলের মন। প্রচণ্ড নাড়া খেত সে। তবু সস্নেহে ছেলের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে তাকে বুঝিয়ে বলতো এটা ঠিক নয়। ওরা আর আমরা আলাদা। এটাই নিয়ম। হরিজনের ছেলে হরিজনই হবে। যেমন দেশমুখের ছেলে দেশমুখ,* কেরানীবাবুর ছেলে কেরানীবাবু, পুরোহিতের ছেলে পুরোহিত হয়। এটাই নিয়ম। এই নিয়মেই ওদের ছেলে পাঠশালায় যায়, আর আমাদের ছেলে ফসল কাটতে যায়। হাজার বছর ধরে এই নিয়মই চলে আসছে, আরো হাজার হাজার বছর ধরে এই নিয়মই চলতে থাকবে।

হাজার বছর ধরে চলে আসছে এইটুকু রঘু বুঝতে পারে। বুঝতে পারে না কেন আরো হাজার বছর ধরে এই নিয়ম চলবে। তবু সে চুপ করে থাকে। বাপের যুক্তির কাছে হার মেনে নেয়।

কিন্তু এ কি সত্যিকারের হার মানা? হার মানতে সে পেরেছে কি?

---

*দেশমুখ—অন্ধ্র প্রদেশে জোতদারকে বলা হয় দেশমুখ।

এবার রঘু তুলে নের বিশেষ একটি মুদ্রা। তার জীবনের বিশিষ্ট একটি মুহূর্ত।

তার বয়েস তখন এগারো। সিরিয়াপুর গ্রামে মেলা বসেছে। প্রতি দশবছর অন্তর এই মেলা বসে সিরিয়াপুরে। জমকালো মেলা। এই মেলার সময়ে তাদের ছুটি। বেগার খাটতে হয় না। এই মেলার ক'টা দিনই হরিজনরা নিজেদের মানুষ ভাবতে শেখে।

মেলা বসেছে। তাল-তেঁতুলের ছায়াঘেরা সিরিয়াপুর গ্রামে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। দেরায়্যা এই প্রথম ছেলেকে নতুন জামা কাপড় পরাতে পারলো। খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবি, মাথায় পাগড়ী। কী সুন্দরই না দেখাচ্ছিল রঘুকে। রঘুর গলায় বেঁধে দিয়েছিলো ঝাড়-ফুঁকের একটি তাবিজ। এক সাধুবাবা তাকে দিয়েছিলেন। কালো সুতো দিয়ে বাঁধা সেই তাবিজ রঘুর গলায় অলঙ্কারের মতো শোভা পাচ্ছিল।

ভগবতী নদীতে স্নান করে নতুন জামা কাপড় পরে রঘুর মনে খুশি ছলকে উঠেছিল। এক বাটি আটার জাউ খেয়ে বাপের হাত ধরে সে মেলার দিকে রওনা হলো। রাস্তার দু ধারে গাছের ছায়ায় ছেলেরা ড্যাংগুলি, হাডুডু খেলছে। একটা বুড়ো বটগাছের তলায় মেয়েরা কানামাছি খেলছে। আরেকটু এগিয়ে গেলেই রনসন ব্যাণ্ড—পাথুরে শক্ত মাটির অঞ্চল। এখানেই মেলা বসেছে।

মেলায় অজস্র ফেরিওয়ালা এসেছে। কারো দোকানে বাসন-কোসন, কারো দোকানে নানা রঙের কাপড়-চোপড়। কাঁচের চুড়ি নিয়ে বসেছে কেউ কেউ। গন্ধ তেল, তামাক, গুড়ের দোকানও রয়েছে। ছোটদের জন্য মাটির পুতুল, কাঠের খেলনা, তালপাতার ভেঁপু। এ ছাড়া রয়েছে নাগরদোলা। ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। হৈ-চৈ, ভীড়, লোকজন, চেঁচামেচি, হাসি, ঝগড়া, শিশুর কান্না সব মিলিয়ে এলাহী কাণ্ড! রঘু আশ্চর্য অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে মেলার হরেক রকম দৃশ্য।

একটা জাপানী রেশমী কাপড়ের দোকানের সামনে এসে রঘু থমকে

দাঁড়ায়। বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে সে একটি লাল রঙের রেশমী কাপড় দেখতে থাকে। কাপড় যে এত নরম, এত সুন্দর হতে পারে তা তার ধারণা ছিল না।

আজ এই মুহূর্তে তার মনে পড়লো, রেশমী কাপড়ের একটা থান হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখার লোভ সে সামলাতে পারেনি। তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না কাপড়ও স্বপ্নের মতো কোমল, স্বপ্নের মতো স্বচ্ছ হতে পারে। আর সেই জন্তেই সে স্পর্শ করে বুঝতে চেয়েছিল সত্যিই সেটা কাপড় কি না।

আজ এত বছর পরেও জেলের কুঠরিতে বসে সেই মুহূর্তের অনুভূতি রূপার মুদ্রার মতো তার মনে ঝনঝন করে বেজে উঠলো। রঘু বেশ কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে শুনতে থাকলো সেই শব্দ। তারপর সেই অদৃশ্য মুদ্রার কোমল পরশ গায়ে বুলোতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়ে গেল পরবর্তী ঘটনা। দোকানদার হেঁচকা টানে তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে হুলফুটোনো তীক্ষ্ণস্বরে ধমকে উঠেছিল।

—ইতর, কামলার বাচ্চা, তোর এত সাহস রেশমের কাপড়ে হাত দিস! পিটিয়ে গায়ের চামড়া তুলে নেব।

অস্পৃশ্য হরিজনের হাতের স্পর্শে রেশমের কাপড় বুঝি অপবিত্র হয়ে গেল,—দোকানীর ক্রোধের মধ্য দিয়ে সেই মনোভাবই ফুটে বেরোচ্ছিল।

দেরায়া তাড়াতাড়ি কাপড় থেকে রঘুর হাতটি সরিয়ে নিয়েছিল এবং টানতে টানতে তাকে নিয়ে ভীড়ের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। সেই মুহূর্তে রঘুর মনে হয়েছিল রেশমের কোমল পরশ তার জন্তে নয়। জীবনের সব নগ্নতাই শুধু তার প্রাপ্য।

এখন রঘু তুলে নেয় একটা নকল মুদ্রা। এটি তার বাসনার বাজারে কিছুতেই চালাতে পারছিল না। উল্টে পাল্টে কোনো কৌশলে নয়। এই মুদ্রাটি তার নিজের নয়, তার বাবার নয়, স্বজনের শ্রমের বিনিময়ে অর্জিতও নয়। এটি সমাজের শীলমোহর মারা মেকী মুদ্রা। রঘুর মনটা হঠাৎই ভারী ও উদাস হয়ে ওঠে।

দেরায়্যা অনেক বুঝিয়েও তার মন হালকা করতে পারেনি। তখন সে ছেলেকে নাগরদোলায় চড়ালো, গুড়ের শরবত খাওয়ালো কিন্তু তবু ছেলের মনে রেশমের রঙীন কাপড়ের জন্তে আক্ষেপটা রয়েই গেল।

তিন

দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। মেলা ভাঙার সময় হয়ে এসেছে। রঘু বাবার হাত ধরে মেলা থেকে বেরিয়ে এল। বড় রাস্তার মোড়ে দেখা হলো বিস্থিয়া আর নরগায়্যার সঙ্গে। জোতদারের পোষা গুণ্ডা এরা।

দুজনেই মদে চুর হয়ে আছে। চোখ রক্তজবার মতো লাল। হাতে ছুরি। ওরা প্রকাশ্যেই ছুরি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। দেরায়্যা ও রঘুরায়্যাকে দেখা মাত্রই ঘিরে ধরলো দুজনে। দেরায়্যার বুক কেঁপে উঠলো। বুঝতে পারলো এদের মতলব ভালো নয়। তবু মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল,—কেমন আছো ভাইয়া ?

—পীরিতের দরকার নেই। আগে চল্।

দেরায়্যা জানতে চাইল,—কোথায় যেতে হবে ভাই ?

নরগায়্যা বলল,—যেতে হবে সুরিয়াপেট। বাবুর কাজ আছে, তোদের ডেকেছে,

রঘু আশ্চর্য হলো। চোখ বড় বড় করে বলল,—আজ তো মেলা। আমাদের ছুটির দিন, আজ আবার কাজ কি ?

বিস্থিয়া ছুটে এসে রঘুর ঘাড় শক্ত করে ধরে গালে পর পর তুটি চড় কষালো। রঘুর মাথার পাগড়ীটা খুলে নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। নতুন জামাটা দু হাতে ছিঁড়ে ধুতিটা খুলে তাকে উলঙ্গ করে দিল। তারপর এক ধাক্কাতে মাটিতে শুইয়ে দিল।

এখানেই শেষ নয়। তারপর বিস্থির বক্তা হোটাল।

মার খেয়ে রঘুর মাথায় রক্ত উঠে এসেছিল। সে একটা কড়া

জবাব দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। পরে ভেবে দেখলো, বিদ্বিরা তাগড়া জোয়ান আর সে বাচ্চা তাই চুপ করে গেল। সে দু হাতের ওপরে ভর দিয়ে উঠতে যাচ্ছিল এমন সময় দরগায়্যা ওর বুকের ওপর ছুরি ধরলো। দেরায়্যা ছুটে এসে ককিয়ে কেঁদে উঠলো।

—মালিক, ওকে মাফ করে দাও। ও এখনো বাচ্চা। ওর তো বোঝার বয়েস হয়নি যে আমরা জোতদারের বেগারখাটা বাঁধা কামলা। আমরা হরিজন। মেলার দিনে ডাকলেও আমাদের না গিয়ে উপায় নেই।

রঘু এবার ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে বলে উঠলো,—কেন যাবো? মেলার দিনে কেন যাবো?

সঙ্গে সঙ্গে দেরায়্যা ছেলের গালে জোরে চড় কষালো। বলল,—

—বেআক্কেল, চুপ কর্।

রঘুর ঠোঁট কেটে তাজা রক্ত বেরিয়ে এল।

বাপ এর আগে তাকে কোনোদিন মারেনি। এতটুকু আঘাত দেয়নি কোনোদিন। অভিমানেই রঘুর চোখে জল এসে গেল। ছলছল চোখে সে বাপের দিকে তাকাল। ঠোঁটের রক্ত মোছার চেষ্টা করলো না। রক্ত যখন নিচের দিকে বেয়ে পড়তে শুরু করলো তখন লুকিয়ে জিভ দিয়ে চেটে খেয়ে ফেললো। বাপকে দেখালোও না, কোনো অভিযোগও করলো না।

দেরায়্যা ছেলেকে গালি পাড়তে পাড়তে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল,—চলো ভাই যাচ্ছি। আমরা হচ্ছি হরিজন, বেগার খাটাই আমাদের কাজ। আমি যা, আমার ছেলেও তাই। সেও যাবে। হরিজনদের আবার মেলা-কেলা কি? শখই যদি মিটবে তবে হরিজন হয়ে জন্মেছি কেন?

দরগায়্যা রঘুর ঘাড় ধরে ধাক্কা দিয়ে তাকে এগিয়ে যেতে বলল। তারপর খিস্তি দিয়ে বলল,—হারামজাদা এতক্ষণে চিট হয়েছে। বলে কিনা—যাবো কেন? শুয়োরের বাচ্চার সাহস কতো? বাবুদের সামনে নতুন কাপড় পরে এসেছে।

*দেরাজ্যা হাতজোড় করে বলল,—এবারকার মতো মাফ করে দাও, মালিক। এমন অন্যায় কাজ আর হবে না। আমি বার বার বলেছি তবু গোঁয়ার ছেলেটা শুনলো না। গোঁ ধরে রইল নতুন কাপড় না দিলে মেলায় যাবে না। তাই বাধ্য হয়েই কিনে দিলাম।

দরগায়্যা বলল,—এই ছোকরা, জেনে রাখ্ নতুন কাপড় পরে মালিকের সামনে যাওয়া যায় না।

রঘু গম্ভীর হয়ে বলল,—জানলাম।

দেরায়্যা ধমকে উঠলো,—আবার চোপা করিস?

তারপর গুণ্ডাদের দিকে হাতজোড় করে বলল,—এবারকার মতো ওকে মাফ করে দাও। ও আর কোনোদিন নতুন কাপড় পরবে না।

বিম্বিয়া বলল,—এই জন্যেই তো ওর নতুন জামাটা ছিঁড়ে দিলাম, যাতে আর কোনোদিন ভুল না হয়। কামলাকে কামলার মতোই থাকতে হবে।

দেরায়্যা বলল,—ঠিক বলেছ মালিক। ও ছেলেমানুষ তো, তাই সহবৎ শিক্ষা ওর হয়নি।

জোতদারের দুই পোষা গুণ্ডা ওদের এক জায়গায় দাঁড়াতে বলে আরো হরিজন সংগ্রহ করতে মেলার মধ্যে চলে গেল। সেই ফাঁকে রঘু নর্দমা থেকে পাগড়ীটা তুলে আনলো। ধুতিটা পরে নিল এবং পাগড়ীর কাপড়টা কোমরে জড়িয়ে নিল। ধুলো, মাটি, কাদার দাগ লেগে পোশাক আর নতুন নেই, তাতে হরিজনের ছাপ পড়ে গেছে। সুতরাং জোতদারের গুণ্ডাদের এবার আর আপত্তি হবে না।

ওরা মেলা ও মেলার আশপাশের গাঁ থেকে আরো পঞ্চাশ-ষাটজন হরিজন মজুর (কামলা) ধরে নিয়ে এল। এদের ভেড়ার পালের মতো তাড়াতে তাড়াতে ওই দুই গুণ্ডা জোতদারের দেউড়ীতে এনে হাজির করলো।

প্রাসাদের মতো বিশাল বাড়ি জোতদারের। সামনে বিরাট সিংহতোরণ। বাড়ির ভিতরে জলসাঘর, শয়নমন্দির। দেউড়ী থেকে বাড়ির ভিতরটা কিছুটা দেখা যায়। রঘুর অনেকদিনের কৌতূহল

জোতদারের বাড়িটা দেখার। আজই সে প্রথম খানিকটা সুযোগ পেল। এর আগে প্রাচীরের পাশ দিয়ে ঘুরে গিয়েছিলো। দারোয়ান কটকে পাহারা দিচ্ছিল, তাকে দেখে ভিতরে ঢোকার সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি রঘু।

অজানাকে জানার আগ্রহ, সব বিষয়ে কৌতূহল—শিশুদের এই সব প্রবণতা রঘুর মধ্যেও ছিল। তাই এত মার খাবার পরেও, নতুন জামাটা চলে যাবার পরেও, দুঃখ-কষ্ট ভুলে সে মাথা তুলে জোতদারের প্রাসাদের মতো বিশাল বাড়িটা বার বার তাকিয়ে দেখতে লাগলো।

বাপ এসে ছেলের ঘাড় ধরে মাথাটা নুইয়ে দিয়ে বলল,—বেআক্কেল ছেলে, ওপর দিকে তাকাসনি, নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে থাক। বাবু দেখলে আবার মারধোর করবে।

রঘু চট্ করে চারদিক একবার তাকিয়ে দেখে নিলো। দেখলো হরিজনরা সবাই হাতজোড় করে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকেই নতমস্তকে পায়ের নখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে দাঁড়িয়ে আছে।

—দরগায়্যা!

একটা তীক্ষ্ণ কর্কশ শব্দ রঘুর কানের পর্দায় গিয়ে আঘাত করলো। দরগায়্যা বিনীত স্বরে সাড়া দিয়ে বলল,—জী হুজুর, আদেশ করুন।

রঘুর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, জোতদারের চেহারাটা একবার দেখে নেয়। কিন্তু দেখতে হলে মাথা তুলতে হয়। সাহস হলো না রঘুর। সেই কর্কশ কণ্ঠস্বর এবার আরো তীক্ষ্ণ হয়ে বাজলো।

—কতজন এনেছিস?

—দুই কম ষাট, হুজুর।

—ঠিক আছে, ওদের খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত কর্। অনেক দূরে যেতে হবে।

বিখিয়া বলল,—খাবার ওরা সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছে।

রঘু মনে মনে বলল,—এক নম্বরের মিথ্যেবাদী।

—বেশ, বেশ। ওগুলোকে তাহলে কাজে লাগিয়ে দে।

শেষের কথাগুলি আরো রুক্ষ শোনালো।

চার

ঝিঝিরা আর দরগায়্যা হরিজনদের উল্টোপথে হাঁটিয়ে দেউড়ীর বাইরে নিয়ে এল। ফটকের কাছে এনে, কারো কাঁধে, কারো মাথায় মালপত্র চাপাতে লাগলো।

এই সব মালপত্র হরিজনদের বয়ে নিয়ে যেতে হবে সুরিয়াপেট। আজ থেকে এক বছর পরে জোতদারের ছেলের বিয়ে। সপরিবারে জোতদার জগন্নাথ রেড্ডি উপহার সামগ্রী নিয়ে আজ চলেছে ভাবী পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করতে।

চারটি পাল্কি সাজানো হয়েছে। একটিতে করে যাবেন জগন্নাথ রেড্ডি। সিরিয়াপুর, পাত্তিপাড়ু ও আশপাশের আরো দশটি গ্রামের একচ্ছত্র অধিপতি এই জগন্নাথ রেড্ডি। দ্বিতীয় পাল্কিতে যাবেন প্রতাপ রেড্ডি। তারই প্রাক্ বিবাহ উৎসবের জন্যে এই বিপুল আয়োজন। তৃতীয়টিতে যাবেন প্রতাপ রেড্ডির মা। ভাবী পুত্রবধূর আশীর্বাদ অনুষ্ঠানে ওঁর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। প্রথম দুটি পাল্কির দরজা খোলা। তৃতীয় এবং চতুর্থটির দরজা বন্ধ। চতুর্থ পাল্কিটির বাহার আবার বেশি। পাল্কির সারা গায়ে রঙীন নকশা করা। দু পাশে লাল রেশমী কাপড়ের ঝালর। সামান্য বাতাসেই ঢেউ খেলতে থাকে। ঝালরের মাথায় কাঁচের ঝুমকো বাঁধা। সেগুলির ঝুম ঝুম শব্দ শুনে মনে হয় জলকেলিরতা অনেক মেয়ে বুঝি একসঙ্গে হেসে উঠলো।

সমস্ত ব্যাপারটাই রামুর চোখে পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। বিশেষতঃ চতুর্থ পাল্কিটি সম্পর্কে তার কৌতূহলের অন্ত নেই। বাবাকে প্রশ্ন করে কোনো উত্তর পেল না। পেল একটি থাপ্পড়।

দেড়-দু ঘন্টা ধরে চললো উপহার সামগ্রীগুলি মানুষদের কাঁধে, মাথায় চাপানোর পালা। তারপর আগে পাল্কি, পিছনে মালসহ মজুরদের শোভাযাত্রা এগিয়ে চললো। একেকটি পাল্কির জন্যে আটজন করে বাহক নিযুক্ত হলো। পাল্কিগুলি সাজানো হয়েছে এইভাবে,—প্রথমে জগন্নাথ রেড্ডির পাল্কি, তারপরে জগন্নাথ রেড্ডির স্ত্রীর, তৃতীয় স্থানে প্রতাপ রেড্ডির আর আরোহীহীন পাল্কিটি চতুর্থ স্থানে।

রঘু বুঝতে পারলো না একটি পাল্কি কেন খালি বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা-ও আবার অতিরিক্ত সাজসজ্জা করিয়ে।

দেরায়্যাকে দেওয়া হয়েছে জোতদারের পাল্কি বইবার কাজ। আর রঘুকে দেওয়া হয়েছে একটা বড় আয়না বয়ে নিয়ে যাবার কাজ।

আয়নাটা পেয়ে রঘু খুবই খুশি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের মুখ দেখে নিল সে। আনন্দে ভরে উঠলো তার মন। এভাবে নিজেকে দেখেনি সে কোনোদিন। কিন্তু এইভাবে বার বার নিজেকে দেখতে গিয়ে সে ক্রমশই পিছিয়ে পড়তে থাকলো। পিছিয়ে পড়তে পড়তে সে একেবারে চতুর্থ পাল্কিটির পিছনে চলে এল। তার বাবার বন্ধু রঙ্গডুর পাশাপাশি সে চলছিল। রঘু একবার চারদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখে নিল। দেখলো জোতদারের গুণ্ডারা কাছাকাছি নেই। নিশ্চিন্ত হলেও ফিসফিস করে রঙ্গডুকে জিজ্ঞেস করলো,—খুড়ো, ওই পাল্কিটা খালি কেন?

রঙ্গডু রেগে গিয়ে ঝাঁঝালো স্বরে বলল,—তার আমি কি জানি?

রঘু এবার কণ্ঠে আব্দার মিশিয়ে বলল,—বলো না খুড়ো।

রঙ্গডুর মাথা আজ এমনিতেই গরম। জোতদারের গুণ্ডারা মেলা থেকে আজ তাকে ধরে বেঁধে এনেছে। বছরের সব দিনগুলিই তো জোতদারের। এই মেলার ক'টি দিনই শুধু তাদের। এইজন্যেই আজ তার কথা বলতেও ইচ্ছে করছে না। কিন্তু রঘুর কচি কণ্ঠের আবদারে তার মনটা ভিজে গিয়েছে। এদিক ওদিক ভালো করে দেখে নিয়ে সে বলল,—এই খালি পাল্কিটায় বাবুর মায়ের বোন (খিল্লি)

আসবেন।

রঘু এই সাঙ্কেতিক ভাষা বুঝতে পারলো না। বড়োরা হলে হেসে উঠতো। সে আবদার জানিয়ে বলল,—বুঝতে পারছি না খুড়ো, বুঝিয়ে বলো না। কে আসবেন ওই পাল্‌কিতে ?

—আসবেন বাবুর ছেলের (খিস্তি) মায়ের (খিস্তি) সে (খিস্তি)…

রঘুর মাথায় এবারও কিছু ঢুকলো না। সে বোকার মতো তাকিয়ে রইলো খুড়োর মুখের দিকে।

রঙ্গডু মাটিতে একদলা থুথু ফেলে বলল,—ও আসবে। বোকা কোথাকার এখনো বুঝলি না। তবে শোন্‌। আজ থেকে এক বছর বাদে বাবুর ছেলের বিয়ে হবে। সেদিন এই পাল্‌কি চড়ে কনে সুরিয়া-পেট থেকে সিরিয়াপুর আসবে। সেদিনও আমাদের সবাইকে বোঝা বইতে হবে।

কোথেকে একজন পেয়াদা এসে রঙ্গডুকে পিছন থেকে ধাক্কা মেরে খিস্তির ভাষায় সম্বোধন করে বলল,—থামবি না মোটেই, বকর বকর করবি তো হাঁটতে হাঁটতেই করবি। দেখছিস না আগের পাল্‌কি কত এগিয়ে গেছে। রঙ্গডু ও অন্যান্যরা শিথিল ভাবটা ঝেড়ে ফেলে খচ্চরের মতো দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলো। রঘুও আয়নাটা শক্ত করে ধরে ওদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটার চেষ্টা করতে লাগলো।

পাঁচ

সিরিয়াপুর থেকে সুরিয়াপেট যাবার দিনে রঘু শারীরিক কষ্ট ও অপমানের মানসিক জ্বালা যেমন ভোগ করেছিল তেমনি কিছু ভালো অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছিল। এইসব অভিজ্ঞতার স্মৃতি সে কোনো দিন ভুলতে পারেনি। এর মধ্যে প্রথম অভিজ্ঞতাটি হচ্ছে আয়নায় ভেসে ওঠা তার নিজের গ্রামকে দেখা। চলতে চলতে হঠাৎই পাহাড়ী উঁচু পথের মোড় থেকে আয়নার মধ্যে সে দেখতে পেয়েছিল নিজের

গ্রামকে। তার গ্রাম যে এত সুন্দর এর আগে সে কোনো দিন উপলব্ধি করেনি। ছবির মতো লাগছিল তার। খড় লতাপাতা দিয়ে তৈরি তাদের ঝুপড়িগুলো, বড় বড় গাছ, যেখানে পাখিরা এসে রাত্রি যাপন করে—সব কিছুই এই প্রথম যেন সে দেখলো এবং নিজের গ্রামকে ভালোবেসে ফেললো।

সেই মুহূর্তে পথের দুঃখ কষ্ট, অপমানের জ্বালা সে ভুলে গিয়েছিল। কাছ থেকে যা সে দেখেনি আজ দূর থেকে সেই অদেখার অপূর্ণতা দূর হয়ে গেল তার। দূরত্ব জীবনের যেসব সৌন্দর্য ও মাধুর্যের সৃষ্টি করে, সেসব রঘুর মনে দাগ কেটে বসলো।

মুহূর্তের সেই সৌন্দর্য, তার নিজের গ্রাম, নিজের ঘর, ভালোবাসার আলপনায় মুদ্রিত হয়ে রইলো তার বুকে। আজ জেলখানার অন্ধকার কুঠরিতে বসে চোখ বন্ধ করলেই এক এক করে সেদিনের সেই দৃশ্যগুলি ভেসে ওঠে। অত্যন্ত কাছের জিনিস হয়ে ওঠে। ইচ্ছে করলে সেই ছবিকে সে স্পর্শ করতে পারে, সেদিনের লক্ষ আনন্দের আস্বাদ নিতে পারে। তাদের সমবেত জীবনকে সুন্দর করে তোলাই ছিল তার সংগ্রামী জীবনের লক্ষ্য। তাই জীবনের সুন্দর স্মৃতিগুলিকে আজ সে নেড়েচেড়ে দেখছে।

দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটি রঘু সঞ্চয় করেছিল সুরিয়াপেটের ঘোড়ার আস্তাবল থেকে। ঘোড়ার আস্তাবলে রাত জেগে এই অভিজ্ঞতাটি সে লাভ করেছিল অপ্রত্যাশিত ভাবেই।

একটি প্রশস্ত আস্তাবলে গ্রামের মহাজন শ্রীরামা পুনতলু, পুরোহিত শ্রীশিয়ারাম শাস্ত্রী, থানার দারোগা শ্রীলক্ষ্মীকান্ত এবং আরো সব নামী-দামী অতিথিদের ঘোড়া রাখা হয়েছিল। হরিজন মজুরদেরও রাত্রি যাপনের জন্যে স্থান করে দেওয়া হয়েছিল ওই আস্তাবলেরই এক কোণে। সেদিনের যে কথাটি আজও তার মনে দাগ কেটে বসে আছে তা কিন্তু ঘোড়াদের বিচিত্র সাজসজ্জা নয়, আস্তাবলের দুর্গন্ধও নয়, কিংবা মাটিতে শুয়ে রাত্রিযাপনের কষ্টও নয়, সেটি একটি গানের কাহিনী। হরিজন গায়েনরা শুনিয়েছিল সেই গান। আশীর্বাদ

অনুষ্ঠানে গান করার জন্যে জগন্নাথ রেড্ডি পাত্তিপাড়ু থেকে এদের আনিয়েছিলেন। তাদেরও রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হয়েছিল এই আস্তাবলেই। অনুষ্ঠানের মজলিসে গান গাইবার পর তারা নিজেদের আপনজনদের শুনিয়েছিল এই গান। গায়েনদের দলে ছিল তিনজন।

তিনজনের একজন। ভারি সুন্দর দেখতে। গায়ের রঙ ফর্সা আর মুখে সাদা দাড়ি। মানুষটিকে দেখে মনে পড়ে যায় সেই দৃশ্যের কথা যখন অন্ধকার রাতের আকাশ রক্তিম হয়ে ওঠে, আঁধারের বুক চিরে টকটকে লাল গোলাকার বস্তুটির যখন আবির্ভাব হয়। মানুষটির হাতের তালুটি যেন তারাভরা আকাশ। আরেকজন গানের ভাষা যোগান দেয়। কৌতুক পরিবেশন করে। গানের মাঝখানে উলটো দিকে প্রশ্ন করে হাসির খোরাক যোগায়। এই মানুষটি বেশ লম্বা, মাথায় পাগড়ী। চেহারায় যৌবনের দ্যুতি। তৃতীয়জন ঢুলী। ঢোল বাজিয়ে গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচে। গানের ধুয়া গায়।

যে গান ওরা জোতদারের মজলিসে গাইতে পারেনি সেই গানই আপনজনদের শুনিয়েছিল তারা।

রাত যখন গভীর হলো, যখন জোতদারের কুটুম বাড়িতে সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন, গাঢ় অন্ধকার যখন প্রকৃতিকে গ্রাস করেছে তখনই বসেছিল গানের আসর। ঘোড়াগুলো যখন বজরা মেশানো ঘাস চিবুচ্ছিল, হরিজন মজুররা যখন সিদ্ধ বজরা খেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল, গায়েনরা তখন ঘোড়াদের জল খাবার পাত্রের কিনারায় প্রদীপ জ্বালিয়ে গান ধরলো।

সাদা দাড়িওলা লোকটি গেয়ে উঠলো,—

—আজ থেকে অনেকদিন আগে...

ঢুলি ঢোলে তাল দিয়ে গাইলো,

—অনেক অনেকদিন আগে...

মাথায় পাগড়ী, যুবকটি সুর দিয়ে বলল,—

—যখন জগন্নাথ রেড্ডির জন্মই হয়নি...

ঢুলী এক চক্কর নেচে নিয়ে গাইলো,—

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। অনেকদিন আগে···

আবার যোগানদার সুর তুলে গাইলো,—

—যখন হরিজনরাও সাদা চালের ভাত খেতো, সাদা রেশমী পোশাক পরতো। প্রথমজন গাইলো,—

—সেই তখন, যখন এখানে কাকিতিয়া সাম্রাজ্য ছিল। উরমাদেবী যখন রাজ্য শাসন করতেন। সেই সময় বিলম্বিম গাঁয়ে এক তরুণ সন্ন্যাসী বাস করতো।

এইভাবে পংক্তিগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইছিলো ওরা। ঢোলের ঢুকঢুক আওয়াজ, একতারার রিনঝিন সুর, মাতোয়ারা নাচ, কৌতুক ;—রঘু এই সবের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললো, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। সুরিয়া গেটের অন্ধকার গহ্বর থেকে বেরিয়ে সে যেন আলো ঝলমল এক সমৃদ্ধ পৃথিবীতে প্রবেশ করলো।

গানের কাহিনীতে ছিলো রূপবান এক যুবক সন্ন্যাসী। আর ছিল অনিন্দ্যসুন্দর রূপবতী এক রাজকুমারী। রাজা এবং সন্ন্যাসী দুই ভিন্ন দেবতার পূজো করতো। সন্ন্যাসী পৃথিবী থেকে সব রকম জুলুম ও অত্যাচারের অবসান ঘটাতে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। ঘুরতে ঘুরতে একদিন রাজকুমারীর সঙ্গে তার দেখা হলো।

তারপর কী হলো ?

গায়েন বললো—ভেবে নাওগা বাবুরা।

তারপর সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। শুধু জেগে রইলো রঘু। বুকের মধ্যে তার কেঁপে কেঁপে একতারার সুর বাজতে থাকলো। রাজকুমারী আর সন্ন্যাসীর চেহারা অনেকক্ষণ তার চোখের উপর ভেসে রইলো। রঘু জানে না সে রাতে কতক্ষণ সে জেগেছিল আর কখনই বা ঘুমিয়ে পড়েছিল। বুঝতে পেরেছিল যখন ভোরের সূর্যের আলো তার চোখ স্পর্শ করেছিল। আর তখনই সে বুঝতে পেরেছিল স্বপ্ন কখন বিলীন হয়ে গিয়েছে। দিনের প্রখর আলোয় স্বপ্নেরা বাঁচে না। সে উঠে বসলো। দেখলো তার বাবা গভীর ঘুমে অচেতনের মতো এক পাশে পড়ে আছে। ঘোড়াগুলোর নিশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ওরা পায়ের খুর দিয়ে মাটি ছিটিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করছে।

ছয়

অনেকক্ষণ রঘুর মন চিন্তাবিহীন শূন্যতায় নিষ্ক্রিয় হয়ে রইলো। জীবনের মৃদু সুর আর ছোটো ছোটো ঘৃণা পাখির মতো স্মৃতিতে ভেসে বেড়াতে লাগলো। এইসব সুর তার মনকে এখন আর তেমন নাড়া দিতে পারছে না। একে একে জগন্নাথ রেড্ডি, দারোগাবাবু, মহাজন আরো সব মালিকদের ছবি ঘৃণার রূপ নিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠছে, পরক্ষণেই মিলিয়ে যাচ্ছে। সে জানতো এই মানুষগুলি তার মনে ঘৃণার বীজ অঙ্কুরিত করেছে, তার মনের জমিতে খাদ সৃষ্টি করেছে। তবু ঘৃণা তার মনে কখনই ঘৃণার পথ ধরে আসেনি। তাই সে এইসব মানুষগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার জীবনের যে মুহূর্তগুলি সেগুলি অতিক্রম করে চলে যায়। অনেকগুলি মুক্তা সে শুধু স্পর্শ করে ফেলে রাখে। তারপর শৈশব থেকে যৌবনে চলে আসে। এখানেই নাগী-সুরের সঙ্গে তার দেখা। নাগীসুর। তার প্রাণের বন্ধু, সংগ্রামের দোসর। নাগীসুর এখন তারই মতো পাশের সেলে বন্দী।

দুজনের চেহারায় অনেক তফাত। রঘু মাঝারী গড়নের, কিন্তু নাগীসুর ছফুট লম্বা, চওড়া বুকের ছাতি। যথার্থই বীরের মতো চেহারা। তার শরীর যেমন লম্বা, হাতেও থাকতো তেমনি লম্বা লাঠি। তার কথা বলা, হাসি সব কিছুই উচ্চগ্রামে বাঁধা।

ভগবতী নদীর ওপারে জঙ্গলে নাগীসুর গরু-মোষ ছাগল চরাতো। গলা ছেড়ে গান গাইতো। রঘুর যখন মাঠ থেকে পালাবার দরকার হতো নাগীসুর তখন তাকে আশ্রয় দিতো। জোতদারের প্রতি ঘৃণা থেকেই দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। জগন্নাথ রেড্ডি প্রায়ই পেয়াদা পাঠিয়ে ছাগল নিয়ে যেতো, পয়সা দিত না। অন্যদিকে রঘু জোতদারের বাঁধা মজুর। ক্রীতদাস। তার বাবাও তাই। অথচ বাবা তাকে বলেছে এমন দিন ছিল যখন তারা বাঁধা গোলাম ছিল না, মজুর ছিল না। তখন তাদের হাল-গরু ছিল, ছিল তরিতরকারীর

বাগান। তাদের জীবনে তখন আনন্দ ছিল, স্বাধীনতা ছিল। শিশুরা উঠোনে খেলা করতো, তাদের কলকাকলিতে স্বর্গের সুর ঝরে পড়তো। সন্ধ্যার কুলবধূরা গান গাইতো। সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়ে মঙ্গলময়ের আরতি করতো। শান্ত সুন্দর জীবনের ছবি আঁকতে আঁকতে দেরাম্যার মুখে ধীরে ধীরে বেদনার ছায়া পড়লো। তারপর কণ্ঠস্বরে ঘৃণা ঝরে পড়লো। দেরায়্যা বলেছিল,—বাবা রঘু, জগন্নাথ রেড্ডির বিশাল প্রাসাদ তো তুমি দেখেছ। দানবের মতো ওই বিশাল প্রাসাদটাই আমাদের সব কেড়ে নিয়েছে। মানুষ থেকে আমাদের জানোয়ার বানিয়েছে। ওই আকাশছোঁয়া প্রাসাদ আমাদের জীবনের, আমাদের ভাগ্যের শত্রু। ওদের আমি ঘৃণা করি। এই ঘৃণা আমার বাবা আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। বাবা রঘু, আমি বুড়ো হয়েছি তাই আমিও আজ তোমাকে সেই ঘৃণা সঁপে দিলাম। মানুষ ছেলেকে জমিজমা, ঘর-বাড়ি, টাকাপয়সা দিয়ে যায় কিন্তু আমার যে ওসব কিছুই নেই তাই আমি শুধু অত্যাচারীর প্রতি ঘৃণা তোমাকে দিয়ে গেলাম। আমি বুড়ো হয়েছি, শক্তি নেই শরীরে, কুঁজো হয়ে গিয়েছি। বয়েস আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছে শুধু ঘৃণাতে কাজ হয় না, আরো কিছু চাই। সেই আরো কিছু কী তা আমি জানি না। তোমার ওপর ভরসা রইলো, তুমি নিশ্চয়ই পারবে। একটা পথ আবিষ্কার করতে পারবে।

সেইদিন থেকে রঘু এই মূল্যবান ঘৃণাটিকে বংশের পবিত্র উত্তরাধিকারের মতো হৃদয়ের এক কোণে সযত্নে রেখে দিয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই উত্তরাধিকারের মূল্যায়ন করেছে। প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সে জেনেছে, জোতদারের ওই বিশাল প্রাসাদের রাক্ষসী ক্ষুধা তাদের সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। সে আরো উপলব্ধি করেছে জোতদার তার একার শত্রু নয়। রমলু, রজম্মু, সুব্বাম্মা আনিকেত, নাগীশ্বর এবং আরো হাজার হাজার হরিজনদের। জোতদারের ওই দানবীয় প্রাসাদ তাদের সকলেরই হাসি-গান, ঘর-দোর খেত-খামার সব কিছু হরণ করেছে।

এই ঘৃণার শক্ত ভিতের ওপরেই গড়ে উঠেছে রঘু ও নাগীশ্বরের

মন্থুষ। এই ঘৃণাই রঘুর উপলব্ধি জাগিয়েছে যে পৃথিবীতে জগন্নাথ রেড্ডি, প্রতাপ রেড্ডিরা সংখ্যায় কম আর হরিজন মজুররা, অত্যাচারিতরা সংখ্যায় বেশি। যদি তারা জোট বাঁধতে পারে, ঐক্যবদ্ধ হতে পারে তবে ওই দেয়াল বেশিদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।

এইসব ভাবনা একদিনেই তার মনে আসেনি। প্রতিকূল পথে চলতে চলতে, অত্যাচারীর মার খেতে খেতে এই সত্য তার উপলব্ধিতে এসেছে। যে শক্তি ঘৃণাটাকে একটা মজবুত অনুভূতির শরীর দিয়েছে তা শুধু জোতদারের প্রতি ঘৃণা নয়, জীবনের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাও।

রঘু এবার জীবনের গাঁটরিটি খোলে। অনেকগুলি উজ্জ্বল মুহূর্তের মাঝে ভালোবাসার একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম সে দেখতে পায়। উজ্জ্বল দীপ্তি ফুটে ওঠে তার চোখে, মুখের শক্ত রেখাগুলি নরম হয়ে আসে।

সুন্দর! মধুর! লাবণ্যবতী!

রঘুর মনে পড়ে যায় কয়েক বছর আগের কথা। কার্পাস খেতে তখন রঘু কাজ করতো। ফুলে ফুলে আবৃত খেতটিকে মনে হয় যেন বরফ আচ্ছাদিত বাগান। সকাল থেকেই সেদিন ফুল তুলছিল রঘু। ভালো ফুলগুলি একটি ঝুড়িতে রাখছিল, খারাপ ফুলগুলি অন্য ঝুড়িতে। শুকনো ফুলের জন্যেও আর একটি ঝুড়ি আছে। সকাল থেকেই রঘু নিপুণ হাতে কাজ করে চলেছে কার্পাস খেতে। আজ বেশি কাজ করতে হচ্ছে তাকে কারণ ওর বাবা আজ অসুস্থ। দুজনের কাজ তাকে একাই করতে হচ্ছে। এই জন্যেই অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে তাকে।

রঘুর কাজের ধারাই হচ্ছে কাজের সময় সে গুনগুন করে গান গায়। আজ ও সে ফুল তুলতে তুলতে গুনগুন করে গান গাইছিল। বিপরীত দিক থেকে একদল মেয়ে এগিয়ে আসছিল। তারা হয়তো মনে করেছিল তাদের দেখেই রঘুর মনের এই স্ফূর্তি। তা কিন্তু নয়। আসলে হাতের ব্যথা ভুলে থাকার জন্যে এবং গানের সুরের সঙ্গে সংগ্রামের মানসিকতার সুর মিশিয়ে দেবার জন্যেই সে গাইছে।

হঠাৎই তার গান থেমে যায়। কারণ তার পাশের কার্পাস গাছের ঘন পাতার ফাঁক থেকে মাথা বের করে রঘুর চোখের দিকে তাকিয়ে খিল খিল করে হাসছিল একটি মেয়ে।

জেলখানার অন্ধকার কুঠরিতে বসে রঘু আজ সেই মুহূর্তটির আস্বাদ নিতে চাইলো। চোখ বন্ধ করে সেদিনের দৃষ্টি নিয়ে আজ সে সেই মধুর মুহূর্তটিকে দেখার চেষ্টা করলো। প্রথমেই সে দেখতে পেলো সুন্দরীর মুক্তোর মতো সাদা ছোটো ছোটো দাঁত। দুঠোঁটের মাঝে দীপ্তি ছড়াচ্ছিল সেই দাঁত। মাথার চুল তার সোনালী। তার চুলে জড়ানো লাল পুঁতির মালা। সুন্দরী ঘাড় ফেরালো। মনে হলো তার খোলা চুলে লাল গোলাপের মেলা।

চার চোখের মিলন হতেই সুন্দরী ফিক্ করে হেসে ঘাগরীর ওপর আঁচল ঠিক করতে লেগে গেল। রঘু দেখলো তার আঁচলটিও গাঢ় লাল রঙের। তাতে রঙবেরঙের ফুলপাতা আঁকা। ছোটো ছোটো কাঁচের বল বসানো সেই আঁচলে। দুপুরের রোদের আলো সেই কাঁচের বলের ওপর পড়ে চিকচিক করছিল। তারপর সাদা তুলোর মাঝে তাকাতেই রঘুর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সুন্দরী এবার ফুল তোলার জন্যে হাত বাড়ালো। তার হাতে কালো কাঁচের চুড়ি, তার ওপর কনুইতে হাতির দাঁতের মতো সাদা ঝিনুকের চুড়ি। হাতের তেলোর উলটো পিঠে সবুজ অক্ষরে তার নাম লেখা। কপালে লাল টিপ।

রঘুর চোখ সুন্দরীর কপালের টিপ থেকে নিচে নেমে এলো। সেই মেয়ের দুই নীল চোখের সমুদ্রে রঘু নিজেকে হারিয়ে ফেললো।

নীল চোখ। গোলাপী গায়ের রঙ। আপেলের মতো মুখ, আপেলের মতো বুক। পাতলা ঠোঁট।

প্রেম এলো বন্যার মতো দু কূল ভাসিয়ে।

পলকেই ঘটে গিয়েছিল এত সব। সেই মেয়ের চোখে চোখ রেখে সে নিজেও হেসে ফেলেছিল। এই হাসিটির তেমন গুরুত্ব নেই। মূল্যবান হলো চোখে চোখে মিলনের সেই মুহূর্তটি।

সেই মুহূর্তটিকেই জীবনে সে বার বার চেয়েছে। ধ্রুবতারার মতো চোখের সামনে জলজ্বল করে দীপ্তি ছড়িয়েছে।

খেতে খামারে কাজ করতে করতে

পুলিস আর পেয়াদাদের চোখকে ফাঁকি দিতে দিতে

কলে কারখানায় কাজ করতে করতে

রিক্সা চালাতে চালাতে

জোতদারের চাবুক খেতে খেতে

জেলখানায় অনশন করতে করতে

বারে বারেই সে মুহূর্তটিকে স্মরণ করেছে, বুকের একান্ত কাছে নিয়ে এসেছে। মুহূর্তটি তাকে শক্তি যুগিয়েছে, আবার কখনো কখনো দুর্বলও করেছে। যখনই দুর্বল হয়েছে তখনই সে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এমনও হয়েছে সে না চাইতেও মুহূর্তটি তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, অহেতুক কষ্ট দিয়েছে। মরুভূমির পথ চলতে চলতে পিপাসার্ত পথিকের সামনে জলের পরিবর্তে শুকনো ফল তুলে দেবার মতো। তবুও মাঝে মাঝেই সেই মুহূর্তটিকে কাছে ডেকে আনে, দুঃখ পাবে জেনেও। বেদনার পেয়ালায় আনন্দের রস পান করতেও সাধ হয় তার মাঝে মাঝে।

সাত

লাম্বাডির (যাযাবর) মেয়ে সে। রঘু তাকে সুন্দরী বলেই ডাকে।

বাবার নাম ভাগিয়া। গান গাওয়া পেশা। দলের সঙ্গে ওরা দেশে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। সম্প্রতি ভাগিয়া যাযাবর দলের সঙ্গে ভগবতী নদীর কূলে এসে আস্তানা গেড়েছে। নদীর পারে সারি সারি তাঁবু।

ওদের মেয়েরা বন থেকে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে

বিক্রী করে কিংবা পাড়ায় ফেরি করে বেড়ায়। সুন্দরীও তাই করতো। এ ছাড়া ওর বাবার ঢোলের তালে তালে নাচতো সে। বাজারে গিয়ে, জোতদারের প্রাসাদের সামনে গিয়ে নাচ দেখাতো। বাবুরা পয়সা দিত।

তখন তুলোর মরশুম। কার্পাস খেতে আরও মজুর চাই। সুন্দরীকেও রেহাই দেওয়া হলো না। তাকেও খেতে কাজ করতে হচ্ছে। বীজ বোনা, ফসল কাটা কিংবা কার্পাস ফুল তোলার কাজ কোনটাতেই সুন্দরী রপ্ত নয়। তার অনেক কাজ সে নিজেই করে দিতো এবং এতে আনন্দ পেত সে। তাদের প্রণয়ের জন্ম-মুহূর্তটি ছাড়াও পরবর্তী কালের কিছু মুহূর্তও এখন রঘুর চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

সত্যি, সময়টা ছিল যৌবনের রসে ভরপুর। সুরে সুরে গানে গানে ভরা। লজ্জা মান অভিমানে ভরা নিটোল জীবন।

জীবনটা ছিল নদীর স্রোতের মতো চঞ্চল উদ্দাম।

ছিলো আলো-লাগা, ভালো-লাগা মন।

তারপর রঘু চাইলো সুন্দরীকে বিয়ে করতে। সুন্দরীও চাইলো রঘুকে স্বামী হিসেবে পেতে। সেদিন সুন্দরী অনেকক্ষণ নেচেছিল। যাযাবর পল্লীতে অনেকের চোখের সামনে নয়, নির্জন জঙ্গলে। নাগীসুরের কুটিরের পিছনে, সুন্দরীর একান্ত মনের মানুষটির সামনে।

সুন্দরীর পরনে ছিল লাল ছাপা কাপড়ের ঘাগরী। তার পায়ের গোছার অনেকখানিই ছিল উন্মুক্ত। ধবধবে সাদা। পায়ের অলঙ্কারগুলো সাপের ফণার মতো সর্বনাশী মোহের বিস্তার করছিল।

রঘু প্রাণ ভরে নাচ দেখেছিল সেদিন। নাচ দেখতে দেখতেই তার চোখে ভেসে উঠেছিল একটি বন্ধ পালকির ছবি। দু'পাশে লাল রেশমের ঝালর, রঙিন নকসা করা পালকি। পালকিটি আজ আর খালি নেই।

রঘু স্মৃতির পাতা ওলটাচ্ছিল।

এল সেই দিনটি। পড়ন্ত বিকেল। সন্ধ্যা আসন্ন। রঘু দিনের

কাজ শেষ করে ভগবতী নদীর পার ধরে হাঁটছিলো। সুন্দরীদের তাঁবুর দিকে যাচ্ছিল সে। পথে রমলু গরলার সঙ্গে দেখা হলো তার। রমলু কোন কথা বলল না। মুচকি হেসে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। রমলুর হাসিটি ইঙ্গিতপূর্ণ। ঈর্ষাজনিত হাসি মনে করে রঘু রমলুকে ডাকল না। কিছুটা যাবার পর রজ্জু খুড়োর সঙ্গে দেখা। সেও হাসলো এবং তার হাসিটিও স্বাভাবিক নয়। রঘু বিরক্ত হলো কিন্তু মুখে কিছু বলল না। রজ্জু খুড়োর ওপর তার অভিমান হলো। বাপের বয়সী মানুষ, সেও তার ভালবাসাকে কৌতুক করছে? কিন্তু কেন? সমাজের বাইরে প্রেম করছে বলে? হাসছে হাসুক। রঘু কারোকে পরোয়া করে না।

চারদিক দেখে নিয়ে রঘু একসময় যবের ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে গেল। কেউ দেখতে না পায় এমন ভাবে নিঃশব্দে সে হাঁটতে লাগল। আধ মাইলের মতো হাঁটার পর যাযাবরদের তাঁবু চোখে পড়লো। সার সারি তাঁবু। বেশ কিছু ছেঁড়া। কোন-কোনটায় তালপাতার তালি দেওয়া। রঘু এগিয়ে চললো। এসে পড়লো ওদের পল্লীতে। দেখলো পুরুষরা চাটাইতে বসে ছেঁড়া তাঁবু সেলাই করছে। মেয়েরা ঝুড়ি বুনছে। কিন্তু তাদের মধ্যে সুন্দরী নেই। এক জায়গায় এক থুরথুরে বুড়ি যৌবনের গান গাইছে আর যুবতী মেয়েরা হাসতে হাসতে একে অন্যের গায়ে ঢলে পড়ছে।

রঘু এসব পেরিয়ে ভাগিয়ার তাঁবুর কাছে গিয়ে পৌঁছলো। ভাগিয়া তখন ঘিয়ের সঙ্গে লবঙ্গ মিশিয়ে জ্বাল দিচ্ছিল। রঘু উনুনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল,—কি বানাচ্ছো?

ভাগিয়া চোখ টিপে বলল,—ভেজাল ঘি খাঁটি বানাচ্ছি।

—ভেজাল ঘি ব্যাচো কেন? খাঁটি ঘি বেচতে পার না?

—জিনিসের দাম বেড়ে গেছে যে। লোকে কম দামে খাঁটি ঘি কিনতে চায়। তাই নকল মালকে আসল বলে চালাতে হয়। দিনকাল বড় খারাপ রে ভাই।

—তোমার মেয়ে কোথায়?

—এখুনি আসবে। দাঁড়িয়ে কেন? বসো না।

—গেছে কোথায়?

—জোতদারের প্রাসাদে। ছোটবাবু ডেকেছেন।

রঘু গলার স্বর চড়িয়ে বলল,—কে? প্রতাপ রেড্‌ডি?

রঘুর বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ছিল। রাগে তার শরীর কাঁপছিল। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো,—কেন ডেকেছে?

—তার আমি কি জানি?

কাঠি দিয়ে ঘি জ্বাল দিতে দিতে ভাগিয়া বলল,—দুপুরে গিয়েছে, ফেরার সময় হয়েছে। একটু অপেক্ষা করো।

রঘু কিছু বলল না। মাটিতে বসে পড়লো সে।

পশ্চিম দিগন্তের লাল রঙ আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। তার মুখের রঙও এখন লাল। মাংসপেশী শক্ত, কঠিন।

দূর থেকে সুন্দরী তাকে দেখতে পেল। তার মুখের কঠিন চেহারা দেখে সে ভয় পেল। মুহূর্তের জন্য সে থমকে দাঁড়াল। কিছু একটা ভেবে নিয়ে সহজ স্বাভাবিক করে নিল নিজেকে। হাসিমুখে রঘুর সামনে এসে জিজ্ঞেস করল,—কখন এসেছ?

রঘু উত্তর দিল না।

সুন্দরী রঘুর গা ঘেঁষে দাড়ালো। আঁচলের খুঁট পাকাতে পাকাতে নরম সুরে বলল,—সরবৎ খাবে?

—না।

—ডাবের জল?

রঘু চিৎকার করে বলল,—না, আমার কিছু চাই না।

সুন্দরী বলল,—কি হয়েছে তোমার? এত রাগ কেন?

রঘু সরাসরি প্রশ্ন করল,—কোথায় গিয়েছিলি তুই?

—প্রতাপ রেড্‌ডি ডেকেছিল।

—কেন গিয়েছিলি?

—মালিক ডেকেছে, না গিয়ে আমার উপায় ছিল না।

—দুপুর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সেখানে কোন্ কাজটা হলো ?

সুন্দরী এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। এবার সে ক্লান্তিতে বসে পড়লো। কণ্ঠে তার উদাস সুর ঝরে পড়লো।

—নতুন কোন কাজ নয়। বরাবর যে কাজের জন্তে ডেকে পাঠানো হতো আজও সেই কাজেই যেতে হয়েছিল।

রঘু বিদ্রূপের ঝাঁঝ মিশিয়ে বলল,—ব্যভিচার ?

—না, আমি ব্যভিচারিনী নই।

সুন্দরী এবার জলে উঠে বলল,—আমি প্রতাপ রেড্ডিকে সাফ বলে দিয়েছি, আমার সঙ্গে সব করতে পারবে কিন্তু বুক স্পর্শ করতে পারবে না।

অনেক দুঃখের মধ্যেও রঘুর হাসি পেল। তবু বলল,—এতে তোর কি বাঁচালো ?

—আমার বাচ্চা যেখান থেকে দুধ খাবে তাকে আমি অপবিত্র হতে দিইনি।

—বাচ্চা তো অনেক পরের কথা, তার আগেই···

সুন্দরী মায়াবী চোখ তুলে রঘুর দিকে তাকাল।

রঘু মুখ ঘুরিয়ে নিল। মনে মনে সে সুন্দরীকে প্রশ্ন করলো। সুন্দরী, বাচ্চা দুধ খাবে বলে বুকটাই শুধু পবিত্র রাখতে চাস ? বাচ্চার আসার পথটাকে পবিত্র রাখতে নেই বুঝি ? যে ঠোঁট দিয়ে বাচ্চাকে চুমু দিবি, যে হাত দিয়ে বাচ্চাকে জড়িয়ে ধরবি সে সব বুঝি পবিত্র না রাখলেও চলে ? সুন্দরী, তোর পুরো শরীরটাই পবিত্র। তাকে কেন টুকরো টুকরো করে এভাবে বিলিয়ে দিলি ?

সুন্দরী নির্বাক। রঘু মুখে কিছু না বললেও তার মনের কথা বুঝতে বাকি নেই সুন্দরীর। কিন্তু তার বলার কিছু নেই। যাযাবর জাতের মেয়েদের কাছে এ সব সূক্ষ্ম প্রশ্নের কোন জবাব নেই।

সুন্দরীর চোখ থেকে টসটস করে জল ঝরতে লাগলো। চোখের জল গাল বেয়ে এসে মাটিতে পড়ছিল। রঘু সেই দিকে তাকিয়ে দেখলো।

অনেকটা সময় তারা দুজনে দু দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে রইলো। এক সময় সুন্দরীর চোখের জল শুকিয়ে গেল। মাটির ওপর চোখের জলের দাগও মিলিয়ে গেল।

রঘু উঠে দাঁড়ালো। মনে মনে বলল, চোখের জল অন্ধকার পৃথিবীকে উর্বরা করতে পারে না। এর জন্যে চাই রক্ত। চাষীর রক্ত।

রঘু তার মন থেকে প্রেমের শেকড়গুলো উপড়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সহসা সে অনেক স্মরণীয় মুহূর্তের প্রাচীর টপকে নতুন এক মুহূর্তকে বরণ করে নিল।

সে রাতে রঘু বাড়ি ফিরল না। যাযাবর পল্লী থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তায় এসে উঠলো, যে রাস্তায় একদিন তার গোলামীর জীবন শুরু হয়েছিল। কিন্তু আজ আর সে কারো গোলাম নয়। সে আজ সম্পূর্ণ স্বাধীন। আজ তার হাতে রয়েছে অন্ত্র আয়না। নিজের আয়না। এই আয়না হাতে নিয়ে সে নতুন প্রেমিকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো।

আট

অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া পয়সা খুঁজে বের করার মতো জীবনের অনেক স্মরণীয় ঘটনার স্মৃতি সে এতক্ষণ এখান থেকে ওখান থেকে তুলে এনে দেখেছে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে তার মন আর কাজ করছে না।

জীবনের ঘটনাগুলি যদি মালার মতো পরস্পর সংযুক্ত সুতোয় বাঁধা থাকতো তাহলে সুবিধে ছিল। একটি মুহূর্তকে টান দিলে সব মুহূর্তগুলিই এক এক করে চলে আসতো। কিন্তু তেমনটি হচ্ছে না। এর পর তাকে বহু কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথ অতিক্রম করে আসতে হয়েছে। মাঝে মাঝে জীবনের একটা লক্ষ্য সে খুঁজে পেয়েছে আবার হারিয়েও ফেলেছে। একটু সাফল্যের আশা, একটু আলো যদি দেখা দিত। একেবারেই দেখেনি এমন নয়। আশার আলো যদি সামনে

না থাকতো তাহলে সুদীর্ঘ বিপদসংকুল সময় সে অতিক্রম করতে পারতো না।

সুন্দরীদের ডেরা থেকে বেরিয়ে এসে, রাস্তায় যখন সে পা রেখেছিল তখন তার সামনে অনেকগুলি প্রশ্ন-চিহ্ন সারি সারি দাঁড়িয়েছিল। কোথায় যাবে সে? কি করবে? তার লক্ষ্য কি? কীইবা সে করতে চায়? প্রশ্নগুলোর উত্তর সে খুঁজে পায়নি। কিছু না ভেবেই সে শহরের দিকে পা চালিয়েছিল। হয়তো জীবনের অভিজ্ঞতা বাড়াবার জন্যে, কিংবা পথের যদি সন্ধান মেলে সেই আশায়। অত্যাচারের অভিজ্ঞতা আর জীবনতৃষ্ণা এই পুঁজিটুকু সম্বল করে সে সুরিয়াপেটে এসেছিল। সেই সুরিয়াপেট যেখানে তার গোলামী জীবনের শুরু। প্রতাপ রেড্ডির শ্বশুরবাড়ির শহর।

সুরিয়াপেটের এক ছোট ব্যবসায়ীর বাড়িতে বাসন মাজার কাজ নিয়ে তার জীবনের আর একটি অধ্যায় শুরু হয়েছিল। ব্যবসায়ীর স্ত্রী তাকে সারাদিন খাটাতো। সামান্য কয়েকখানি রুটি সে খেতে পেত যাতে কোনমতে শুধুই বেঁচে থাকা যায়।

কোনো কোনো দিন রাত্তিরে বাড়িতে হঠাৎ অতিথি এলে রঘুকে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়তে হতো। না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ার অভিজ্ঞতা তার তো ছিলই। গ্রামে থাকতে রোজই খাওয়া জুটতো এমন নয়।

ধীরে ধীরে রঘু জানতে পারলো তার মালিকের শুধু শহরে নয়, গ্রামেও জমি আছে, বাড়ি আছে। গ্রামে জমির পরিমাণ তার মালিক ক্রমশঃই বাড়িয়ে চলেছে। ওখানে থাকতেই আর একটি জগন্নাথ রেড্ডিকে সে জন্মাতে দেখলো।

ব্যবসায়ীর বাড়িটি তেমন বড় নয়। জগন্নাথ রেড্ডির বাড়ির মতো বিশাল নয়। বাসন মাজা ও পাঁচমেশালি কাজ করার চাকরের ক্ষুধার পাশাপাশি মালিকের সম্পদ ও ঐশ্বর্য দিনে দিনে ফেঁপে ফুলে উঠলো। রঘু বুঝতে পারলো বেগারখাটা মজুরের দল শুধু গ্রামেই নয় শহরেও আছে। রেড্ডিরাও শুধু গ্রামেই নয়, শহরেও আছে। রেড্ডিরা ঈশ্বরপ্রেরিত নয়, রাতের অন্ধকারে গোপন পথে এরা ধীরে

ধীরে বেড়ে ওঠে।

রঘুর মালিকের দু-নম্বরী কারবার। এখানে-সেখানে গোপনে মাল পাচার করার কাজও রঘুকে করতে হতো। এইসব কাজ করতে করতে তার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। রঘু বুঝতে পেরেছিল এদের থলি যতই ভরছে ততই তার মতো মানুষদের পেট খালি থাকছে। মালিকের থলির ওজন নেবার অধিকার তার ছিল না। খুব সামান্য একটু অংশ তার ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে চাওয়ার অধিকার তো নয়ই। তার সামনে দুটি মাত্র পথ খোলা ছিল। হাঁ অথবা না। অর্থাৎ হুকুম তামিল করো মুখ বুজে অথবা রাস্তা ত্যাখো।

ভাগ্যের কী অদ্ভুত পরিহাস! জগন্নাথ রেড্ডির প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করার অধিকার তার ছিল না। কিন্তু এখন সে আর এক শত্রুর ঘরে দাসত্ব করছে। এখানে রাতদিন মালিক আর তার স্ত্রীর যে সব আলোচনা শুনতে পায় সবই টাকাপয়সা সংক্রান্ত। তার সম্পর্কে এদের কোনো চিন্তা ভাবনা সহানুভূতি নেই।

চোরাই কারবারের জিনিসপত্তর পাচার করার সময় মাঝে মাঝে তার খেয়াল হতো বন্ধ করে দেয় এই নোংরা খেলা। পরক্ষণেই ভেবেছে কী করে তা সম্ভব? গ্রামে থাকাকালীন তার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার ফলেই সে কিছু করতে পারেনি। পুলিসের ভূমিকা সে দেখেছে। পুলিসও জোতদারের গোলাম তবে তাদের চাইতে উচ্চস্তরের।

পুলিস সম্পর্কে তার ধারণা বই পড়ে বা খবরের কাগজ পড়ে গড়ে ওঠেনি। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই তার এই জ্ঞান হয়েছে। তাই পুলিসে খবর দেবার কথা তার কখনো মনে হয়নি। পুলিশ এই সব অন্যায় কারবারের বন্ধ করার কতটা কী করতে পারে তা তার জানা আছে। কেউ যদি তাকে পুলিসে খবর দেবার পরামর্শ দিতে আসতো তাহলে গলা ছেড়ে সে হেসে উঠতো। নিজের বিপদ ডেকে আনার মতো নিরেট সে নয়।

যে রাস্তায় তার মালিকের বাড়ি সেই রাস্তার অন্যান্য বাড়িতেও

বাসনমাজা ও পাঁচমেশালী কাজ করার জন্যে তারই মতো চাকর আরো অনেকেই ছিল। তারাও সব গ্রাম থেকেই এসেছে। শহরে বেগার-খাটা মজুরে পরিণত হয়েছে সব। শুধু তেলেঙ্গানা নয়, অন্ধ্রপ্রদেশের নানান স্থান থেকে এমনকি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকেও অনেকে এসেছে এই কাজ করতে। এদের মধ্যে একের অন্যের প্রতি সহানুভূতি রয়েছে কারণ সকলেই অত্যাচারিত। মালিকের প্রতি সকলেরই সমান অভিযোগ, সমান ক্রোধ। এরা মালিকের অনুপস্থিতিতে মালিককে খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করতো। মনের জ্বালা অশ্লীল ভাষায় প্রকাশ করতো। গ্রামের ছেলেরা কিন্তু এমন কুৎসিত ভাষা কখনই ব্যবহার করে না। রঘু এদের ক্ষোভ প্রকাশের পদ্ধতির মধ্যে কোনো তাৎপর্য খুঁজে পায় না। অশ্লীল ভাষায় মালিকদের গালিগালাজ করে মনের ক্ষোভ হয়তো মেটে কিন্তু পেটের ক্ষিদে, মানুষের মতো বাঁচার যে সমস্যা তার তো কোনো সমাধান এতে হয় না।

রঘু একদিন তার পাশের বাড়ির চাকর আয়াইয়ার কাছে এই প্রসঙ্গটা তুলতে সে খুব জোরে হেসে উঠেছিল। আয়াইয়া এই অঞ্চলের চাকরদের নেতা গোছের। অথবা সে নিজেই তাদের ওপর নেতৃত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। কু-পরামর্শ দেওয়ায় সে বেশ ওস্তাদ, তাই শিড়দাঁড়া ভাঙা ছেলেগুলো তাকে নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছে।

আয়াইয়া বলছিল,—আমাকে অত বেআক্কেলে ভাবিস কেন? মালিককে পিছন থেকে খিস্তি করলে যে পেটের ক্ষিদে দূর হবে না তা আমি জানি। উপায় একটাই আছে। মালিক তোমার গলা কাটছে, তুমি মালিকের গাঁট কাটো। এই যেমন বাজার করার সময় কিছু কিছু সরাও। যদি তাতেও পেট না ভরে তবে তক্কে তক্কে থাকো, সুযোগ এলেই গয়নাগাঁটি নিয়ে কেটে পড়ো। সম্ভব হলে মালিকের গিন্নীকে নিয়েই। আরে শালা, তুই তো জোয়ান মরদ, চেহারায় জেল্লা আছে। তা ছাড়া গ্রাম থেকে বেশিদিন তো আসিসনি, তাই শরীরে রক্তও আছে। তোর আর ভাবনা কি?

রাস্তা ঝাড়লে যেমন আনন্দে আয়াইয়া রঘুর পাছায় সজোরে

খাজুড় নেড়ে জোরে জোরে হাসতে লাগলো।

আন্নাইয়াকে রঘু মোটেই পছন্দ করে না। অনেক ঘাটের জল খেয়ে সে এখানে এসেছে। অনেকবার নাম পাল্টেছে। প্রয়োজনে আরো অনেকবার নাম পাল্টাবে। এ পাড়া ছাড়াও অন্যান্য পাড়ার চাকরদের চুরির একটা অংশ সে কমিশন হিসেবে পায়। তারপর সবাই মিলে মদ খায়, গাঁজা টানে। পিছনে ওরা মালিকের গলা কাটে, সামনে পা চাটতে ও প্রস্তুত এমন ভাব দেখায়।

আন্নাইয়া রঘুকে দলে টানার জন্যে অনেকবার টোপ ফেলেছে। কিন্তু পারেনি। এদের মধ্যে সে এমন কিছু পায়নি যাতে সে প্রলুব্ধ হতে পারে ওদের দলে যোগ দিতে। এদের চরিত্র বোঝার চেষ্টা করতে গিয়ে তার মনে হয়েছে এরাও কালে কালে বিশ্বিয়া ও দরগায়্যার মতো জোতদার-মহাজনদের পোষা গুণ্ডায় পরিণত হবে। চাকরদের থাকার ছোট ছোট খুপরীগুলোকে তার মনে হয় একটা বিরাট চাকার মতো। গরীব লোকগুলোকে পিষতে পিষতে তাদের মনুষ্যত্বকে নিঃশেষ করে দেয়। যেমনটি হয়েছিল বিশ্বিয়াদের ক্ষেত্রে। বাবার মুখে শুনেছে সে, ওদেরও একসময় জমিজমা ছিল। তারপর হলো ক্ষেত-মজুর। তারপর বেগারখাটা মজুর। তখনো ওদের মনটা ছিল স্বাধীন। তারপর একসময় জোতদারের গোলামীর কারখানায় মগজ ধোলাই হবার পর গুণ্ডায় পরিণত হলো ওরা। তখন থেকে নিজেদের আত্মীয় হরিজনদের ওপরেই তারা হামলা শুরু করলো। বিশ্বিয়াদের ওপর তাই রঘুর রাগ হয় না, ওদের কৃপা করে সে।

এ পাড়ায় যারা চাকরের কাজ করছে তারাও একসময় তারই মতো ছিল। তারা এখন বদলে যাচ্ছে। গ্রামে থাকতে যে মূল্য-বোধটি ছিল তা এখানে এসে খোয়াচ্ছে। তাই এদের সংসর্গ থেকে রঘু দূরে থাকতে চায়। ওদের দেখলে সে মনের মধ্যে প্রচণ্ড বেদনা অনুভব করে। সততা, নিষ্ঠা ও কঠিন পরিশ্রম সে এখনো করছে, গ্রামে থাকতে যা করতো। শুধু সময়ের জন্যেই সে অপেক্ষা করে আছে।

তার সততার মূল্য অবশ্য সে এখানে পাচ্ছে না। কোনো-কোনো-দিন মহাজন গিন্নীর মেজাজ ভালো থাকলে ভিক্ষার অনুগ্রহের মতো দু-চারখানা রুটি বেশি পাওয়া যায় কিংবা একটুকরো করুণার হাসি। ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে অধিকাংশ দিনই তাকে আধপেটা খেয়ে থাকতে হতো।

একদিন রান্নাঘরের একটি থালা পাওয়া যাচ্ছিল না। চুরির অভিযোগ আনা হলো রঘুর বিরুদ্ধে। মহাজনের স্ত্রী তাকে লাঠিপেটা করলো। মহাজন পুলিসের হাতে তুলে দেবার ভয় দেখালো। থানায় যাবার জন্তে মহাজন প্রস্তুতও হচ্ছিল। এমন সময় ঘরের খাটের তলা থেকে থালাটি পাওয়া গেল। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চুপ হয়ে গেল। কেউ তার কাছে ক্ষমা চাইল না। অবিশ্যি মালিক চাকরের কাছে ক্ষমা চাইবে এটা আশা করাও তার পক্ষে অন্যায়। তাকে কিন্তু সামান্ত অপরাধেও দিনে তিন-চারবার ক্ষমা চাইতে হতো। কারণ সে যে চাকর।

চুরির অপবাদ ও লাঞ্ছনার দিন রঘুর মনটা খুবই খারাপ ছিল। জীবনের প্রতি কেমন একটা বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল। সন্ধ্যার পর সে বাড়ির বাইরে উদাস দৃষ্টি মেলে বসেছিল। আল্লাইয়া সুযোগটা কাজে লাগাতে চাইলো। সে পাশে এসে বসলো। প্রশ্ন করে সব জেনে নিল। আল্লাইয়া তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্তে অন্ধকার গলির অনেক মজার গল্প শোনালো। কিন্তু রঘু সেইসব গল্পের মধ্যে কোন সান্ত্বনা খুঁজে পেল না। আল্লাইয়া তার হাতে গাঁজার কল্কে তুলে দিয়ে বললো একটা টান দিলেই বুক থেকে সব কষ্ট ধোঁয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যাবে। রঘু কল্কেটা ফেরত দিয়ে দিল। এসব কৃত্রিম বেদনা-উপশমের দাওয়াইয়ের তার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু আল্লাইয়ার হাত থেকে রেহাই সে পেল না। রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর, সব কাজ শেষ করে যখন বাড়ির রকে এসে বসলো তখন আল্লাইয়া তার হাত ধরে টেনে তুলে বলল,—চল্, বেড়িয়ে আসি।

আল্লাইয়া তাকে নিয়ে একটা অন্ধকার গলিতে প্রবেশ করলো যেখানে মেয়েরা দেহ বিক্রী করে। রঘু জীবনে এই প্রথম এজাতীয় অন্ধকার গলিতে ঢুকলো। প্রথমে সে বুঝতে পারেনি, আল্লাইয়া তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে। সে শুধু বলেছিল একটা মজার জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে গেলে জীবনের সব জ্বালা যন্ত্রণা মানুষ ভুলে যায়। অনেক প্রশ্ন করেও রঘু জানতে পারেনি পৃথিবীতে এমন দুর্লভ স্থানটি কোথায়।

গলিতে ঢুকে রঘু একটি মেয়েকে দেখতে পেল। একটা কামরার সামনে এসে আল্লাইয়া রঘুকে এক ধাক্কায় ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। নিজে পিছনে দাঁড়িয়ে রইলো। রঘু দেখলো প্রায়ান্ধকার একটি খুপরী, একটি চৌকি পাতা। একটি মেয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। রঘু পিছন ফিরে আল্লাইয়াকে জিজ্ঞেস করলো,—এ সবের মানে কি?

আল্লাইয়া তার হাতে একটা আধুলি গুঁজে দিয়ে বলল,—শালা, মজা কর্।

আল্লাইয়া মুহূর্তেই কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। কামরায় রইলো শুধু দুজন। রঘু আর সেই মেয়েটি।

মেয়েটি একটি চৌকি এগিয়ে দিয়ে বলল,—বসুন।

কিন্তু রঘু বসলো না। সে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। সে যে মেয়েটিকে দেখছিল এমন নয়। এ একরকম দৃষ্টিহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা। আসলে তার মস্তিষ্ক কাজ করছে না।

মেয়েটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো,—কি দেখছেন তখন থেকে। কাজের কথা বলুন।

রঘুর একটা কথা মনে পড়ে গেল। তখনই সে যেন কিছুটা সম্বিৎ ফিরে পেল। মেয়েটিকে সে জিজ্ঞেস করলো,—তোমার বুকে হাত রাখতে পারবো?

প্রশ্ন শুনে মেয়েটি হেসে ফেললো। বলল,—কেন পারবেন না, পয়সা দিলে শুধু বুক কেন, শরীরের প্রতিটি অংশেই হাত রাখতে পারবেন।

মেয়েটি আবার ফিক্ করে হেসে ফেললো। তারপর বললো,—পয়সা দিলে শুধু হাত রাখা নয়, আরো যা-যা চাইবেন…।

রঘু শিউরে উঠলো। আরো কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থেকে সে অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে কামরা থেকে বেরিয়ে এল।

মেয়েটি তাকে অশ্লীল ভাষায় কি যেন বলছিল কিন্তু রঘুর কানে সেসব ঢুকলো না। সে দ্রুত বেরিয়ে এসে দৌড়তে লাগলো।

দৌড়তে দৌড়তে তার মনে হচ্ছিল সুরিয়াপেট থেকেই সে যেন পালাচ্ছে। আর একটা কথাও তার বার বার মনে হচ্ছিল। সুন্দরীর সেই কথাটা। সুন্দরী ছোট জোতদারকে বুকে হাত দিতে দেয়নি। হয়তো গ্রামের মেয়েরা আংশিক হলেও কিছুটা বাঁচাতে চেষ্টা করে। শহরের মেয়েদের সে বালাইটুকুও নেই।

ডেরায় ফিরে সারারাত সে ভাবলো। স্থির করে ফেললো আর সুরিয়াপেট নয়। ভোর ভোরই সে পালাবে। অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে।

নয়

জেলখানার অন্ধকার কুঠরিতে বসে সুরিয়াপেটের শেষদিনের সব ঘটনা যা তাকে পালাতে বাধ্য করেছিল, মনে পড়ে যাওয়ায় রঘুর মুখে বিচিত্র একটি হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

প্রথমে সিরিয়াপুর থেকে সুরিয়াপেট তারপর সুরিয়াপেট থেকে হায়দ্রাবাদে পালিয়ে এলো। এখানে এসে সে হলো রিক্সাচালক। রিক্সাওয়ালা হবার যোগ্যতা তার ছিল। তার চওড়া বুক, হাতের শক্ত পেশী এবং মজবুত পায়ের পাতা—এইসব গুণের জন্যে রিক্সা ভাড়া পেতে অসুবিধা হয়নি।

প্রথম প্রথম অভিজাত শহরের, বিদ্যুতের আলোয় ঝলমলে রাজপথে রিক্সা চালিয়ে সে খুব আনন্দ পেল। দুবেলা পেট ভরে

খেতে পেয়ে তার মনে হলো, আরাধ্য লক্ষ্যের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে সে। রিক্সার মালিকের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পেয়ে সে অতীতের সব দুঃখ কষ্ট ভুলে গেল।

একটা ঘোরের মধ্যে থাকতে থাকতে সে অনেক কিছুই ভুলে গেল। সবচেয়ে আগে ভুলে গেল সেও একটি মানুষ। তাকে একটি গাড়িতে ঘোড়ার মতো জোতা হয়েছে তা উপলব্ধি করার অনুভূতি সে হারিয়ে ফেললো। হায়দ্রাবাদের এ রাস্তা থেকে ও রাস্তা, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চড়কির মতো ঘুরতে ঘুরতে সে ভুলে গেল এই পৃথিবীতে মানুষ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। একদল রিক্সা চড়ে, আর একদল রিক্সা চালায়। সুরিয়াপেট থেকে এখানে পালিয়ে আসার পিছনে কোনো উদ্দেশ্য কোনো লক্ষ্য ছিল কি না তাও তার মনে নেই। দুখানা কাপড়, দুবেলার খাবার আর কিছু কাঁচা পয়সা তার চোখের সামনে এক রঙীন ধাঁধাঁ সৃষ্টি করলো। যেদিন সে বাবার নামে কুড়িটি টাকা মনি অর্ডার করলো সেদিন তার মনে হলো হায়দ্রাবাদ শহরে তার মতো ভাগ্যবান ব্যক্তি আর একজনও নেই।

একদিন সে বিড়ি ধরালো। বিড়িতে টান দিয়ে বেশ আনন্দ হলো তার। তারপর একদিন সিগারেট খেলো, সেদিন আরো বেশি আনন্দ পেল। যেদিন রুটির সঙ্গে মাংস খায় সেদিন তো আনন্দে তার আকাশ ছুঁতে ইচ্ছে করে। এইভাবে মাস ছয়েক বেশ সুখে কাটিয়ে একদিন সে অসুস্থ হয়ে পড়লো।

ধাপে ধাপে সে যে একটি কঠিন অসুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা সে বুঝতে পারেনি। গোড়ায় গোড়ায় অসুখটা তেমন গুরুতর ছিল না। শুধু রিক্সার প্যাডেলে চাপ দিতে গেলে মাথাটা ঘুরে যেতো এবং বেশ কষ্ট করে টাল সামলাতে হতো। একটু একটু করে খুক-খুক কাশি দেখা দিল। একদিন কাশির সঙ্গে খানিকটা রক্ত পড়লো। তারপর একদিন জ্বর এলো। মাথা তুলতে পারলো না। তারপর এক মাস শয্যাশায়ী।

রিক্সার মালিক তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করলো। কিছু টাকা সে

জমিয়েছিল তাই দিয়েই চিকিৎসা চললো। রিক্সার মালিক রঘুর কাজে খুব খুশি ছিল তাই সে যত্নের ত্রুটি রাখলো না।

একমাস পরে রঘু সুস্থ হয়ে উঠলো কিন্তু শরীর তখনো খুব দুর্বল। ডাক্তার তাকে আরো দু' মাস বিশ্রাম নিতে বলেছিল। কিন্তু দিন-মজুর কাজ না করলে খাবে কি? তাই একদিন সে রিক্সা নিয়ে রাস্তায় বেরোলো।

প্যাডেলে চাপ দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই তার হাঁপ ধরে যায়। কিছুক্ষণ রিক্সা চালাবার পর ঘামে শরীর জবজবে হয়ে যায়। কাশির সঙ্গে আবার রক্ত পড়ে কিন্তু তবু থামবার তার উপায় নেই।

আবার আঁধার তাকে ঘিরে ধরলো।

রিক্সাচালকের জীবনের নানান অভিজ্ঞতা একের পর এক তার মনে পড়ে যায়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে মানুষের এক লম্বা মিছিল যাদের নিয়ে শহরের নানা প্রান্তে সে ঘুরেছে। যে কেরানী ভাড়ার পয়সা নিয়ে ঝগড়া করতো, যে ছাত্র রিক্সা দ্রুত চালাতে বলতো, যে গুণ্ডা রাতের অন্ধকারে ছোরা নিয়ে ঘুরে বেড়াতো, যে প্রেমিক সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে রিক্সার হুড তুলে পর্দা ফেলে দিয়ে প্রেয়সীকে জড়িয়ে ধরতো—এমনি নানান ধরনের যাত্রীদের চরিত্র তার মনে পড়ে যায়।

আরো আছে। রিক্সা চালাতে চালাতে যখন সে কাশতে থাকতো তখন অনেক যাত্রী খারাপ রোগের আশঙ্কা করে তাকে গাল মন্দ করতে করতে নেমে যেতো। অনেকটা পথ রিক্সায় চাপার মূল্যটুকু না দিয়েই অন্য রিক্সায় গিয়ে উঠতো। ন্যূনতম সৌজন্যবোধ থাকলে এভাবে পারিশ্রমিক না দিয়েও গাল মন্দ করা যায় না।

শহরের মানুষদের মধ্যে সৌজন্যবোধের ও বিবেচনার বড়ই অভাব। মৌলভী সাহেব তার রিক্সাকে মনে করতেন রিজার্ভ গাড়ি। রিক্সায় উঠে তিনি নানান জায়গায় নামতেন, কাজ সারতেন তারপর গন্তব্যস্থানে যেতেন। ব্যবসায়ীরা তার রিক্সাকে মাল গাড়ির মতো ব্যবহার করতো আর মহিলাদের কাছে তার রিক্সা ছিল বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণের

প্রতিষ্ঠান।

রিক্সা চালাতে চালাতে এমনি অনেক মজার অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। গ্রামে থাকতে শুধু দুঃখের সঙ্গেই পরিচয় ছিল তার। শহরে এসে দুঃখের সঙ্গে মজার অভিজ্ঞতা হলো। অন্যকে ব্যঙ্গ করা এবং নিজেকে নিয়েও ঠাট্টা করা শিখলো।

এবার সওয়ারির মিছিলের মধ্য থেকে একটি বিশেষ মুখ রঘুর চোখে ভেসে উঠলো। মিছিলে হারিয়ে যাবার নয়, এমন একটি মুখ। তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনটি ছিল অন্যদিনের চাইতে স্বতন্ত্র। তাঁর হাতে ছিল দুখানা বই। তিনি যখন রিক্সাওয়ালা বলে ডাকলেন তখনই রঘু চমকে উঠেছিল। এমন হার্দ্য কণ্ঠস্বর সে আগে কোনোদিন শোনেনি। সেই স্বরে ছিল মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা। তিনি কোথায় যাবেন, কত ভাড়া দেবেন বললেন। সঠিক যা ভাড়া তাই তিনি বললেন। দরাদরি বা কথাকাটাকাটির কোনো প্রয়োজনই হলো না।

পথে তিনি একটি কথাও বললেন না, ফলে রঘুকেও রিক্সা চালাতে চালাতে কথা বলার ঝক্কি পোয়াতে হলো না। অধিকাংশ যাত্রীই আজেবাজে প্রশ্ন করে, অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে থাকে। এরা বোঝে না রিক্সাচালকের শ্বাসপ্রশ্বাসের ওপর যে চাপ পড়ে তার ওপর কথা বলতে গেলে তার কষ্ট হয়। এদিক থেকেও ইনি বিবেকবান।

অর্ধেক রাস্তা অতিক্রান্ত হবার পর জিয়াই রোডের মোড়ে এসে ভদ্রলোক প্রথম কথা বললেন। সেই হার্দ্য সুরে বললেন,—এবার আমাদের আখড়ার রোড হয়ে যেতে হবে।

দূরের পথ। অনেকক্ষণ রিক্সা চালানো হয়েছে। রঘুর শ্বাসের কষ্টটা বাড়তে লাগলো। কাশি শুরু হয়ে গেলো। বুকের ব্যথা বাড়লো।

যাত্রী কোমল স্বরে বললেন,—রিক্সাওলা তোমার গাড়ি থামাও।

রঘু অনুনয়ের সুরে বললো,—স্যার, আপনাকে আমি ঠিক পৌঁছে দেব। আমার কিছু হয়নি স্যার।

যাত্রীর কণ্ঠস্বর হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠলো। আদেশের সুরে বললেন,—থামাও। অগত্যা রঘু রিক্সা থামালো। রঘু ভেবেই নিল এ লোকটিও পয়সা দেবে না, কিছু গালাগালি দিয়ে কেটে পড়বে। কিন্তু তার হিসেব মিলল না। ভদ্রলোক রিক্সা থেকে নেমে বললেন,—এই গলিটায় আমি তোমার পাশাপাশি হাঁটছি, তুমি রিক্সাটা টেনে নিয়ে এসো। গলি পেরিয়ে আবার উঠবো।

রঘুর মন থেকে ধন্দ কাটতে চায় না। কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয় যথার্থই ভদ্রলোক। কিন্তু তার উদ্দেশ্য যে কী তা বুঝতে পারে না। ভয়ে ভয়ে সে যাত্রীর চোখের দিকে তাকায়। কিছু বোঝার চেষ্টা করে। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে রঘু অবাক হয়ে যায়। ছিপছিপে লম্বা মানুষটি, গায়ের রঙ ময়লা, আর দুটি বড় বড় চোখ। সেই চোখে সহানুভূতির সহৃদয় দৃষ্টি।

হাঁটতে হাঁটতে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন,—তোমার এই কাশিটা কতদিনের ?

—এক মাস স্যার।

—কোথায় থাকো ?

—গোবিন্দরাম বস্তিতে।

—তুমি কি রিক্সাচালকদের ইউনিয়নের মেম্বার।

—ইউনিয়ন কি আমি জানি না, স্যার।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পাশাপাশি হাঁটতে লাগলেন। তারপর একসময় রঘুর কাঁধে হাত রেখে বললেন,—এই শহরে তোমার মতো আরো অনেক রিক্সাচালক রয়েছে, সবারই দুঃখ কষ্ট সমস্যা প্রায় এক। আর এগুলি দূর করার পথও একটাই। তাই রিক্সাচালকেরা একটা সমিতি গঠন করেছে। এখানে তারা নিজেদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করে, কি ভাবে ভালোভাবে বাঁচা যায় তাই নিয়ে আলোচনা করে। আমি সেই ইউনিয়নের কথাই বলছিলাম।

রঘুর মনে এবার রীতিমতো সন্দেহ দানা বেঁধে উঠলো। সুরিয়া-পেটের ডাকাতদের আড্ডা তার চোখে ভেসে উঠলো। তারাও এক

জায়গায় মিলিত হয়ে নিজেদের ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করতো। ভালো থাকার নানাবিধ পথের কথা চিন্তা করতো। সেই আড্ডা সম্পর্কে তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে আর কোনো আড্ডা নয়।

রঘু ভদ্রলোকের হাতটি কাঁধ থেকে সরিয়ে দিয়ে রুক্ষস্বরে বলল,—না না আমি কোনো আড্ডার মেম্বার নই, মেম্বার হতেও চাই না।

ভদ্রলোক এই প্রসঙ্গে আর একটিও কথা বললেন না। অনেকক্ষণ চুপচাপ হাঁটার পর ভদ্রলোক আলাপের ভঙ্গিতে রঘুকে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলেন। যেমন নাম কি, দেশ কোথায়, কি ভাবে এই পেশায় এলো ইত্যাদি। এইসব প্রশ্নের মধ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

ভদ্রলোক এরপর রঘুকে বোঝাগেল রিক্সা চালাবার সময়ে কিভাবে ওঠানামা করলে শ্বাস প্রশ্বাসের ওপর চাপ কম পড়ে। আলোচনা প্রসঙ্গে ভদ্রলোক উল্লেখ করলেন কি ভাবে মালিকরা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের বিনিময়ে রিক্সাচালকদের শোষণ করে।

রঘু অবাক হয়ে ভাবলো এই মানুষটি রিক্সাচালকদের জীবনের এত কথা জানলো কি করে? কথাগুলি খুবই বাস্তব, তার অভিজ্ঞতার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। ভদ্রলোকের কথা শুনতে রঘু বেশ আগ্রহ বোধ করছিল। কখন যে অনেকটা পথ অতিক্রম করে এসেছে সে খেয়ালই তার ছিল না।

একসময় ভদ্রলোক জানালেন তিনি তার বাসার সামনে এসে গিয়েছেন। ভদ্রলোক যা ভাড়া স্থির হয়েছিল সেই ভাড়াই দিলেন উপরন্তু রঘুকে তাঁর বাড়িতে চা খেয়ে যাবার আহ্বান জানালেন।

রঘু লজ্জা পেল। বলল,—না স্যার, আমি এখন যাই।

—আরে লজ্জা পাচ্ছো কেন? আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে তা ছাড়া অনেক পরিশ্রম হয়েছে তোমার। এক কাপ চা খেলে দেখবে বেশ চাঙ্গা হয়ে যাবে।

ভদ্রলোক রঘুর হাত ধরে একরকম জোর করেই তাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলেন।

সুন্দরভাবে সাজানো-গোছানো দুটি ঘরের ছোট্ট বাসা। যে ঘরটিতে রঘু এসে বসেছে সেটি ছাড়াও ভেতরে আরেকখানি ঘর। মাঝখানের দরজায় রঙীন ছাপা পর্দা ঝোলানো। বাইরের ঘরে তিনখানা চেয়ার ও একটি সোফা। দেয়ালের গায়ে আলমারীতে থরে থরে সাজানো বই।

রঘু ক্রমশঃই এক আশ্চর্য জগতের মধ্যে প্রবেশ করছে। বিস্ময়ভরা চোখে সে শুধু দেখে যাচ্ছিল। একটু পরে ভিতরের ঘর থেকে পর্দা সরিয়ে এক সুশ্রী মহিলা বেরিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে একটি সুন্দর ছোট মেয়ে। মেয়েটি ছুটে এসে ভদ্রলোকের গাঁ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রঘুকে দেখতে লাগলো।

ভদ্রলোকের মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠলো। রঘুর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, আমার নাম মকবুল, ইনি আমার স্ত্রী সুরাইয়া আর এটি আমাদের মেয়ে আমিনা।

মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে মকবুল বললেন,—ইনি কমরেড রঘু, ওঁকে সেলাম জানাও মা, আর ওকে একটু আদরও করে দাও।

আমিনা বাবার কোল থেকে নেমে এসে রঘুর কাছে এগিয়ে এল। রঘুর প্রত্যাশা আজ তার কল্পনার চাওয়াকে ছাড়িয়ে গেছে। অভিভূত রঘু দুহাত বাড়িয়ে আমিনাকে কোলে তুলে নেয়।

আমিনা রঘুর কোলে উঠে তার ছোট্ট সুন্দর দুখানি হাত তুলে বলল,—কমরেড, লাল সেলাম।

রঘু বিমূঢ়ের মতো একবার মকবুলের দিকে একবার সুরাইয়ার দিকে তাকাল, তার যে কি বলা উচিত সে বুঝতে পারছিল না।

এদের সকলের চোখেই ভালোবাসা আর সহানুভূতির আলো। একজন রিক্সাচালককে এমন অকৃত্রিম ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের হাত কেউ বাড়িয়ে দিতে পারে কোনদিন ভাবেনি সে। আর 'লাল সেলাম' এই শব্দ দুটির কী যে অর্থ সে বুঝতে পারছিল না। কিন্তু ওদের সরল হাসি, শান্ত কণ্ঠস্বর শুনে এটুকু বুঝতে পারছিল এর মানে আর যাই হোক, খারাপ কিছু নয়। কথাবিদ্ধের মতো

টেনে টেনে তাই সে বলল,—লা-ল-সে-লা-ম।

রঘুর লাল সেলাম বলার ভঙ্গি দেখে আমিনা খিলখিল করে হেসে উঠলো। মকবুলের স্ত্রীর মুখেও প্রসন্ন হাসি আর মকবুলের মুচকি হাসিতে সাফল্যের আভাস।

মকবুল স্ত্রীর দিকে ফিরে বলল,—কমরেড কিন্তু আজ আমাদের এখানেই খাবে।

সুরাইয়া বলল, —নিশ্চয়।

রঘু অবাক চোখে মকবুলের দিকে তাকিয়ে রইলো, কিন্তু কোন কথা সে বলে উঠতে পারল না।

মেঝেতে মাদুর পেতে খাওয়ার বন্দোবস্ত হলো। মকবুল আর রঘুর মাঝে বসলো আমিনা। চীনামাটির প্লেটে করে রুটি আর মাংস পরিবেশন করছিল সুরাইয়া। সুরাইয়া যখন তার পাতেই ভালো মাংসগুলো তুলে দিচ্ছিল তখন অজানা এক অনুভূতিতে তার মন ভরে উঠলো। রুটি মাংস সে শহরে এসে খেয়েছে কিন্তু প্রীতির পরশ মাখানো পরিবেশনায় খাওয়ার আনন্দ যে কী তা সে আজই প্রথম জানতে পারলো।

আমিনাকে তার বাবা খাইয়ে দিচ্ছিল। রঘুর ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায়। তখন তার বাবাও তাকে খাইয়ে দিত। এত কাছে থেকে কোন শিশুকে রঘু আগে দেখেনি। প্লেটের ওপর আমিনা যখন তার ছোট ছোট আঙুলগুলো নাড়াচড়া করছিল রঘু তখন অবাক হয়ে দেখছিলো।

সুখাদ্য, সুপরিবেশ তা সত্বেও রঘু খাওয়ার আনন্দে সম্পূর্ণ ডুবে যেতে পারেনি। দুটি শব্দ তার মনে বেশ অশান্তি সৃষ্টি করে চলেছিল। শব্দ দুটির অর্থোদ্ধার না করা পর্যন্ত সে শান্তি পাচ্ছে না অনেকবারই তার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হচ্ছিল, 'লাল সেলাম' ও 'কমরেড' কথার মানে কি? একজন রিক্সাওলার প্রতি তাদের এই প্রীতি ও আন্তরিকতার কারণটাই বা কি? কিন্তু প্রশ্ন দুটি সে করে উঠতে পারল না।

খাওয়া শেষ হলে সুরাইয়া মাদুরটি তুলে নিল। একটু পরে রঘু ও মকবুলের হাতে এক কাপ করে গরম কফি তুলে দিল। কফি খেতে খেতে রঘু মকবুলের দিকে তাকাল, সেই প্রশ্ন দুটি করবে কিনা ভাবছিল। কিন্তু মকবুল তাকে সে সুযোগ দিল না।

—রঘু, যতদিন পর্যন্ত তোমার কাশির অসুখটা ভাল না হচ্ছে ততদিন রাত্তিরে তুমি রিক্সা চালাতে পারবে না।

রঘুর মুখের কথা আজ কে যেন কেড়ে নিয়েছে। তাই সে নীরবে মকবুলের দিকে তাকিয়ে রইল।

—আমাদের সমিতির নিজস্ব ডাক্তার আছে। তুমি সেখানে চিকিৎসা করাত পারবে। পয়সা লাগবে না।

রঘু আগের মতোই নীরব।

—ঠাণ্ডার মধ্যে আজ আর তোমার বস্তিতে গিয়ে কাজ নেই। আজকের রাতটা এখানেই শুয়ে থাকো।

—কমরেড মানে কি?—অনেকক্ষণ চেষ্টার পর রঘু প্রশ্নটা করে উঠতে পারলো।

মকবুল কিন্তু প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সুরাইয়াকে ডেকে বলল, কমরেড আজ এখানেই শোবে।

সুরাইয়া মেঝেতে পাশাপাশি দুটি বিছানা পেতে দিল। দুটি কম্বলও রেখে গেল। দুজনেই বিছানায় এসে বসলো। পায়ের ওপর কম্বল টেনে নিল। মকবুল উঠে গিয়ে শেল্‌ফ থেকে একখানা বই নিয়ে এল। চশমা পরে নিয়ে মকবুল বই পড়তে লাগলো। মকবুলের অনুরোধ সত্বেও রঘু কিন্তু শুতে পারলো না। বসে বসে সে মকবুলের নিবিষ্ট মনে পাঠরত রূপ দেখতে থাকল। বেশ খানিকটা পরে মকবুল চশমা খুলে বইখানি রঘুর পাশে রাখলো। রঘু আগেও বই দেখেছে, অন্যকে পড়তে দেখেছে কিন্তু বই স্পর্শ করার সুযোগ হয়নি তার কোনদিন। আজ তাই সে কৌতূহল দমন করতে পারল না। সে বই খুলে অক্ষরগুলির ওপর হাত বোলাতে লাগলো। রঘুর মনে পড়ে গেল ছোটবেলার খেলার

সেই স্মৃতি। রেশমের কাপড়ের ওপর হাত বুলিয়ে সেদিন তার যে আরাম হয়েছিল আজও তার সেই অনুভূতি হলো। অনেকক্ষণ সে বইয়ের অক্ষরের ওপর হাত বোলালো এবং প্রতি মুহূর্তেই প্রীতির পরশে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো সে।

মকবুল প্রসন্ন দৃষ্টি দিয়ে রঘুর দিকে তাকিয়েছিল। মকবুল তারপর বইয়ের একটি পাতা ওল্টালো। রঘু দেখলো পাতা জুড়ে একটি ছবি।

—এই যে ছবিটি দেখছো, এটি পৃথিবীর ছবি। একে বলে ম্যাপ। মানচিত্র।

মকবুল মানচিত্রের এক জায়গায় হাত রেখে বলল,—এই হচ্ছে আমাদের দেশ, ভারতবর্ষের মানচিত্র।

মানচিত্রের আর এক জায়গায় আঙুল রেখে মকবুল বলল,—এই হচ্ছে আর একটি মহান দেশ। আমাদের দেশের মতো এখানেও এক-সময় কৃষক-শ্রমিক নির্যাতিত হতো।

একসময় তারা আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো।

দশ

রাতের পর রাত আসে
রাতের পর রাত চলে যায়
একটি রাত থেকে যায়

কমরেড মকবুলের গৃহে রাত্রি যাপনের স্মৃতি ভোলবার নয়। কয়েকটি অমর মুহূর্তের গাঁথা মেলা যেন সেই রাত্রি। নববসন্তের আলো একদিন তার চোখে লেগেছিল। সুন্দরীর শরীরের ভ্রাণে ভালোবাসার আস্বাদ পেয়েছিল সে। মকবুলের গৃহে ভালোবাসার আর এক রূপের সন্ধান পেল সে। বৃহত্তর, মহত্তর সে ভালোবাসা। আজন্ম লালিত ধ্যান ধারণা পাল্টে যায় তার, মনের মধ্যে প্রত্যয়ের বীজ বোনা হয়ে যায়।

একদিন মাথা উঁচু করে জোতদারের প্রাসাদ দেখতে চেয়েছিল

সে। বাবা বলেছিল, বোকা ছেলে, মাথা উঁচু করিস না, পায়ের দিকে তাকিয়ে থাক, বাবু রাগ করবেন। সেই থেকে মাথা নিচু করেই তার দিন কেটেছে। এখন সে বুঝতে পারছে মজুরদের সমবেত শক্তির কাছে জগন্নাথ রেড্ডির চেয়েও বড়ো বড়ো প্রাসাদ মাথা নোয়াতে বাধ্য।

মকবুল বলছে, সে শুনছে। মকবুলের মুখ থেকে বেরিয়ে এক একটি শব্দ ব্যাধের তীরের মতো তার বুকে গেঁথে যাচ্ছে। রোমাঞ্চিত উত্তাল উচ্চারণ মকবুলের।

রঘুর চোখের সামনে থেকে রাশি রাশি অন্ধকার কেটে যায়। রাস্তা খুঁজে পায় সে। জীবনের অর্থ খুঁজে পায় সে। এতদিন যেখানে ছিল অন্ধকার সেখানে এখন আলোর প্লাবন। যে পৃথিবী ছিল চোরাবালিতে ভরা আজ তা শক্ত মাটিতে পরিণত। সেই শক্ত মাটির ওপর পা রেখে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো সে। মনে মনে বলল,—আমি যৌবনের প্রতীক এবং যা কিছু শুনছি তা যৌবনেরই জয়গান।

আজ আর ঠিক মনে নেই সে রাতে কতক্ষণ জেগেছিল আর কখনই বা ঘুমিয়ে পড়েছিল। মনে পড়ছে গভীর রাতে একবার তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। টের পেয়েছিল সুরাইয়া সরে যাওয়া কম্বলটা তার পায়ের ওপর টেনে দিয়েছিল। কম্বল টানতে গিয়ে গিয়ে সুরাইয়ার আঙুল তার পায়ে লেগে গিয়েছিল। সে এক নতুন অনুভূতি। এই অনুভূতির সঙ্গে তার আগে পরিচয় ছিল না। তাই সে নিজের মনকে বুঝে উঠতে পারেনি। তার চোখ দুটি হঠাৎ-ই জলে ভরে গিয়েছিল। চোখের জলের ঝাপসা দৃষ্টিতে সে দেখেছিল সুরাইয়া মকবুলের পায়ের কম্বল ঠিক করে দিচ্ছে। তারপর একসময় ধীর পায়ে পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল।

চোখের জল সেদিন বাধা মানেনি। বাঁধভাঙা চোখের জল সে মুছে ফেলতেও চায়নি। এ অশ্রু তো বেদনার নয়, এ যে তৃপ্তির উৎস থেকে উৎসারিত। তাই চোখের জল নিয়েই সে ঘুমিয়েছিল।

নিজের ঘরেই ঘুমিয়েছিল সেদিন।

নিষাদ একটি মুদ্রা রঘুর চোখের আলোয় ভেসে ওঠে। একটি সুখের স্মৃতি তার মন ভরিয়ে দেয়।

সেই রাত

সেই ঘর

তার আপনজন

কমরেড

মকবুল

লাল সেলাম।

মন্ত্রের মতো মনের মধ্যে উচ্চারিত হতে থাকে। অন্ধকার কুঠরির নৈঃশব্দের মাঝে নিবিড়ভাবে স্মৃতিগুলোকে আঁকড়ে ধরে বুকের মাঝে। তারপর চেতনার গভীরে চলে যায় সে।

হঠাৎ একটা বিশ্রী শব্দে ধ্যান ভেঙে যায় তার। সেলের দরজা খোলার কর্কশ শব্দ। সিপাইদের ভারী জুতোর ছন্দহীন শব্দ।

জেলের সুপারিনটেনডেন্ট ঘরে ঢুকলেন। তাঁর পিছনে দুজন সিপাই। সিপাইরা এগিয়ে এসে তার হাত দুটো শিকল থেকে মুক্ত করে দিল। পায়ের বেড়িও খুলে দেওয়া হলো। তাকে উঠে দাঁড়াতে বলা হলো।

রঘু দাঁড়াবার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। শিরায় টান লেগে যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলো সে। লোহার বেড়ির ঘষায় ঘষায় পায়ে ঘা হয়ে গিয়েছে। পায়ের ঘাটা ব্যথায় টনটন করে ওঠে। তবু মনের জোরে সে উঠে দাঁড়ায়।

কারাধ্যক্ষ পকেট থেকে একটি কাগজ বের করলেন। রাশভারী, দাম্ভিক, দোর্দণ্ডপ্রতাপ অফিসারের হাত কাঁপছিল। রঘু দেখলো কাগজের লেখা পড়তে পড়তে তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। মুখখানা অসম্ভব শুকনো দেখাচ্ছে।

রঘুকে জানানো হলো তার আপীল অগ্রাহ্য হয়েছে এবং মৃত্যু-দণ্ডাদেশ বহাল রয়েছে। কাল ভোর ছটায় মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করা হবে।

কারাধ্যক্ষ রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে বললেন,—তোমার যদি কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে বলো, আমরা চেষ্টা করবো তা পূরণ করতে।

রঘু মুখে কিছু বলল না, শুধুই হাসলো।

কারাধ্যক্ষ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন রঘুর দিকে। কাল সকালে যার জীবন শেষ করে দেওয়া হবে তার মুখে এতটুকু ভয়ের চিহ্ন নেই। এ অভিজ্ঞতা তার নতুন। সুদীর্ঘ তিরিশ বছরের চাকরি জীবনে অনেক ফাঁসির আসামী সে দেখেছে তাদের সঙ্গে এ আসামীর কোনো-দিক থেকেই মিল নেই। অনেক দুর্ধর্ষকে ডাকাতকে দেখেছে তারা ফাঁসির হুকুম শোনামাত্র জজসাহেবকে গালাগালি দিতে শুরু করতো।

কোনো কোনো কয়েদী কাঁদতে শুরু করতো। অনেকের কাপড়-চোপড় নষ্ট হয়ে যেতো। কেউ কেউ পাগলের মতো আরচণ করতো। কারো কারো মধ্যে আবার ঈশ্বরভক্তি প্রকাশ পেতো। হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে পাথরের মূর্তির মতো অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো আর দু'-চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তো।

মৃত্যু এত কাছে জেনেও কেউ স্বাভাবিক ভাবে হাসতে পারে, এই প্রথমে দেখলেন তিনি। তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি প্রয়োগ করে কয়েদীর মনস্তত্ব বোঝার চেষ্টা করলেন।

কী বুঝলেন তিনি? কিছুই না। তাঁর সে দেখার চোখই নেই। চাকরি জীবনে তিনি শুধু দুষ্কৃতকারীদেরই দেখেছেন। মানুষের চেহারা দেখেননি। কিছুটা বিস্ময়ে, কিছুটা আবেগে তিনি মাথা নিচু করে চলে গেলেন।

কারাধ্যক্ষ চলে যাবার পরেও সিপাই দুজন দাঁড়িয়ে রইল। তাদের চোখেও জিজ্ঞাসা। একজন আরেকজনের চোখের দিকে তাকায়। ভাবখানা এই,—তুমি কিছু বুঝলে?

এদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ যে, সে এগিয়ে এসে বলল,—ভাই,

আমাদের ওপর নির্দেশ আছে তোমাকে বেঁধে রাখার। কিন্তু আমরা তা করব না। তুমি সেলের মধ্যে হাঁটাচলা করতে পারো।

রঘু বলল,—তোমাদের চাকরির যদি ক্ষতি হয়, তবে যা নির্দেশ আছে তাই করো।

সিপাই দুজন সমস্বরে বলল,—না ভাই, আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। দেখলে না বড় সাহেবের চোখে জল।

রঘু চুপ করে রইল।

বয়োজ্যেষ্ঠ সিপাই জিজ্ঞেস করলো,—ভাই, তোমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে কি? এই ধরো মিষ্টি কিংবা শরবৎ। ইচ্ছে করলে আমাদের বলো, আমরা এনে দেব।

রঘু স্মিত হেসে বলল,—আমার কিছু চাই না ভাই। তোমাদের অনেক ধন্যবাদ। আমি শুধু জানতে চাই এখন কটা বাজে।

একজন সিপাই বাইরের ঘড়ি দেখে এসে জানাল,—এখন ঠিক পাঁচটা তার মানে এখনো পুরো একটি রাত।

রঘু অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

সিপাইরা মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল।

তারপর সেলের দরজা বন্ধ করার শব্দ হলো। আরো কিছু কানফাটানো ধাতব শব্দ। তারপরেই সেই নিঃঝুম নিস্তব্ধতা।

বারো

ছিটেফোঁটা স্বাধীনতা যা শেষমুহূর্তে তাকে দেওয়া হয়েছে, রঘু তার সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করলো। দু পায়ে দগদগে ঘা, হাঁটতে কষ্ট হয়, তবু অনেকদিন হাঁটেনি তাই সে ব্যথা বেদনা অগ্রাহ্য করে হাঁটতে লাগলো।

তার হাতের মাপের চার হাত লম্বা, দু হাত চওড়া ঘর। ঘর ঠিক না, কুঠরি, জেলের ভাষায় সেল্। গুটিয়ে শুয়ে থাকতে হয়।

এই ক্ষুদ্র পরিসরেই তবু হাঁটতে ভালো লাগে। কয়েক কদম হাঁটার পর আবার ঘুরতে হয়। এই নিয়মেই সে কিছুক্ষণ হাঁটলো।

অনেকদিন পর সে নিজের শরীরের দিকে তাকালো। হাত-পা-নাক-মুখ সব স্পর্শ করে দেখলো। হ্যাঁ, ঠিক আছে। সব কিছুই আগের মতো আছে। সম্পূর্ণ সুস্থ। শরীরে উত্তাপ আছে, বেঁচে আছে সে। শ্বাস নিতে পারছে, চলাফেরা করতে পারছে।

কাল সকালে শরীরের এই উত্তাপ, এই চিন্তাভাবনা, কথা বলা, হাতের শক্তি, বুকের সাহস—তার সবকিছু স্তব্ধ হয়ে যাবে।

কিন্তু কেন ?

মৃত্যুকে ভয় নেই তার। মৃত্যুই জীবনের শেষ কথা। কিন্তু তার আগে জন্ম তারপর একটু একটু করে বেড়ে ওঠা। কিছু স্বপ্ন, কিছু আশ্বাস, নতুন জীবনের কিছু স্বাদ। অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া। তার আগে পৃথিবীতে কিছু স্বাক্ষর রেখে যাওয়া। তারপর বিলীন হয়ে যাওয়া।

এসব সে জানে। মৃত্যু কিছু নতুন কথা নয়।

কিন্তু কাল ভোরে কেন তাকে মরতে হবে ?

সে তো বুড়ো হয়নি,

তার তো আয়ুর মেয়াদ ফুরোয়নি,

এ কৃত্রিম মৃত্যুর আয়োজন তবে কেন ?

নিজের হাত দুটির দিকে তাকিয়ে সে ভাবতে থাকে। এই হাত দিয়ে সে বীজ বপন করবে, ফসল ফলাবে। ফুলের গাছ রোপন করবে, ফুল ফুটতে দেখবে। পৃথিবীকে কিছু দিয়ে যাবার মতো তার মন আছে, শক্তি আছে, স্বপ্ন আছে।

কিন্তু ওই কাগজে কি লেখা ছিল সে জানে না।

তাকে শোনানো হয়েছিল, কাল ভোরেই সব কিছু স্তব্ধ করে দেওয়া হবে।

সব স্বপ্ন।

জীবনের সব অঙ্গীকার।

স্যাঁতসেঁতে মেঝের ওপর বসে রঘু আরেকবার পিছন ফিরে তাকায়।

মকবুল তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিল।

এবং দুরারোগ্য অসুখ দেখা দিতে পারে এই আশংকায় তার রিক্সা চালানো বন্ধ করে দিয়েছিল। কাগজের মিলে তার চাকরি করে দিয়েছিল।

মিলের চাকরি করার সময়ে সে ভারতের বড়ো বড়ো শহরের কোটিপতি থেকে গ্রামের জোতদার পর্যন্ত নানান চরিত্রের লোকদের দেখেছে। মকবুলের শিক্ষায় স্বচ্ছ দৃষ্টিতে সে তাদের দেখেছে। বুঝতে পেরেছে এরা বিষাক্ত ঘায়ের মতো সমাজের প্রতিটি স্তরে এদের শেকড় ছড়িয়ে দিয়েছে। দেখেছে মানুষের নতুন পদক্ষেপ-গুলোকে এরা কিভাবে গুঁড়িয়ে দেয়। দেখেছে মানুষের নতুন মূল্য-বোধকে নষ্ট করার জন্যে এরা পুরনো মূল্যবোধকে কিভাবে লেলিয়ে দেয়। মানুষের সামনে যে সুন্দর পথগুলি আছে তাতে প্রবেশের পথ কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে রুদ্ধ করে দেয়।

মকবুলের কাছে সংগ্রামের গল্প শুনেছে আর মিলে এসে সংগ্রাম করা শিখেছে। মানুষের প্রগতির সাথেও পরিচয় হয়েছে নিবিড়। নিজের চোখেই দেখেছে পুরনো কাঠ-খড়, শুকনো পাতা, বাঁশ কিভাবে কাগজ হয়ে বেরিয়ে আসে। অন্যত্র সে দেখেছে মরিচা পড়া লোহার টুকরোগুলো গলতে গলতে কি ভাবে কৃষকের লাংগল, মানুষের হাতুড়ি গাড়ির চাকা হয়ে বেরিয়ে আসছে।

মানুষের বুদ্ধি, তার সাধনার কথা চিন্তা করে গর্বে তার মাথা উঁচু হয়ে যায়। তার মনে পড়ে যায় এই দেশেরই শতাব্দীর সম্পদ মাটির তলায় চাপা পড়ে আছে। কয়লার আকারে, লোহার আকারে। জীবনের সেই কারিগর অহল্যাদের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করবে।

সঙ্গীদের হাত সে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে। কেননা এই হাত, এই মিলিত হাত শতাব্দীর মাটি চাপা পড়া সম্পদ আহরণ করবে।

এই হাত মানুষের জীবনকে সুন্দরের সন্ধান এনে দেবে, নতুন মাত্রা সংযোগ করবে যার ফলে জীবন অর্থবহ হয়ে উঠবে।

মিলে এসেই সে হাতে হাত মেলাতে পেরেছে। শক্তির সন্ধান পেয়েছে। এ হাত সে কোনোদিন ছেড়ে দেবে না। কারণ এ হাত মুনাফাবাজদের নোংরা হাত নয়। এ হাত মজুরের হাত, যারা নতুন জীবনের রূপকার।

মিলে এক বছরে যা সে শিখেছে, যা সে জেনেছে, যা সে সংগ্রহ করেছে অন্যত্র থাকলে দশ বছরেও তা সে পারতো না।

কি করে সাহসকে সম্বল করে সংগ্রাম করতে হয়, না হারার পণ করে জয়কে ছিনিয়ে নিতে হয়, ধর্মঘটের মাধ্যমে সংগ্রামকে কি করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়—এ সব তার কাছে এখন জলের মতো পরিষ্কার।

গ্রামের মতো এখানেও তাকে মালিকের পোষা গুণ্ডাদের মুখোমুখি হতে হয়েছে। মিল মালিকের গুণ্ডা বাহিনীতে তার গ্রামের মানুষও কিছু আছে। তবে এখানকার গুণ্ডাদের রীতি, নীতি, পদ্ধতি গ্রামের থেকে আলাদা। তার ওপর অনেকবারই হামলা হয়েছে। ছোরা-লাঠির মোকাবিলা করতে হয়েছে বহুবার। মিল থেকে বরখাস্ত হয়ে ছ'মাসের জন্যে জেলেও যেতে হয়েছে।

জেলেই আবার নাগীসুরের সাথে দেখা হয়েছিল তার। গ্রামের সেই গয়লা বন্ধু। তাকে জেলে দেখে রঘু অবাক হয়েছিল। সন্দেহ হয়েছিল তার চোখের ভুল কি না। নাগীসুরই এগিয়ে এসে তার সন্দেহ দূর করে দেয়।

নাগীসুরের কণ্ঠেও নবজীবনের গান।

নাগীসুরই সংবাদ দিল রঘু যে সিরিয়াপুরকে দেখে এসেছে, সিরিয়াপুরের সে চেহারা আর নেই। নতুন যুগের হাওয়া লেগেছে তার গায়ে। জীবন এখন বদলাচ্ছে। শতাব্দীর নির্যাতিত খেত-মজুর, গয়লা, জঙ্গলী, যাযাবর, হরিজন সবাই আজ জেগেছে। তারাও জোট বাঁধতে শিখেছে। জগন্নাথ রেড্ডির কাছ থেকে নিজেদের

উদ্ধারের জন্তে তারা এখন লড়াই করছে। একদিকে প্রতিরোধ, অন্যদিকে গ্রেফতার আর অকথ্য নির্যাতন,—এ এখন প্রতিদিনের ঘটনা। অত্যাচার যত বাড়ছে আগুন তত জ্বলছে। প্রতিরোধের সীমানা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। মজুররা এখন বেপরোয়া। সিংহের তেজ নিয়ে লড়ছে। কাপুরুষরা শুধু মারতেই জানে, ওরা দেখাচ্ছে, ওরা মরতেও জানে। কয়েকটি গ্রামে ওরা জমির দখলও নিয়ে নিয়েছে। বীজ বুনছে। চুরি ডাকাতির জন্যে নয়, অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কারণেই তাকে জেলে আসতে হয়েছে।

ছু'জনেই ছু'জনের হাত বাড়িয়ে দেয়। আবার সেই হাতে হাতে মিলন। মজতুর আর কৃষকের হাত।

রঘুর মনে হয় সে যেন রূপকথার গল্প শুনছে। তৃপ্তিতে, গর্বে রঘুর বুক ভরে যায়। তবু একটা ধন্দ তার কাটতে চায় না। জঙলীরা কি করে এত কম সময়ে এমন সংগ্রামী হয়ে উঠল। ওরা তো আমাদের চাইতেও পিছিয়ে ছিল।

নাগীস্থর বলল, তুমি শুনলে অবাক হবে জঙলীরাই প্রথম সংগ্রামের পথ দেখায়। তারপর আমরা গয়লারা। হরিজনরা তার পরে। গয়লাদের ভাবো কি তোমরা?

নাগীস্থরের মুখে গর্বের দীপ্তি। নাগীস্থর গলা ছেড়ে হাসতে গিয়ে একটা হাত তার মাথায় গিয়ে ঠেকে। যন্ত্রণায় সে কঁকিয়ে ওঠে। মুখ কালিবর্ণ হয়ে যায়।

রঘু জিজ্ঞেস করলো—কি হলো?

নাগীস্থর মাথা মুইয়ে দেখালো। কপাল থেকে তালু পর্যন্ত বিস্তৃত পোড়া দাগ। কেউ চামড়া জ্বালিয়ে দিয়েছে।

রঘুর চোখ স্থির হয়ে গেল। তালুর ওপর একটিও চুল নেই। রঘুর আগেই দেখা উচিত ছিল। কিন্তু হাজার বছরের গোলামীর দেওয়াল ভাঙার গল্প শুনতে শুনতে সে এমনই বিভোর হয়ে গিয়েছিল যে খেয়াল করেনি।

রঘু আঁতকে উঠে জিজ্ঞেস করলো—কি করে হলো?

নাগীস্বর আস্তে আস্তে নির্যাতনের লম্বা কাহিনী বলতে সুরু করলো।

আমাকে গ্রেফতার করে জোতদারের আস্তাবলে নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখা হলো। অক্সদের থেকে আমাকে আলাদা করে রাখা হলো। খাবার থালা সামনে রেখে বলা হলো দলের সবাইর নাম প্রকাশ করলে খেতে দেওয়া হবে এবং ছেড়েও দেওয়া হবে। আমি স্পষ্ট জবাব দিলাম—বলব না। দু'দিন কিছুই খেতে পেলাম না। তারই মধ্যে মারধোর। তারপর ওরা চূড়ান্ত দাওয়াই প্রয়োগ করলো। তাতেও অবশ্য ওরা কথা আদায় করতে পারেনি। ওরা আমার চুল জ্বালিয়ে দিল। গরম লোহা দিয়ে মাথার চামড়া জ্বালিয়ে দিল। পৈশাচিক উল্লাস তখন ওদের চোখে মুখে। উল্লাসে ফেটে পড়ে ওরা বলছিল, —"তোর মাথায় মস্কো রোড বানাচ্ছি ; সেই রোড ধরে তুই স্বর্গে চলে যেতে পারবি, বুঝলি ?" তারপর আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান ফিরলে দেখলাম জেলের হাসপাতালে রয়েছি।

রঘু ও নাগীস্বর দু'জনেই অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না। শেষ পর্যন্ত নাগীস্বরই মুখ খুললো। নিরীহ মুখে প্রশ্ন করলো, —আচ্ছা, মস্কো রোডটা কি ভাই ? তুমি জানো ?

রঘুর চোখে ভেসে উঠলো একটা ছবি। পৃথিবীর ছবি। মানচিত্র। মকবুলের বাড়িতে প্রথম রাতের অভিজ্ঞতা। সেদিন নাগীস্বরের মতো সেও অজ্ঞ ছিল। তারপর মকবুলের কৃপায় অনেক কিছু সে জেনেছে।

রঘু বলল,—মস্কো একটি শহরের নাম।

একটু থেমে সে আবার বলল,—মস্কো একটি চিন্তার নাম।

নাগীস্বর লজ্জা লজ্জা ভাবে বলল,—ভাই, তুমি দেখছি অনেক কিছু শিখেছ, অনেক কিছু জেনেছ। আমি তো ভাই লেখাপড়া শিখিনি তাই তোমার কথা ঠিক বুঝলাম না। আমি জাতে গয়লা, জঙ্গলে জঙ্গলে থাকি। আমি শুধু এইটুকুই বুঝেছি,—আমি, শুধু আমি কেন, আমার বাপ ঠাকুর্দা পর্যন্ত ভাবতে পারেনি 'নিজের জমি' বলে কোনো জিনিস থাকতে পারে। আজ বুঝেছি ওরা বেআইনিভাবে

এতদিন আমাদের জমি ভোগ করেছে, আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। আজ আশা জেগেছে জমি আমরা পাবো, নিজের খাদ্য আমরা নিজেরাই সংগ্রহ করবো জমি চাষ করে। আশা যখন জেগেছে তখন অত্যাচারের ভয়ে সংগ্রামের পথ থেকে সরে আসছি না।

রঘু বলল,—তুমি যে সংগ্রামের কথা বললে, সেই সংগ্রামেরই আর এক নাম মস্কো রোড।

নাগীশ্বর বলল,— যদি তাই-ই হয় তাহলে শুধু মাথায় কেন, আমার গোটা শরীরেই যদি ওরা মস্কো রোড বানায় তবুও আমি আশা ছাড়ছিনা, সংগ্রামের পথ থেকে সরে আসছি না।

রঘু বলল,—ঠিক আছে ভাই, গ্রামেই আবার দেখা হবে। তুমি তো পনেরো দিন পরে আসছই।

তেরো

জেলখানার ফটকে মকবুল ও প্রাক্তন সহকর্মীরা রঘুকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানালো। তাকে ইউনিয়ন অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে খাওয়াদাওয়ার পর রঘুর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা সুরু হলো।

রঘু বলল,—আমি গ্রামে ফিরে গিয়ে কৃষকদের আন্দোলনে যোগ দিতে চাই। মকবুল বললেন—আমারও ইচ্ছে তুমি গ্রামে ফিরে যাও। তোমার মতো নির্ভীক, সর্বস্বত্যাগে প্রস্তুত কর্মীর সেখানে খুব প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় নির্দেশ আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। তার আগে তুমি জেলে থাকাকালীন যা যা ঘটেছে তার একটা ছবি তোমার সামনে তুলে ধরা দরকার।

তেলেঙ্গানা এখন অগ্নিগর্ভ। শহরে বন্দরে কলকারখানায়ও গ্রামের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন এখন দুর্বার হয়ে উঠেছে। সব শ্রেণীর মানুষই এই আন্দোলনের শরিক হয়েছে।

তেলেঙ্গানার দু'হাজার গ্রামের কৃষকেরা জেগে উঠেছে। তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে, শতাব্দীর অত্যাচার, শোষণ তারা বন্ধ করবেই। আর এই আন্দোলন ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য স্বৈরাচারী শক্তি মরীয়া হয়ে উঠেছে। শুধু পুলিশের ওপর নির্ভর করে এই আন্দোলন প্রতিহত করা যাচ্ছে না তাই সেনাবাহিনীকেও নামিয়ে দেওয়া হয়েছে শহরে। গ্রামে পুলিশকে সাহায্য করার জন্যে 'রাজাকার' বাহিনী পাঠানো হয়েছে।

রঘু অবাক হয়ে বলল,—সে কি, জগন্নাথ রেড্ডি তো হিন্দু তার সাহায্যের জন্যে মুসলমান গুণ্ডা বাহিনী? ওরা তো সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের সংগঠন মজলিস-এ-ইত্তেহাদের গুণ্ডা বাহিনী। হিন্দু জোতদার জমিদারের স্বার্থে মুসলমান গুণ্ডাবাহিনী? আমার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হচ্ছে না।

মকবুল বললেন,—ভাই, শোষণ আর শ্রেণীস্বার্থের ব্যাপারে কোনো নীতির বালাই থাকে না। যদি কোনো নীতি থাকে তার নাম সুবিধাবাদ। স্বৈরাচারী যখন হারতে থাকে তখন সাম্প্রদায়িকতা সাময়িক ভাবে স্থগিত থাকে। সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে ওরা এক এক জায়গায়, এক এক রকম ভাবে ব্যবহার করছে। গোটা আন্দোলনটাই নিজামশাহীর স্বৈরাচারী শাসনের ভিত দুর্বল করে দিচ্ছে। জোতদার জমিদাররা নিজামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে সেই কারণেই রাজাকার বাহিনী জগন্নাথ রেড্ডির সাহায্যার্থে পাঠালো। নিজামের সাহায্যপুষ্ট এই রাজাকার বাহিনী মিলিটারী ট্রেনিং প্রাপ্ত এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত।

রঘু বলল,—বুঝলাম।

বিদায়ের আগে তার হাতে মকবুল নির্দিষ্ট কর্মসূচী ধরিয়ে দিলেন। কোথায় উঠতে হবে, কার কার সঙ্গে দেখা করতে হবে, কোথায় কোথায় বিশেষ বার্তা পৌঁছে দিতে হবে—এই সব নির্দেশ। রঘু কর্মসূচীটি বার কয়েক পড়ে নিয়ে মুখস্থ করে কাগজটি ফেরৎ দিয়ে গ্রামের দিকে রওনা হলো।

সুরু হলো তার জীবনের আর এক অধ্যায়।

প্রথমেই সে করিমনগর তালুকের একটি গ্রামের দিকে রওনা হলো। সেখানে এল্লা রেড্‌ডির কাছে তাকে কিছু নির্দেশ পৌঁছে দিতে হবে।

গ্রামে এসে গ্রামের চেহারা দেখে রঘুর চোখে জল এসে গেল। সে গ্রাম আর নেই। নেই তার সবুজ, নেই তার প্রাণ চাঞ্চল্য। গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ভস্মরাশির মধ্যদিয়ে তাকে হেঁটে যেতে হচ্ছে। যে সব গ্রাম অক্ষত আছে সেখানে একটিও জোয়ান ছেলে নেই। গুণ্ডা পুলিশ মিলে শস্য খেতও পুড়িয়ে দিয়েছে। অনেক পোড়া বজরার খেত তার চোখে পড়লো। একদিন সে এমনই খেতে গান গাইতো বীজ বুনতো, শস্য ফলাতো। গ্রামের প্রাণবস্তুরূপ সে কোথাও দেখতে পেল না।

করিমনগরের সিরসিল্লাতে পৌঁছলো সে। এখানেই এল্লা রেড্‌ডির সাথে দেখা করার কথা তার। গ্রামটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত। দাঁড়িয়ে আছে শুধু মাটির দেয়ালগুলো। রঘু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। ঘরের মধ্যে এল্লা রেড্‌ডির লাশ পড়ে আছে। শরীর থেকে মাথা সম্পূর্ণরূপে আলাদা। মাথাটি পড়ে আছে পাশেই। চোখ দুটি খোলা। রঘু অনেকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপর মনে মনে তাকে লাল সেলাম জানিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। দ্রুতপায়ে সেখান থেকে চলে আসে।

এল্লা রেড্‌ডিকে দেবার জন্তে মকবুলের একটি বার্তা সে বয়ে নিয়ে এসেছিল। বার্তা পৌঁছে দেবার আর দরকার হলো না। বার্তার নির্দেশ এল্লা রেড্‌ডি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছে। নিজের প্রাণ দিয়ে সংগ্রামীদের জন্তে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছে।

গ্রাম থেকে বুধন জঙ্গলের কাছাকাছি এসে সে বজরার খেত পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে দেখতে পেল। ছাই মাড়িয়ে আরো কিছুটা এগো-বার পর ভুট্টার খেতের মধ্যে একটি যুবতীর লাশ দেখতে পেল। একটা শিয়াল মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। রঘুর পায়ের শব্দ পেয়ে শিয়ালটা

অনেকগুলো পাথর টপকে একটা টিলার ওপর গিয়ে উঠলো। রঘু লাশটির পা ধরে টানতে টানতে খেতের আলে এনে পাথর সরিয়ে তাকে শুইয়ে দিল তারপর অনেক পাথর সংগ্রহ করে ভালো করে ঢেকে দিল। তারপর জামায় হাত মুছে নিয়ে আবার এগোতে থাকলো। কিন্তু তার গতি এখন শ্লথ হয়ে এসেছে। ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছে। চোখ জ্বালা করছে। সেই হাজত বাস থেকে ভালো ঘুম হয়নি তার। জেল থেকে বেরিয়ে একদিনও বিশ্রাম পায়নি। এর ওপর রয়েছে মনের চাপ। পায়ের তলায় কাঁটা ফুটছে। তৃষ্ণায় সে এতই কাতর যে জলের পরিবর্তে রক্ত পেলেও বোধহয় পান করতে পারে।

বুধন জঙ্গলের ঘন বৃক্ষের ছায়াঘেরা পথ দিয়ে রঘু ধীর পায়ে হাঁটছিল। রাত্রির মতো নৈঃশব্দের পরিবেশ। শুধু কয়েকটি গাছে পাখির ডাক, তার পায়ের শব্দ আর দু'একটা খরগোসের পালানোর সময়ে পাতার খসখস শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই কোথাও। গা ছম ছম করা নিস্তব্ধতা, ঝোপঝাড় সরিয়ে সে চলার পথ তৈরি করে হাঁটছিল। অন্ধকারে তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, আশা করছিল কোথাও একটু আলোর রেখা দেখতে পাবে। সতর্ক হয়ে হাঁটছিল সে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল গাছের ঘন পাতার আড়াল থেকে তাকে কেউ অনুসরণ করে চলেছে। কিম্বা কখনো মনে হয় পিছন থেকে কতকগুলো হাত এসে তার গলা টিপে ধরবে। যেই মনে হলো এই বনে সে সম্পূর্ণ ই একা তখন সে ভয় পেল। সে আরো সতর্ক হলো। অতর্কিতে আক্রমণ এলে কিভাবে আত্মরক্ষা করবে সেই চিন্তা করতে করতে হাঁটতে লাগলো।

অনেকক্ষণ হাঁটার পর আলোর রেখা দেখতে পেল রঘু। টিলার ওপর ঘন ভুট্টার ঝাড়। রঘু টিলার কাছাকাছি পৌছতেই একটি নারীকণ্ঠের কর্কশ কণ্ঠস্বরের আদেশ "দাঁড়াও" শুনে রঘু থমকে দাঁড়াল।

রঘু টিলার দিকে মাথা উঁচু করে তাকাল। দেখলো টিলার ওপর একজন বয়স্কা মহিলা দাঁড়িয়ে। হাতে তার বন্দুক। বন্দুকের নল

তার দিকে তাক করা।

কালো পাথরের মূর্তির মতো কঠিন চেহারা তার। লম্বা গড়ন, মাথার অবিন্যস্ত সাদা চুল। রঘু এক লহমায় তাকে দেখে নিয়ে চিনতে পেরে খুশিতে চেঁচিয়ে বলল,—কাশেম্মা। কাশেম্মা বন্দুকের নল নিচে নামিয়ে চোখের ওপর হাত রেখে লোকটিকে চেনার চেষ্টা করলো।

রঘু এবার জোরে চিৎকার করে বলল,—আমি রঘু···রঘুরায়্যা।

কমরেড মকবুলের সাথী।

কাশেম্মা টিলা থেকে দ্রুত নিচে নামতে সুরু করলো। টিলার কোনো গোপন স্থান থেকে তিনচারজন যুবক বেরিয়ে এসে তাকে সঙ্গ দিল।

কাছাকাছি এসে কাশেম্মা রঘুকে চিনতে পারলো। রঘুর কাঁধে হাত রেখে সে বলল,—বড় রোগা হয়ে গেছিস বাবা। ওপর থেকে দেখে তোকে চিনতেই পারিনি।

রঘু বলল,—জেলে মায়ের আদর কোথায় পাবো?

—কবে ছাড়া পেয়েছিস?

—পরশু।

—মকবুল ভালো আছে তো?

কাশেম্মার কণ্ঠে গভীর মমতার সুর।

রঘুর বিস্ময়ের সীমা থাকে না। এই মহিলা এল্লা রেড্ডির মা, যার লাশ একটু আগে সে করিমনগরের গ্রামে দেখে এসেছে। এ নারী তার স্বাস্থ্যের খবর নিচ্ছে, মকবুলের কুশল সংবাদ জানতে চাইছে অথচ নিজের একমাত্র সন্তান সম্পর্কে কিছুই বলছে না। কৃষকের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তার সন্তান প্রাণ দিয়েছে। আর তিনি কি না রাইফেল হাতে নিয়ে দুর্গ পাহাড়া দিচ্ছেন।

রঘু মনে মনে এই বীরাঙ্গনা মহিলাকে প্রণাম জানালো। শ্রদ্ধার মন নিয়ে উচ্চারণ করলো—'মা'।

রঘু জানতে চাইলো—এ সব ঘটলো কবে?

কাশেম্মা বলল,—অনেকদিন ধরেই চলছে। যেখানেই কৃষক সমিতি জোরদার হয়েছে আর জোতদারদের বর্গার দিতে অস্বীকার করেছে সেখানেই এসব ঘটছে। ওরা আমাদের গ্রাম আক্রমণ করেছে গভীর রাতে। আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। রাতের অন্ধকারে ওরা গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। দিনে আক্রমণ করলে সহজে ওরা পার পেত না। তবে রাতের অন্ধকারে আক্রমণ করায় আমাদের একটাই সুবিধা হয়েছে তা হলো অনেক কৃষক পালিয়ে এসে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে পেরেছিল। তারা এখন আমার সঙ্গেই আছে।

রঘু আবার শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকালো কাশেম্মার মুখের দিকে। এতটুকু ভয়ের চিহ্ন কোথাও নেই। শোকের ছায়াও পড়েনি মুখে। কথা বলার সময়ে এতটুকু গলা কাঁপছে না। অতিরিক্ত মাত্রায় স্বাভাবিক। রঘুর মনে পড়লো একটি পুরনো প্রবাদ। আদর্শ নারীর রূপ আঁকা হয়েছে এই প্রবাদে।

আদর্শ নারী তাকেই বলা হয় যিনি কাজে দাসী, পরামর্শ দানে মন্ত্রী, ভালোবাসায় প্রেমিকা, খাবার আসরে মা, যুদ্ধক্ষেত্রে বীরাঙ্গনা।

রঘু মনে মনে বলল, এতো পুরানো প্রবাদের কথা। কিন্তু এখানকার রিক্তগ্রামে জীর্ণ কুটিরে কাশেম্মার মতো এখনো বাস্তব মায়েরা আছেন যারা প্রবাদ বদলে নতুন নজীর সৃষ্টি করছেন।

কাশেম্মা বলল,—এখন আমাদের কি করণীয় বলো। কৃষকদের অধিকাংশই তো জঙ্গলে লুকিয়ে আছে। আমরা কয়েকজন আছি সংগ্রামের প্রস্তুতি গড়ে তোলার জন্যে।

রঘু বলল,—মকবুল বলেছেন, এখন থেকে বর্গা দেওয়া আমরা বন্ধ করবো এবং জায়গীরদারী করও দেব না। আমার ও আমার সাথীদেরও একই মত। কৃষক সমিতি এখন সরাসরি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করবে। এ সময়ে যারা আত্মগোপন করে থাকবে তাদের সম্পর্কে আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই। যারা প্রতিরোধ করতে পারবে একমাত্র তাদের মধ্যেই জমি বিলি করা হবে।

—আমরা প্রস্তুত। কাশেম্মার পিছন থেকে একজন বলল।

এই লোকটি একজন জঙ্‌লী। সে বলল,—আমাদেরও জমি দিতে হবে। এতে জঙ্গল ও গ্রামের মধ্যে সম্পর্ক ভালো হবে।

রঘু বলল,—নিশ্চয়ই, জঙ্‌লীরাও জমি পাবে।

রঘু অন্যদের শুনিয়ে বলল,—এই অবহেলিত জঙ্‌লীরা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে, নিজেদের অধিকার, নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে কম যুদ্ধ করেনি। জঙ্‌লী সরদার আলুরী সীতারাম রাজুর কথা কোলের বাচ্চাটিও শুনেছে। আজো অনেকে বিশ্বাস করে যে সব জায়গায় গভীর অরণ্য রয়েছে, আলুরী সীতারাম সেখানে জীবিত রয়েছে এবং জঙ্‌লীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

চামার মাদেকা আর খেত মজুর মালা সমস্বরে বলে উঠলো,—ঠিক কথা বলেছে রঘুভাই। একবার যদি জমির দখল পাই তখন দেখবো কোন্ মায়ের ব্যাটার হিম্মত হয় আমাদের জমি ছিনিয়ে নেবার। আচ্ছা ভাই আমরা যারা এতদিন খেত-মজুরী করেছি তারা সবাই জমি পাবো তো?

রঘু বলল,—নিশ্চয়ই পাবে। যারা জমি চাষ করেছে, জমিতে মেহনৎ করেছে, ভবিষ্যতেও করতে চায় তারা সবাই জমি পাবে।

কাশেম্‌মা এতক্ষণ নীরবে সব শুনছিল। এবার সে পিছন ফিরে রমলুকে ডেকে বলল,—যাও সবাইকে গিয়ে খবর দাও আমরা সির-সিল্লায় ফিরে যাবো। সেখানে সকলের মধ্যে জমি বিলি করা হবে।

রমলু চোখের পলকে ছুটতে ছুটতে একটা বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। মাদেকা ও মালাও ওর পিছন পিছন ছুটতে লাগলো।

সবাই চলে গেছে। শুধু কাশেম্‌মা আর রঘু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। পুত্রহারা মায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে অস্বস্তি বোধ করছিল।

রঘু কাশেম্‌মাকে মা বলে ডেকে কথা সুরু করলো। বলল,—মা, আমাকে একটু জল খাওয়াতে পারো! তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ বাবা, নিশ্চয়ই পারবো।

কাশেম্‌মা টিলার পিছন থেকে জল ভরা একটি মাটির কলসি এনে দিল। রঘু কলসির কানায় মুখ রেখে চক্‌ চক্‌ করে আধকলসি জল খেয়ে ফেলল। জল খাওয়া শেষ করে সে বলল,—মা তুমি একা কি এদিকটা সামলাতে পারবে? যদি বলো আজকের রাতটা অন্ততঃ আমি থেকে যাই।

কাশেম্‌মা বলল,—না বাবা, তুই যা, তোর অনেক কাজ। আমরা এদিকটা ঠিক সামলাতে পারবো।

চলতে চলতে রঘু একবার পিছন ফিরে তাকায়। দেখতে পায় কাশেম্‌মা টিলার ওপর বসে। বন্দুকটা দুই হাঁটুর মাঝখানে রেখে উদাস দৃষ্টি মেলে বসে আছে। রঘু আর তাকিয়ে থাকতে পারলো না, তার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো। সে পিছন ফিরলো।

হঠাৎ কাশেম্‌মা চিৎকার করে তাকে ডাকলো।—এই রঘু শোন্।

রঘু ফিরে এলো। কাশেম্‌মার সামনে এসে দাঁড়ালো। কাশেম্‌মা কিন্তু কিছু বলল না। নীরবে সে এদিক ওদিক তাকালো। তার চোখ যেন কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মাথাটি নিচু করে খুব আস্তে আস্তে সে জিজ্ঞেস করলো,—তার চোখ দুটি কি খোলা ছিল?

রঘু মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলো। তার চোখে ভেসে উঠলো একট পোড়াবাড়ি। মেঝে পাথর ছড়ানো। একটি যুবকের মৃতদেহ। শরীর থেকে মাথাটি বিচ্ছিন্ন। দুটি তীক্ষ্ণ চোখ। নিশ্চল চোখে একটি প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে আছে।

রঘু কিছু বলতে পারল না। মাথাটি হেলিয়ে সে শুধু বোঝাতে চাইলো, হ্যাঁ চোখ দুটি তার খোলা ছিল।

কাশেম্‌মা কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারি করলো তারপর বন্দুকটি হাঁটুর ওপর রেখে বসে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে বাঁধভাঙা বন্যার জলের মতো চোখের জল নেবে এল বন্দুকের নলের ওপর।

রঘুর মন চাইল না তাকে এই অবস্থায় রেখে যেতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিজের মনকে সে শক্ত করে নিল। এর অর্থ নয় যে সে একজন

অনুভূতিহীন মানুষ। এমন নয় যে সে ভালোবাসার মর্ম বোঝে না কিম্বা এল্মা রেড্ডিকে সে ভালোবাসতো না। তবু সে ঘুরে আগে পা বাড়ায়।

রঘুর মনে এখন দুটি চিন্তা কাজ করছে। সে ভাবছে মানুষের প্রগতির পথ কতই না দুর্গম। অত্যাচারে অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে চোখের জলের ভিজে পথ ধরে শক্ত পায়ে মানুষ এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছে। কখনো কখনো এক পাও নয়, আধ পা আধ পা করে এগোচ্ছে। তবু এগোচ্ছেই, পিছিয়ে পড়ছে না।

দ্বিতীয়তঃ কাশেম্মা তার কাছে এখন সর্বজনীন মায়ের রূপে আবির্ভূতা। কাশেম্মার তৃষ্ণার্ত মাতৃহৃদয় এখন নতুন অবলম্বন খুঁজে ফিরবেই। তাঁর বক্ষের স্নেহের কক্ষটি এখন অনেক প্রসারিত হবে তাতে আশ্রয় পাবে হাজার হাজার সন্তান। কাশেম্মার এই-ই হবে সান্ত্বনা! তাই সে মাতৃত্বের প্রতি মমতা পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে যায়।

অনেকক্ষণ চলার পর রঘুর মনে নতুন চিন্তা দেখা দেয়। আজ জেলের সেলে বসে সে কথা মনে পড়ে যাওয়ায় তার মুখে সাফল্যের এক টুকরো হাসি জেগে ওঠে। কেন তার মনে নতুন চিন্তার উদয় হয়েছিল এবং কি ভাবে সেই চিন্তাকে রূপায়িত করতে গিয়ে সে তার মনের অনেক দুঃখকে আনন্দে রূপান্তরিত করতে পেরেছিল তার ধারাবাহিক ঘটনা প্রবাহ মনের পর্দায় ভেসে ওঠে।

রঘু গোপন আস্তানায় গিয়ে কৃষক সমিতির সংগঠকদের সাথে দেখা করে। কিছুদিন সে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং নেয়। কি ভাবে আত্মরক্ষা করতে হয়, কি ভাবে গেরিলা পদ্ধতিতে শত্রুদের আক্রমণ করতে হয়—এই সব শিক্ষায় নিজেকে তৈরি করে নিল। তারপর সে পুনর্গঠিত কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শনে গেল অন্যান্য স্বেচ্ছা-সেবকদের সঙ্গে। যে সব গ্রামে ভূমিহীন কৃষক, খেতমজুরদের মধ্যে সমিতি জমি বণ্টন করেছে সেই সব গ্রামের চেহারা দেখে তৃপ্তিতে রঘুর মন ভরে গেল। নিজের চোখে সে দেখলো জমি পেয়ে ভূমিহীন চাষী

খেতমজুরদের কী আনন্দ। স্বাধীনভাবে কাজ করতে পেরে তাদের কী উৎসাহ। গ্রামকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্যে নর্দমা কাটা হচ্ছে। পানীয় জলের জন্যে কুয়ো কাটা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে যখন আক্রমণ আসবে তার মোকাবিলায় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে। আর একটি দৃশ্য তাকে বড়ো আনন্দ দিল। কাল যারা ছিল অত্যাচারী তারা আজ বড় বড় শহরে আশ্রয় নিতে ছুটছে। রঘু দায়িত্ব পেল গ্রামে গ্রামে জমি বন্টনের কাজ।

বিলম গ্রামের চাষীরা রঘুকে আশ্বাস দিল জমি বন্টনের কাজে শুধু তাদের নিজেদের গ্রামেই নয়, অন্যত্রও তারা তাকে সব রকম সহযোগিতা করবে। যে কোনো রকম সাহায্যের জন্যে তারা হাত বাড়িয়ে দিল। এইভাবে যখন যে গ্রামে সে গিয়েছে সবসময় তার পিছনে ছিল জনতার বিরাট মিছিল। এ এক দুরন্ত সমুদ্র দোলা। যৌবনের প্লাবন। যারা এতদিন হিসেব করে পা বাড়াতো আজ তারা বেপরোয়া। দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে তারা। এ এক মহা-শক্তির জাগরণ। মাটিতে তাদের পা, আকাশের দিকে তাদের দৃষ্টি। যে কৃষক নিজের মাটিতেই অবহেলিত ছিল, আজ সেই মাটি তার হাতের মুঠোয়। আকাশ দেখতে আজ আর তার ভয় নেই। অত্যাচারের দুর্গের ইট আজ এক এক করে খসে পড়ছে।

বিলম থেকে পাতিপাড়ু, পাতিপাড়ু থেকে সিরিয়াপুর ; গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জীবনের এক দুর্বার স্রোত বয়ে চলেছে। এ দৃশ্য রঘু জীবনে এই প্রথম দেখলো। তার মনে হলো জেলখানার দেওয়ালের একটি অংশও যেন তার সাফল্যের শরিক হয়ে হাসছে। তার মনে হলো সাগরের ঢেউ যেন জেলখানার দেওয়াল ভেঙে তাকে মুক্ত করে দিয়েছে আর সেই ঢেউয়ের মাথায় তাকে বসিয়ে সিরিয়াপুর নিয়ে যাচ্ছে।

তার আপন দেশ, তার আপনজনের মাঝে।

চোদ্দ

রঘু আবার স্বপ্ন দেখায় বিভোর হয়ে যায়। বিপ্লবের স্বপ্ন। এ স্বপ্ন সে আগেও দেখেছে।

তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে কৃষকদের মিছিল। করিমনগর. পাত্তিপাড়ু, বিলমপল্লী, সিরিয়াপুর আরো শত শত গ্রামের কৃষক। জংলী, যাযাবর, গয়লা, হরিজনদের শ্রেণীবদ্ধ মিছিল। এদের কারো হাতে ঝাণ্ডা, কারো হাতে বাঁশি, কারো হাতে ঢোলক। ঢোলকের গুরু গুরু শব্দ, বাঁশির সুর, স্লোগানের রোমাঞ্চিত উচ্চারণ, উৎসবের উদ্দাম উল্লাস।

মিছিলের মাঝখানে রয়েছে একটি পালকি। ফুলে, পল্লবে, রক্তিম রেশমী ঝালরে সাজানো হয়েছে পালকিটিকে। বাতাসে :ঢেউ খেলছে ঝালর, রঙের আভা ছড়াচ্ছে। পালকির দরজা বন্ধ।

পালকিতে রাখা হয়েছে জমি বণ্টনের দলিলপত্র—জীবনের খতিয়ানের, স্বৈরাচারী শাসনের লাঞ্ছনা থেকে মুক্তির ছাড়পত্র যা কৃষক-খেতমজুর-হরিজনরা জোতদারের কম্পমান হাত থেকে কেড়ে নিয়ে এসেছে। অনেকক্ষেত্রে ছিনিয়েও আনতে হয়নি, জোতদাররা তাদের অভ্রভেদী ঐশ্বর্য পিছনে ফেলে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পালিয়েছে।

আরেকটি খোলা পালকিতে কৃষকেরা রঘুকে ধ্বনি দিতে দিতে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রঘু মিছিলের শরিক হয়ে ওদের পাশাপাশি হেঁটে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু ওরা রাজি হয়নি। নাগীসুরকেও তারা আরেকটি পালকিতে বসিয়েছে। নাগীসুর পনেরো দিন পরে মুক্তি পেয়ে রঘুর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। দুই বিজয়ী বীরকে কাঁধে নিয়ে তারা হৈ হৈ করে ছুটে চলেছে।

তাদের পিছনে রয়েছে লম্বা মিছিল। স্লোগানে, বাঁশির সুরে, ঢোলকের তালে তালে তারা বিজয় উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি করতে করতে চলেছে। বাচ্চা-বুড়ো জোয়ান কেউ বাদ নেই। মেয়েরাও

বেরিয়ে এসেছে। আজ আর কারোর দরজায় শেকল তোলা নেই। আজ তালা নেই কারণ চোর নেই। কারো হাতে অস্ত্র নেই কারণ অত্যাচারী নেই। আজ তারা সবাই মালিক নিজের নিজের জমিতে।

সুসজ্জিত পালকি এসে দাঁড়াল জগন্নাথ রেড্ডির প্রাসাদের তোরণে। সবাই মিলে পালকিটিকে প্রাসাদের আঙিনায় বয়ে নিয়ে গেল। ভিতরে কিষাণ মেয়েরা আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। শঙ্খধ্বনি করে তারা পালকিকে বরণ করলো, আরতি করলো, বিজয়ের গান গাইলো।

হ্যাঁ, এইভাবেই আরো অনেক রূপে বিপ্লবের রূপ সে দেখেছে। হাজারো রূপ ধরে বিপ্লব তার স্বপ্ন ভরিয়ে দিয়েছে। সে কল্পনা করেছে বিপ্লব যখন আসবে তখন তার চেহারা কেমন হবে, বিপ্লবের পরেই বা কি হবে।

বিপ্লব তার কল্পনায় যে রূপেই আসুক আর কোনদিন এভাবে লজ্জানম্র বধূর বেশে, রাঙা ওড়নার আড়ালে, বন্ধ পালকিতে আসেনি। কিম্বা এভাবে আরতি, শঙ্খধ্বনি, মঙ্গলগীতি কিম্বা বীর কৃষকের বন্দুকের নলে চন্দনের তিলক পরে। ওই একবারই বিপ্লবের এই শান্তশ্রী তার কল্পনায় ধরা দিয়েছে। বিপ্লবের সেই রূপটিই তার কল্পনায় বার বার ধরা দিয়েছে যেমন সে আসবে কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে, বিপুলবীর্য সৈনিকের অগ্নিতেজে কিম্বা লাখো লাখো বেয়নেটের মুখে তীব্র তপ্ত ঝাঁঝালো মৃত্যুর স্বাদ নিতে নিতে।

রঘু ভাবতে ভাবতে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তেলেঙ্গানার সশস্ত্র সংগ্রাম বিশ্ববিপ্লবের ইতিহাসে একদিন স্থান পাবে। এই বিপ্লবের নাম হবে ভারতবর্ষের কৃষক বিপ্লব। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে মনে মনে বলে সেদিন আমি থাকবো না, সে বিপ্লবের শরিক হতে আমি পারবো না।

পাঁচের

ঝনঝন শব্দে রঘুর ধ্যান ভেঙে যায়। জরীপের শিকলের শব্দ। গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ নারায়ণ রাও এগিয়ে এসে রঘুর হাতে শিকলটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে,—নাও এবার বণ্টন সুরু করো।

রঘু হাত বাড়িয়ে শিকলটা নিয়ে বলল,—গ্রামের পাটোয়ারী শ্রীরাম পংলু কোথায়? তাকে পেলে কাজটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যেত।

সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

একজন বলল,—উনি তো বাবুদের পাটোয়ারী গো। গরীব কৃষকদের পাশে উনি আবার কবে ছিলেন? ওনার শিকল যে সবসময় আমাদের বুকের ওপর দিয়েই চলে। জোতদারের সঙ্গে উনিও পালিয়েছেন।

রঘু বলল,—পুরোহিত শ্রীশিয়ারাম শাস্ত্রী কোথায়? ওর আশীর্বাদ নিয়ে কাজ সুরু করতে চাই।

আবার হাসির রোল উঠলো।

নাগীসুর এগিয়ে এসে বলল,—রঘু আজকের উৎসব যদি জোতদারকে ঘিরে হতো তাহলে জোতদারের কপালে চন্দনের তিলক পরাবার জন্যে ছুটে আসতেন তিনি। আজ যে কৃষকের উৎসব তাই তিনি গা ঢাকা দিয়েছেন।

সবাই সমস্বরে বলে উঠলো,—রঘু আর দেরী নয়, তুমিই আমাদের পাটোয়ারী, তুমিই আমাদের পুরোহিত। বাবুদের ধ্বজাধরাদের কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের।

রঘু বলল,—তবে তাই হোক। ঢোলক বাজাও। এসো আমরা শোভাযাত্রা করে মাঠের দিকে যাই। কৃষকদের "চৈত্র যাত্রা" (বিজয় যাত্রা) সুরু হোক।

রঘু পা বাড়াতেই ঢোলকে চাটি পড়লো। ঢোলকের তালে তালে

গান ধরলো সবাই। নবজীবনের গান। কৃষক কৃষাণীর মিলিত কণ্ঠস্বরে ঐকতান সৃষ্টি হলো। তাদের গানে মুখরিত হলো আকাশ বাতাস।

চোখে নতুন দিনের স্বপ্ন নিয়ে
মৃত্যুভয়কে পায়ের তলায় রেখে
মিছিল এগোয়।

ষোল

রঘুর চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

যেদিন কৃষকদের জমি হলো এবং তার আগে কৃষকদের জমি বণ্টনে যখন সে ব্যস্ত ছিল সেই কটা দিনই তার জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিন। সেই আলোতেই জেলের এই অন্ধকার কুঠরিও তার কাছে আলোময় মনে হয়।

জমি বিলিব্যবস্থার সময়ে ছোটো ঝগড়া বিবাদ হয়েছে, কেউ একটা বিশেষ জমি চেয়েছে, কারো খালের কাছাকাছি জমি চাই ইত্যাদি। কেউ বেশি জমি দাবী করেছে, কেউ হিসাবে কারচুপি করতে চেয়েছে এইসব নিয়ে ঝগড়া। কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ, সকলের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের মধ্যস্থতায় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সকলের খুশির আবহাওয়াতেই কাজ সমাধা হয়েছে।

বাবার কথা মনে পড়ে যায় রঘুর। জমি বিলির সময়ে তার বাবার কাণ্ডকারখানা। রঘু ঠিক করে রেখেছিল সকলকে জমি দেওয়ার পর যে অংশটুকু বাঁচবে সেই জমিটুকুই তার বাবাকে দেওয়া হবে। তার বাবাকে সে কোনো বিশেষ সুযোগ দিতে চায় না। যেহেতু বিলিব্যবস্থার ভার তার ওপর বর্তেছে তাই তার দায়িত্বও বেড়েছে। কিন্তু দেরায়্যা তা বুঝতে চায় না। জমি বিলির সময়ে সে বার বার তার হিস্‌সা দাবী করে গেছে। রঘু তার কথায় কান না দিয়ে মুচ্‌কি হেসে আগে চলে গেছে।

দেরায়্যা তার ছেলের ব্যবহারে খুবই বিরক্ত হয়। অন্যাদের কাছে গিয়ে সে ছেলের নামে অভিযোগ করে। কয়েকজন এসে তার কাছে দেরায়্যার হয়ে সুপারিশও করে গেছে। কেউ কেউ এক খণ্ড ভালো জমি তাকে দেবার জন্তে তদ্বির করেছে কিন্তু রঘু সব হেসে উড়িয়ে দিয়েছে।

অবশেষে দেরায়্যার সন্দেহ হলো ছেলে তাকে জমি থেকে বঞ্চিত করতে চায়। সন্দেহ যখন তাকে বেশ দুর্বল করে তুলেছে ঠিক তখনই সে জমি পেল। যতটুকু জমি সে তার নিজের জন্যে, ছেলের জন্যে, ভাবী পুত্রবধূ ও নাতির জন্তে আশা করেছিল গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠদের সুপারিশে রঘুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে তার চেয়েও বেশি জমি পেল।

দেরায়্যা খুশিতে নাচতে নাচতে তার নিজের জমির ওপর ছুটে গিয়ে দাঁড়ালো। খানিকটা মাটি তুলে নিয়ে সে নিজের বুকে ঘষে নিল। তারপর আবার এক মুঠো মাটি তুলে নিয়ে আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে—"আমার জমি, আমার জমি" বলে চিৎকার করে উঠলো।

তারপর ছুটে এসে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লো।

সে কী কান্না। শরীরটা ফুলে ফুলে ওঠে। রঘু বাপকে জড়িয়ে ধরে বলে,—থাম্, আর কাঁদিস না। কিন্তু সে নিজেও কেঁদে ফেলে। অফুরান সে কান্না!

সতেরো

কৃষকেরা জমির মালিক হয়েছে।

সারা গ্রাম আনন্দে মাতোয়ারা।

কিন্তু মাথার ওপর থেকে তখনো ছায়া সরে যায়নি। জোতদার শেষ কামড় দেবার জন্তে তৈরি হচ্ছে। জোতদার সাহায্যের জন্যে সরকারের কাছে আবেদন করেছে। খেতমজুররা জমির মালিক হবে এ কখনই সহ্য করা যায় না। তাদের কর্মচারীরাও সরকারকে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করে বে-আইনী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্যে আবেদন করেছে।

যারা এতদিন স্বেচ্ছায় গোলামী করে এসেছে তাদের ক্রোধ ও ঈর্ষাটা যেন আরো প্রবল। খেতমজুররা মালিকের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে আর তারা পিছনে পড়ে রইবে এ হয় না। কৃষকদের এ বেয়াদপি তাদের কাছে অসহ্য।

তারপর একরাতে নিজামের সেনাবাহিনী গ্রাম ঘেরাও করলো।

গ্রামের শান্তজীবন তছনছ করে বিভীষিকার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হলো।

ধরপাকড় শুরু হলো। জোয়ান-বুড়ো গ্রেফতার হলো

এবং সেই হাঙ্গামার রাতে রঘুকে গ্রেফতার করা হলো, অমানুষিক প্রহার করা হলো, তারপর জেল হাসপাতালে পাঠানো হলো। সুস্থ হবার পর 'ফাঁসি সেল'-এ পাঠানো হলো। রঘুর অন্যায়টা ছিল মারাত্মক, সে কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রামে উত্তেজিত করেছে। সে ছিল কৃষক খেতমজুরদের বন্ধু, পথপ্রদর্শক, নেতা।

সুতরাং তার অপরাধ ক্ষমার বাইরে।

সুতরাং সরকার তাকে ক্ষমা করতে পারে না।

পুলিশ আর জোতদারের কর্মচারীরা তার বিরুদ্ধে অপরাধের লম্বা ফিরিস্তি তৈরি করলো।

তারপর—

জেলখানার অন্ধকার কুঠরিতে সে চোখ বন্ধ করলো।

এখন রাত কতো সে জানে না।

আঠারো

একটা কর্কশ শব্দ।

সেলের দরজা খোলা হলো।

লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে রঘু দেখলো তার বাপকে। পাশে সেই বুড়ো সিপাই। বাপের মুখখানা শুকনো, ফোলা ফোলা।

বুড়ো সিপাই গরাদঅলা দরজার তালা খুললো। বেয়াড়া

ছেলের পাশে এসে দাঁড়ালো। দেরায়্যার চোখ ভর্তি জল। রঘু আস্তে আস্তে বলল,—বাপ্ বোস্।

দু'জনে সেলের মাঝখানে মুখোমুখি বসলো।

দেরায়্যার ঠোঁট কাঁপছে। মাঝে মাঝেই হাতের মুঠি শক্ত করছে। মাথাটা এদিকে ওদিকে দুলছে। সে যেন কিছু বলার চেষ্টা করছে, তার ঠোঁট দুটি কাঁপছে কিন্তু কিছুই বলে উঠতে পারছে না।

বাপকে ভেঙে পড়তে দেখে রঘুর বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। কিন্তু নিজেকে সে সামলে নেয়। অনেক চেষ্টা করে সে কথা বলে।

—গ্রামের খবর কি বাপ্?

—গ্রামে এখন বিশেষ কেউ নেই।

—সব তাহলে কোথায়?

—ছেলে ছোকরারা সবাই গ্রেফতার হয়েছে। আমরা কিছু বুড়ো, বুড়ি, আর বাচ্চারা গ্রামে পড়ে আছি। জোয়ান মরদ যারা বেঁচে আছে, গ্রেফতার হয়নি, তারা জঙ্গলে গিয়ে আত্মগোপন করে নতুন করে সংগ্রামের জন্যে তৈরি হচ্ছে। সেখানেও সৈন্য পুলিশ মাঝে মাঝেই হানা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে গভীর রাতে জঙ্গল থেকে গুলির শব্দ শোনা যায়। তখন বুড়ি ফুলম্মা বলে,—আরেকটা গেল। তারপর গলা ফাটিয়ে হাঃ হাঃ করে হাসতে থাকে।

—ফুলম্মা? আমাদের বুড়িমা?

—হ্যাঁ বাবা, ফুলম্মা পাগল হয়ে গেছে।

রঘু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তার চোখে গ্রামের ছবিখানি ভেসে ওঠে। আর বুড়িমা'র মুখখানি।

—জগন্নাথ রেড্ডির কি খবর?

—সে আর প্রাসাদ থেকে বের হয় না। পুলিশ রাতদিন পাহারা দেয় প্রাসাদটি। আর আমাদের এ গ্রাম থেকে অন্যগ্রামে যেতে হলে নাম রেজিষ্ট্রী করতে হয়, পারমিট নিতে হয়।

এরপর আবার নীরবতা।

কিছুক্ষণ পরে দেরায়্যার ঠোঁট আবার কেঁপে উঠলো। আস্তে আস্তে সে বলল,—গ্রামের লোক বলছিল আপীল নাকি মঞ্জুর হয় নি।

—হ্যাঁ, তারা ঠিকই বলেছে। যাবার সময়ে জেলার সাহেব তোকে বলবে।

—রজ্জু বলছিল তুই অন্যায় স্বীকার করলে, ক্ষমা চাইলে নাকি শাস্তি হতো না।

—কিসের অন্যায়? কেন ক্ষমা চাইবো?

রঘু রাগে কাঁপছিল।

দেরায়্যা তোতলাতে তোতলাতে বললো,—রাগ করিস না বাবা, আমি তো বলছি না। রজ্জু বলছিল।

—তোর কি মত?

—কখনো মনে হয় তুই যা করেছিস ঠিকই করেছিস। আবার কখনো কখনো বড় দুর্বল হয়ে পড়ি। তুই যে আমার একমাত্র সন্তান। আমার যে আর কেউ নেই।

দেরায়্যা কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছে নেয়।

রঘু বাপের দু'কাঁধে তার দুটি হাত ছড়িয়ে দিয়ে বলে,—বাপ তোর মনে পড়ে সেদিনের কথা। ওই রাক্ষুসি প্রাসাদটাকে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলি, 'আমাদের সবকিছু ও খেয়ে নিয়েছে। তোকে কিছুই দিতে পারলাম না, শুধু ঘৃণা দিয়ে গেলাম। দেখিস যদি পারিস।"

মনে পড়ে তোর সে কথা।

দেরায়্যা সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে।

—তবে কেন আজ তা ফিরিয়ে নিতে এসেছিস?

দেরায়্যা বলল,—নারে, আমি ফিরিয়ে নিতে আসিনি, তবে......

আমি মূর্খ মানুষ। বুঝতে পারি না আমার একমাত্র সন্তানকে কেন আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে? যখন এই কথাটা ভাবি তখন মাথাটা ঠিক রাখতে পারি না। আবার যখন জঙ্গল থেকে গুলির শব্দ শুনতে পাই তখন রাতটা বড় বেশি লম্বা মনে হয়।

অন্ধকারকে বড়ো বেশি কালো মনে হয়।

রঘু কথার মোড় ঘোরাতে চায়। বাপের কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নেয় সে।

—বাপ্, সেই মেলার কথা তোর মনে পড়ে? সেই যে একটা কাপড়ের দোকানে রেশমী থানের ওপর আমার হাত রেখেছিলাম বলে দোকানদার আমায় "কামলা" বলে গালাগাল দিয়েছিল, মারতে এসেছিল। তুই তাড়াতাড়ি আমার হাত টেনে নিয়ে সরে পড়েছিলি। সেদিন তুই ছেলের মনের কথা জানতে পেরেছিলি। তোর ছেলেরও জগন্নাথ রেড্ডির ছেলে প্রতাপ রেড্ডির মতো রেশমের জামা পরতে সাধ হয়। তুই এটাও জানতিস রেশম হরিজনদের জন্যে নয়, খেতমজুর, বেগারখাটা শ্রমিকদের জন্যে নয়। যত মোটা কাপড় সব এখানে যত রেশমের কাপড় সব ওখানে; সমস্ত ক্ষুধা এখানে আর ভালো ভালো খাদ্য সব ওখানে। এখানে শুধুই লাঞ্ছনা, অপমান, আর মানমর্যাদা সব ওখানে। তোর ছেলে শুধু ওই ফারাকটা ঘুচিয়ে দিতে চেয়েছিল। এই তার অপরাধ।

একটু দম নিয়ে রঘু আবার বলল,—সে-ই দিন আসবেই যেদিন একটুকরো কাপড়, কিছুটা গম আর একখণ্ড জমির জন্যে মানুষকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হবে না। মানুষের সেই ভাগ্য পরিবর্তনের দিন যখন এগিয়ে আসছে ঠিক তার আগেই কাল সকালে তোর ছেলেকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে রঘু বলল,—বাপ, তোর ছেলে কোনো অন্যায় করেনি। দেরায়্যা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

রঘু বলল,—বাপ, তুই কাঁদিস না। তুই কাঁদলে সংসার কি বলবে, গ্রামের লোক কি ভাববে? জোতদারের দালালরা তোকে কাঁদতে দেখলে হাসবে, ঠাট্টা করবে।

দেরায়্যা চোখের জল মুছে ফেললো।

রঘু আরো অনেকক্ষণ বাবাকে বোঝালো। এত ভালোবাসা, এত ঘনিষ্ঠতা নিয়ে বাবার সঙ্গে সে কোনোদিন কথা বলেনি। আজ যেন

তার বুকের সব অনুভূতিগুলো সে বাবার অন্তরে সঞ্চারিত করে দিতে চাইছে।

গ্রাম ছেড়ে চলে আসার পর থেকে সে যা যা করেছে, যা কিছু চিন্তা করেছে, কি কি করতে পেরেছে আর কি কি করতে পারেনি সব বললো। বিদায় নেবার আগে মনের সব কথা সে বাবাকে বলে যেতে চাইলো। সে তার বাবাকে হায়দ্রাবাদের কথা বললো। সেখানে থাকতেও রেশমের একটি জামার জন্যে তার মন আনচান করতো। কেমন করে টাকা জমাবার জন্যে পশুর মতো পরিশ্রম করেছে সে কথাও বললো।

ছোট্ট, খুব সাধারণ একটি সাধের কথা বললো সে। একটি রেশমের জামা। কিছু শস্যের দানা আর একটুকরো জমি। সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্যে একটু আশ্বাস।

খেতমজুরদের পৃথিবী আজো অনাবাদী। পৃথিবীর যত সুখ চিরকালই তাদের কাছ থেকে দূরে থাকবে। উপর থেকে কোনোদিনই আশীর্বাদ নেমে আসবে না। খেতমজুরদের নিজেদেরই নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হবে। এর জন্য চাই সংগ্রাম। সংগ্রামের কোনো বিকল্প নেই। সংগ্রাম না করলে আরো হাজার হাজার বছর রেশম ওই দিকেই থেকে যাবে, এ দিকে থাকবে শুধুই নগ্নতা।

রঘু যতক্ষণ কথা বললো সেরায়্যা মনোযোগ দিয়ে তা শুনলো। বেশ খানিকটা সময় কেটে গিয়েছে। বাপ-ছেলে এতো কাছাকাছি, এতো ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার সাথে কথা বলছিল যেন এটা জেলখানা নয়, গ্রামের কোনো বড়ো গাছের ছায়ায় বসে তারা গল্প করছে।

ওদের কথার মাঝে সেলের দরজা নড়ে উঠলো. রঘু চুপ করলো। সেই বৃদ্ধ সিপাই এসে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললো,—কিছু মনে করবেন না, সময় হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া আমার ডিউটিও শেষ। আমাকে এখনই দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে হবে নতুন সিপাইকে। লোকটা মোটেই ভালো নয়। কথা বলার সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে জানলে সে খুব রাগ করবে।

দেরায়া উঠে দাঁড়ালো। রঘু বাবার বুকের ওপর মাথা রাখলো। বাপ ছেলেকে জড়িয়ে ধরলো। দেরায়ার চোখে আর জল নেই। জানে ছেলে দুঃখ পাবে। শেষ মুহূর্তে দুঃখ দিতে চায় না সে।

দেরায়া ছেলেকে প্রাণভরে একবার দেখে নিয়ে বললো,—সকালে একবার আসবো বাবা। ভোর ভোর ঠিক এসে যাবো।

—রঘু বললো, আজ আর গ্রামে ফিরে যাবার কি দরকার? শহরে কোথাও কিম্বা জেলখানার বাইরে মাঠে শুয়ে থাক।

দেরায়া বললো,—না, না, গ্রামে আজ আমাকে ফিরতেই হবে। সারারাত আজ আমাকে জেগে কাটাতে হবে নয়তো···

কথাটা শেষ না করেই দেরায়া বেরিয়ে গেল।

সেলের দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

উনিশ

দেরায়া গ্রামে পৌঁছে দেখলো সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত তখন অনেক। শুধু একটি দরজা খোলা। সেখানে কুপি জ্বলছে। ফুলম্মার ঘর। দেরায়া ফুলম্মার ঘরে নীরবে ঢুকে গেল। ফুলম্মাকে এত রাতে জেগে থাকতে দেখে খুব মায়া হলো তার।

দেরায়াকে দেখে তাড়াতাড়ি বুড়ি খাটিয়া থেকে নেমে এসে তার মুখোমুখি দাঁড়াল। ফুলম্মার চোখে অস্থির চাহনি। ফিসফিস করে সে বলল,—কেমন আছে রে আমাদের সোনার ছেলে।

দেরয়ার মুখে কথা নেই।

ফুলমা এদিক ওদিক দেখে নিয়ে আবার বলে,—তাকে আশীর্বাদ করেছিস তো? বেঁচে থাক আমাদের সোনার ছেলে। যুগ যুগ জিয়ে··· ··

স্লোগানের এই ভাষাটা ফুলমা সম্প্রতি শিখেছে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ফুলমা খিল খিল করে হেসে উঠলো।

তারপর দেরায়্যার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো,—আমি পাগল হয়ে যাইনি রে।

তবু মাঝে মাঝে আমার বুকের ব্যাথাটা মোচড় দিয়ে ওঠে তখনই আমি স্থির থাকতে পারি না আর তখনই আমি গলা ছেড়ে হেসে উঠি। হাসতে না পারলে আমি বাঁচবো কি করে বল?

দেরায়্যা তখনও চুপ। এখানে আসা অবধি সে একটিও কথা বলেনি। কুলসুম বিস্মিত হয়ে বলল,—কি একটা কথা যেন তোকে কুরে কুরে খাচ্ছে। কথাটা তুই প্রকাশ করতে পারছিস না। কি কথা বলে ফ্যাল, মন হাল্কা হবে।

দেরায়্যা আমতা আমতা করে বলল,—না তেমন কিছু নয়। কুলসুম বলল,—নিশ্চয়ই আছে, কি বলার আছে বলে ফ্যাল নয়তো আবার আমি ওইভাবে হেসে উঠবো।

দেরায়্যা তার ধরা গলায় কোনোরকমে কথাটা উচ্চারণ করতে পারলো।

—ছেলেটার একটা রেশমের জামা পড়ার সাধ ছিল।

— রেশমের জামা?

কুলসুম আবার সেইভাবে হাসতে শুরু করলো। হাসতে হাসতেই সে বললো, রেশমের জামা? রঘু চেয়েছে? সে নিজের মুখে বলেছে একথা?

দেরায়্যা আমতা আমতা করে বলল,– না, না, সে কিছুই বলেনি। আমার মন বলছে একটা রেশমের জামা পরতে পারলে ছেলেটা শান্তিতে মরতে পারতো।

—রেশমের জামা।

কুলসুম আবার হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে বলে,—তুই একটা আস্ত বোকা। রেশমের জামা কোথায় পাবি? কারো ঘরে এক কণা খাবারের দানা নেই, বলে কি না রেশমের জামা চাই।

কুলসুম আবার সেইভাবে হাসতে লাগলো।

দেরায়্যার মুখে কে যেন এক ছোপ কালি মাখিয়ে দিল। কান্না

চাপতে চাপতে ভাঙা গলায় সে বলল,—তুমি বুঝবে না কুলসুম। ছেলেটা ছেলেবেলায় মাকে হারিয়েছে। আমিই ওর মা বাপ। বাপের মন তুমি বুঝবে না। মনে পড়ছে একদিন তাকে একটি তালপাতার বাঁশি কিনে দিয়েছিলাম। ছেলেটা বাঁশি পেয়ে কী যে খুশি হয়েছিল তা আর বলার নয়। চোখ বন্ধ করলে সেই খুশিভরা মুখখানা আমি আজও দেখতে পাই। তার সব খেলনাগুলিই আমার চোখে ভাসছে। কামলারা আর ক'টা খেলনাই বা কিনে দিতে পারে ছেলেদের।

ছোটবেলায় মেলায় রেশমের থান দেখে তার একটি রেশমের জামা পড়ার সাধ হয়েছিল। পারিনি আমি কিনে দিতে, ক্ষমতায় কুলোয়নি। পারলেও কামলার ছেলের রেশমের জামা পরার অধিকার ছিল না।

আমার বাইশ বছরের তরতাজা জোয়ান ছেলে আজ যখন তার ছেলেবেলার রেশমের জামা পরার সাধ প্রকাশ করছিল তখন তার মুখে আমি শিশুর সেই সরলতা দেখেছিলাম।

দেরায়্যা কান্না চাপতে গিয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে। বুকের ওপর হাত রেখে ধরা গলায় সে আবার বলে বাপের মনের এখানটায় কী যে হচ্ছে সে আমি তোমাকে কেমন করে বোঝাই।

কুলসুম লজ্জা পেল। সে মাথা নিচু করে রইলো। একটু পরে বলল,—আমার তো কেউ-ই নেই। কেউ গেছে প্লেগে, কেউ গেছে কলেরায়, কেউ গেছে জোতদারের পেটে। বাকী যারা ছিল তারা জেলে। আমি কোথায় পাবো রেশমের জামা?

দেরায়্যা বলল,—তুমি বলতে পারো এখানে কারো ঘরে পাবো কি না।

কুলসুম এবার আরো গলা চড়িয়ে হাসতে লাগলো। তার হাসির শব্দ শুনে আশপাশের ঘর থেকে অনেকে ছুটে এল। তারা কুলসুমার ঘরে দেরায়্যাকে দেখে একটু অবাক হলো। একজন বলল,—কি ব্যাপার, পাগলিটা রাত দুপুরে হাসছে কেন?

কুলসুম বলল,—আমি পাগল না এই লোকটা পাগল? বলে কি না

ছেলের জন্তে রেশমের জামা চাই।

দেরায়্যা তখন তাদের সব খুলে বলল।

একজন বলল,—দেরায়্যা তোমার ব্যথা আমরা বুঝি কিন্তু রেশমের জামা কোথায় পাবো বলো? তা ছাড়া এতো একরকম পাগলামী। কাল সকালে তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে আর তুমি এখন রেশমের জামা খুঁজে বেড়াচ্ছো? সে জানতে পারলে রাগ করবে, দুঃখ পাবে।

একটি ছেলে বলল,—আগামী মাসে গুরমার বিয়ে। হয়তো তার জন্তে কাপড় কেনা হয়ে থাকতে পারে। চলোনা সবাই মিলে যাই। দেখিনা দেরায়্যার মনের সাধটা পূরণ করা যায় কি না।

একজন বুড়ো বলল,—তুমি দেখছি আর এক পাগল। গুরমার বাবা রেশমের কাপড় কেনার টাকা পাবে কোথায়?

দেরায়্যা আস্তে আস্তে বলল,—খবর নিতে দোষ কি? যদি ··

কয়েকজন দেরায়্যার সাথে গুরমার বাবার কাছে যাবার জন্তে প্রস্তুত হলো। এই সময় আরেকজন বলল,—এত রাতে তোমরা যাচ্ছো যদি পুলিশ দেখতে পায়। পুলিশ যদি সন্দেহ করে কিছু করে বসে।

কয়েকজন তাকে ধমক দিয়ে বলল,—অতো ভয় করলে চলে না। তুমি ঘরে যাও, আমরা দেখছি।

কুঁড়ি

ওদের পায়ের শব্দে অন্তেরাও জেগে উঠেছিল। তারাও সঙ্গ দিল। দেখতে দেখতে রেশমের জামার কথাটাও বেশ ছড়িয়ে পড়লো। তাদের পৌঁছবার আগেই গুরমার বাবার কাছে কথাটা পৌঁছে গেছে।

গুরমার বাবা বেরিয়ে এসে হাতজোড় করে বলল,—রেশমের কাপড় কেনার ক্ষমতা বাবা আমার নেই। যা যা কিনেছি আমার ঘরে রয়েছে দেখবে চলো। থাকলে এখনই আমি দিয়ে দিতাম। তার

জন্যে রেশমের কাপড় কেন, জীবনটাও আমি দিতে পারি।

এতক্ষণে সবাইর মনেই জেদ চেপে গেছে। কেউ কেউ আশ-পাশের গ্রামে চলে গেল। ঘরে ঘরে রেশমের জামার জন্যে খোঁজাখুঁজি পড়ে গেল। সবাইর এক কথা, রেশমের জামা একটা পেতেই হবে।

কয়েকজন বুড়ো ফিসফিস করে বলল,—দেরায়্যার ভীমরতি হয়েছে। তবু তারাও কিন্তু ফিরে গেল না। এমন সময় রমলু ধোপা ছুটে এসে বলল, তার কাছে অনেক জামা কাপড় আছে, তার মধ্যে জগন্নাথ রেড্ডি ও প্রতাপ রেড্ডির দুটো রেশমের জামাও আছে।

দেরায়্যা ঘৃণায় থু থু ফেলে বলল,—আমার ছেলে জোতদারের জামা পড়বে না। তুমি একথা বললে কি করে রমলু?

রমলু লজ্জা পেল। মাথা নিচু করে সে বলল,—এ ছাড়া গ্রামে রেশমের জামা কোথায় পাওয়া যাবে?

দেরায়্যা চোখে অন্ধকার দেখলো। সে মাথায় হাত দিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলো। হঠাৎ উত্তেজনায় সে দাঁড়িয়ে পড়লো। মনে পড়েছে। সবাইকে সে বলল,—তোমরা একটু দাঁড়াও ভাই, আমি দেখছি।

ছুটে চলে এল সে নিজের ঘরে। কেরোসিন কাঠের একটা বাক্সের ডালা তুলে সে ছেঁড়া কাপড়চোপড়গুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো। হঠাৎ সে চীৎকার করে উঠল,—পেয়েছি। পেয়েছি।

তার স্ত্রীর দু'খানা ছেঁড়া শাড়ি, বিয়ের সময় শশুর দিয়েছিল। তারই নিচে লাল রঙের একখানি রেশমী ওড়না। এখনো ভালো আছে। রঘুর মা পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করার জন্যে রেখে দিয়েছিল। দেরায়্যার মনে পড়ে গেল তার বউ প্রতিবেশী মহিলাদের ওড়নাখানা দেখাতো আর গর্বের সঙ্গে বলতো কার ঘরে এমন ওড়না আছে। ছেলের বউকে আমি এই দিয়ে আশীর্বাদ করবো।

ততক্ষণে সবাই দেরায়্যার ঘরের সামনে এসে গিয়েছে। সবাই দেখলো চোখের সামনে ওড়না খানা মেলে ধরে স্থির হয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। তার যেন চেতনা হারিয়ে গেছে। সবাই চিৎকার করে উঠলো,—পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে!

ওদের উল্লাস দেখে মনে হলো এইমাত্র তারা যেন শত্রুপক্ষের দুর্গ জয় করে ফেলেছে।

দেরায়্যা ওদের দিকে তাকিয়ে চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞেস করলো,—এতে কি জামা হবে? একজন বলল,—কেন হবে না, নিশ্চই হবে। সুমাগ্না দর্জিকে খবর পাঠাও, সময় খুব কম তাড়াতাড়ি আসতে বলো।

একজন পাশের গ্রামে চলে গেল সুমাগ্না দর্জিকে খবর দিতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে দর্জিকে নিয়ে ফিরে এল। দর্জি ওড়নাখানা দেখে বলল,—এতে জামা হবে না। একটা নিমা হতে পারে।

সবাই বলল,—তাই বানাও। তবে খুব তাড়াতাড়ি করো, সময় খুব কম। সুমাগ্না দর্জি লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলল, আমি তো সঙ্গে সঙ্গেই চলে এসেছি, মেশিন তো আনা হয়নি।

একজন বলল,—আমি নিয়ে আসছি। বলেই সে দৌড়তে লাগলো। সুমাগ্না সেই ফাঁকে ওড়নার ভাঁজ খুলে দেখতে লাগলো কোথাও ফুটো কাটা আছে কি না। কয়েকটা পোকায় খাওয়া ছিদ্র তার চোখে পড়লো।

দেরায়্যার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে বলল,—তাহলে কি হবে?

দর্জি মুচকি হেসে বলল,—ভয়ের কিছু নেই, এমন ভাবে কাঁচি চালাবো যে একটি ও ছিদ্র থাকবে না। তার জামায় কোনো ছিদ্র থাকতেই পারে না।

মেশিন নিয়ে ছেলেটি চলে এলো। দর্জি খুব সাবধানে কাঁচি চালিয়ে নিমাটা কেটে নিল। তারপর মেশিনের সূচে সুতো লাগিয়ে সাবধানে সেলাই করতে লাগলো।

এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখার জন্যে গ্রামের সব লোক জড়ো হয়েছে। রীতিমতো ভীড় জমে গেছে। সূচের ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে যেন সকলেরই নিঃশ্বাস ওঠানামা করছে। ওদের হৃদয়ের আকাঙ্খাটাই যেন সেলাইয়ের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠছে। সকলের আগ্রহ আর উদ্বেগ দেখে তাই মনে হয়।

সেলাই করতে করতে একবার দর্জির আঙুলে সুচের ঘা লাগতেই সবাই এমন ইশ শব্দ করলো যেন একসঙ্গে অনেকগুলো হৃদয় কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে।

দর্জি খুব সাবধানে সেলাই করতে লাগলো। একজন মহিলা এগিয়ে এসে বলল,—তাড়াতাড়ি করো ভাই। সেলাই হয়ে গেলে আমরা এতে ফুল তুলবো।

সবাই বিস্ময়ে মহিলার দিকে তাকাল।

মহিলা বলল,—হ্যাঁ, এটা নারী সমিতির সিদ্ধান্ত।

*   *   *   *

জামাটা এখন আর দেরায়্যার একার সম্পত্তি রইলনা। গ্রামের সবাইর ছেলের জামা, কিংবা সকলের ভাইদের জামা হয়ে গেল। জামা তৈরির পর পরবর্তী পর্যায়ের জন্যে মেয়েদের হাতে গেল। অন্যান্য মেয়েদের মাঙ্গলিক গানের মধ্যে একটি মেয়ে সুচ আর রঙীন সুতো নিয়ে বুকের মধ্যে কাস্তে, হাতুড়ি আর গমের চারা ফুটিয়ে তুললো। কিছু মেয়ে ফুলের মালা গেঁথে ফেললো।

জামাটা এবার ইস্তিরি করতে হবে। দু'জন কৃষক চলে গেল ইস্তিরি আনতে। ইস্তিরি করার পর জামাটিকে একটি লাঠির মাথায় টাঙিয়ে ফুলের মালা পরানো হলো।

সবাই মিলে স্লোগানে স্লোগানে গ্রামের আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুললো। কালা রাজ নিপাত যাক।

রঘুরায়া জিন্দাবাদ।

তেলেঙ্গানা জিন্দাবাদ।

রজন্তু চিৎকার করে বললো,—জঙ্গলে যারা আত্মগোপন করে আছে তাদের খবর দাও। গ্রামে গ্রামে খবর পাঠিয়ে দাও আর কিছুক্ষণের মধ্যে মিছিল করে রঘুর এই লাল জামা নিয়ে আমরা জেলখানায় যাবো। আবার স্লোগান দেওয়া হলো। স্লোগানের শব্দের ঢেউ আশপাশের গ্রামে গিয়ে আঘাত করলো। গাছপালা কাঁপিয়ে প্রতিধ্বনি উঠলো।

এ গ্রাম সে গ্রাম থেকে লোক এসে জমায়েত হলো। মশাল জ্বালানো হলো।

জোতদার, পুলিশ, গুণ্ডাবাহিনীর বিভীষিকার কথা মনে রইলো না কারোর।

সে এক আশ্চর্য রাত।

মশালের আলোয় রাতের অন্ধকার ঘুচে গিয়েছে। জনসমুদ্রে জোয়ার এসেছে। উত্তেজনায় অধীর সবাই।

দেখতে দেখতে মিছিলের আয়তন বাড়তে লাগলো। মশাল নিয়ে হাজার হাজার কৃষক-মজুরের মিছিল যখন জগন্নাথ রেড্ডির প্রাসাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল তখন প্রাসাদটিকে পরিত্যক্ত মনে হচ্ছিল। পুলিশ ক্যাম্পে আতঙ্ক দেখা দিল। এতবড় মিছিলের ওপর গুলি চালাবার সাহস হলো না তাদের।

জোতদারের গুণ্ডাবাহিনী চোরাপথ দিয়ে পালাতে সুরু করলো।

জেলখানার সামনে মিছিল পৌঁছে গেল। তখনো ভোর হতে কিছু বাকী। তার আগেই আলোর বাজনা বেজে উঠলো। মেহনতী মানুষদের কণ্ঠস্বর জোরালো হলো। মধুর জয়ধ্বনিতে জেলখানার দেওয়াল কেঁপে উঠলো।

একুশ

বাবার হাত থেকে লাল জামাটি হাতে নিয়ে আবেগে উত্তেজনায় মধুর চোখ জলে ভরে গেল। বিস্ময়ের অন্ত রইল না তার। তারপর বাবার মুখ থেকে সে রাতের ঘটনাবলী সব শুনলো। হাজার হাজার মানুষ মিছিল করে এসে জেলখানার গেটে অপেক্ষা করছে, একথা জানার পর তার বুকে যেন সমুদ্রের দোলা লাগলো। আগামী দিনের উজ্জ্বল একটি ছবি তার চোখে ভেসে উঠলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে। পরম শান্তিতে সে বাবার বুকের ওপর মাথা রেখে বলল,—বাপু,

আমার আর কোনো দুঃখ নেই।

দেরাজ্যা ছেলেকে বুকের মধ্যে চেপে রাখলো অনেকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বলল,—আমার চোখের সামনে জামাটা পরে নে। আমার অনেকদিনের সাধ পূরণ হলো আজ। যদি ওদের আপত্তি হয় তাহলে জেলখানার জামার ওপরেই পরে নে। আমার চোখ দিয়ে বাইরের হাজার হাজার মানুষ তোকে দেখতে পাবে।

রঘু হাসি হাসি মুখে জেলখানার জামাটা খুলে কোমরে গুঁজে নিল। তারপর লাল রেশমের ছোট্ট জামাটি পরে নিয়ে বাবাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

দেরাজ্যা তন্ময় হয়ে সেই অভাবনীয় দৃশ্যটি দেখতে লাগলো। বাইশটা বছরের স্মৃতি একটি মুহূর্তে সমাহৃত হয়ে যেন তার চোখের সামনে ধরা দিয়েছে। ধীরে ধীরে তার চোখে ফুটে উঠলো গর্বের আলো।

রঘুর মনে কিন্তু তখন অন্য চিন্তা, অন্য আবেগ। লাল রেশমের জামাটি পরে তার মনে হচ্ছিল নিছক একটি রেশমের জামা সে পরে নেই। গোটা দেশের কৃষক সমাজের সুদীর্ঘ দিনের সংগ্রামের পতাকাটিই সে জড়িয়ে নিয়েছে নিজের গায়ে।

আরো কিছু মনে হয়েছে তার—

নিজের অধিকার আর মা বাবার ভালোবাসার গন্ধ ছড়িয়ে আছে এই জামায়। রেশমের জামায় হাত বোলাতে বোলাতে তার মনে হচ্ছিল হাজারো, লাখো, কোটি কোটি আকাঙ্খা যেন জ্যোতি ছড়াচ্ছে এখানে। গর্বে তার বুক ফুলে উঠলো।

জেলখানার গরাদের দিকে চোখ গেল তার। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো প্রচণ্ড আঘাতে রাতের অন্ধকার গুড়ো গুড়ো হয়ে ধুলোয় মিশে গিয়েছে। জেলখানার দেওয়ালে ফাটল দেখা দিচ্ছে। বাকী আছে শুধু লোহার গরাদগুলো। সেগুলোতেও লালের ছোপ লেগেছে যেন। মায়ের কোল থেকে শিশু যেমন উঁকি মারে, গরাদের ফাঁক দিয়ে তেমনি আলোর রোশনি দেখা দিল। রঘু শিশুর মতো আনন্দে

চিৎকার করে উঠলো,—

—বাপ ভাখ ভাখ, জেলখানার গরাদও আজোর বন্ধা রুখতে পারছে না।

দেরায়্যা গরাদের দিকে নয় তার ছেলের মুখের দিকেই তকোলো। সে জানে এখন চোখের জলের বাঁধ ভাঙা চলবে না। ছেলে দুখ পাবে। সে মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলো। আর তখনই সিপাই এসে তাকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

সিপাই পরিবেষ্টিত হয়ে রঘু মুক্ত আকাশের নিচে নেমে এল। আকাশ থেকে তখন শিশির ঝরছে তার মাথায়। ভোরের লাল সূর্যটাকে হৃদয়ে গেঁথে নিয়ে সে ফাঁসির মঞ্চের দিকে পা বাড়ালো।

জেলখানার বাইরে তখন সমবেত কণ্ঠে গান হচ্ছে। গানের শব্দগুলো জেলখানার দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে আকাশে বাতাসে।

তেলেঙ্গানার সূর্য উঠেছে

দ্যাখো

হাত রাখো আজ স্বাধীনতা সংগ্রামে

জেগেছে মানুষ, এসো মানুষের নামে

তেলেঙ্গানার সূর্য উঠেছে দ্যাখো।

জেলখানার বাইরের গানের প্রতিধ্বনি রঘুর বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে দিল। মনে হলো, তার বুকের মাঝে যেন একটি পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছে যার রঙ্ শহীদের রক্তের মতো লাল।

গান শুনতে শুনতে দেরায়্যার মনে একটা বিশ্বাস স্থায়ীভাবে আসন করে নিল। যতদিন কৃষকের সংগ্রাম বেঁচে থাকবে ততদিন তার ছেলেও বেঁচে থাকবে।

রেড্ডিদের দিন শেষ হয়ে আসছে।

—০—

জ্যাকসন

শান্ত শীতল অন্ধকার রাত। গোটা পরিবেশটাই কেমন যেন কঠিন, শীতল আর অটল। যে পথ ধরে মিঃ জ্যাকসন তাঁর বাংলোয় ফিরছেন সেই পথটিও কঠিন। তাঁর বুটের চাপও কঠিন। পথের দুধারে গাছের সারি তারা যেন সান্ত্রীদের মতো নীরব, নিশ্চুপ। এই শান্ত পরিবেশে মিঃ জ্যাকসনের দম্ভ আর অহমিকা ঘোষিত হচ্ছে তাঁর ভারী বুটের শব্দে। তিনি যে লাহোরের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ এবং তিনি যে এম্প্রেস রোড ধরে হেঁটে চলেছেন এই সচেতনতা তাঁর চলার ভঙ্গিতেই প্রকাশ পাচ্ছে। যদিও ক্লাব থেকে দু'পেগ মন্ত পান করে তিনি বাংলোয় ফিরছেন।

মিঃ জ্যাকসন সান্ত্রীপরিবৃত হয়ে চলেছেন। পাছে তাঁর ওপর কোনো হামলা হয় তাই এ সতর্কতা। নিজের পকেটেও গুলিভরা পিস্তল রেখেছেন তিনি। জ্যাকসন ভাবছিলেন ১৫ই আগষ্টের কথা। আর মাত্র চারদিন বাকি। চারদিন পরেই এই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে। তার বিশ বছরের রাজত্বেরও অবসান হবে সেদিন। ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭। মিঃ জ্যাকসনের হাত থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নেবে সেদিন ভারতীয়রা।

মিঃ জ্যাকসন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কিন্তু তিনি নিজেকে চিরকালই ভেবে এসেছেন খাঁটি ইংরেজ। তাই ইংরেজের রাজত্ব ভারতীয়দের হাতে চলে যাচ্ছে,—এই কঠিন সত্যটি মেনে নিতে বাধ্য হওয়ায় তিনি নিদারুণ আহত। দুশো বছরের রাজত্বের একটি ক্ষুদ্র অংশ এসেছিল তাঁর জীবনে। বিশ বছর তিনি চাকরি করেছেন কিম্বা রাজত্ব করেছেনও বলা যায়। পাঞ্জাবের প্রতিটি জেলায় দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করেছেন তিনি। সর্বত্রই বিশাল বাংলোয় থেকেছেন। আট দশ জন চাকর, হাবিলদার, ইনস্পেক্টর, সিপাই আর হাজার হাজার অসহায় মানুষের ভাগ্যবিধাতা ছিলেন তিনি। এইভাবে একটানা বিশ বছর রাজত্ব

করেছেন। আর মাত্র চারদিন। আগামী ১৫ই আগস্ট! তারিখটা মিঃ জ্যাকসনের বুকে গেঁথে গেছে, তাঁর ভারী বুটের তলার পেরেকগুলোর মতই। চারপাশের জগৎটা কেমন যেন কঠিন আর অটল মনে হচ্ছে। মিঃ জ্যাকসনও অটল তাঁর সিদ্ধান্তে। হ্যাঁ, তাঁর সিদ্ধান্তের কোনো হেরফের হবে না। আর দুবছর তিনি চাকরি করবেন এ দেশে। ঠিক দু বছর তার বেশি নয়। তারপর ফিরে যাবেন তাঁর নিজের দেশে, ইংলণ্ডে। ভারতবর্ষ তাঁর দেশ নয়। তিনি খাঁটি ইংরেজ, ইংলণ্ড তাঁর দেশ। মনকে কঠিন ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন এই তথ্যটি। মনও পালন করে গেছে তাঁর নির্দেশ ঠিক হুকুম-বরদার সিপাইয়ের মতোই।

ভারতীয় নন তিনি। আর দু বছর পরে স্বদেশ ইংলণ্ডে ফিরে যাবেন তিনি এই সিদ্ধান্তটি তাঁর মনের সর্বক্ষণের সঙ্গী। ইয়র্কশায়ারে একটি ছোট বাড়ি ও ডেয়ারী ফার্ম কিনে রেখেছেন। পেনসন নিয়ে ফিরে যাবেন সেখানে। সঙ্গে যাবে তাঁর দুই কন্যা সিন্থিয়া ও রোজি। বড় মেয়ে সিন্থিয়া আর ছোট মেয়ে রোজি—বার্ট নাচ ঘরের দুটি রত্ন। অনেক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলে দুই মেয়ের কাছেই বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে, ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছে কিন্তু দুই মেয়েই তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের তারা কোনোমতেই বিয়ে করতে পারে না। বিয়ে যদি করতে হয় তবে তারা খাঁটি ইংরেজকেই বিয়ে করবে। টমি ফমি ওদের মোটেই পছন্দ নয়। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের মতো ওরা সস্তা নয় যে যেখানে সেখানে যার তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে। এ দিক থেকে বাপের সঙ্গে মেয়েদের খুব মিল। কথাবার্তায় চালে চলনে গর্বোদ্ধত। বরফের মতো শুভ্র কিন্তু কঠিন।

মিঃ জ্যাকসন মেয়েদের খুবই ভালোবাসেন, বোধহয় ইংরেজ রাজত্বের চেয়েও বেশি। বিশেষ করে ছোট মেয়ে রোজিকে। রোজি এতই সুন্দরী যে ইংলণ্ডের যে কোনো লর্ড তাকে গৃহিণী হিসেবে পেলে খুশি হবে। নাচে তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। সৌন্দর্যের প্রতি-

যোগিতাতেও প্রথম পুরস্কারটি রোজির বাঁধা। ক্লাসেও সে সেরা ছাত্রী। রোজির গুণের কথা বলে শেষ করা যায় না। গানে, পিয়ানো বাজানোয়, ছবি আঁকায়, মোটর চালানোয় সব তাতেই রোজি প্রথম। সিন্থিয়ারও অনেক গুণ, তবে রোজির মতো নয়। সৌন্দর্যের বিচারেও সে কিছুটা ম্লান। সিন্থিয়ার যাই-ই থাক, খাঁটি জহরতের জৌলুস তার নেই। তবে একটি বিষয়ে সিন্থিয়া রোজিকে ছাড়িয়ে যায় তা হচ্ছে ভারতীয়দের প্রতি ঘৃণা। রোজিও ভারতীয়দের ঘৃণা করে তবে কেন এই ঘৃণা, সে সম্পর্কে তার মনে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নেই। আত্মীয় স্বজনদের কাছে শুনে বিশেষ করে তার বাবার কাছে গল্প শুনেই ভারতীয়দের সম্পর্কে তার ধারণা গড়ে উঠেছে। চুরি, ডাকাতি, রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ড, পকেট কাটা, জুয়াচুরি, চোরাই মদের ব্যবসা—এই সব গল্প। গল্প নয় যেন আরব্য উপন্যাসের এক একটি অধ্যায়। রোজির জীবন তো স্কুল, বার্টের নাচঘর আর টেনিস কোর্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই বাবার কাছে ভারতীয় অফিসারদের ঘুষ খাওয়ার গল্প, শেঠেদের ব্ল্যাক মার্কেটের গল্প শুনে সে বিস্মিত হয় কিন্তু বিশ্বাসও করে।

যৌবনের উচ্ছলতায় ভরা রোজির জীবন, টেনিসের বলের মতই চঞ্চল। সৌখিন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা, কোনো কোনোদিন চাঁদনী রাতে পার্কে ঘনবৃক্ষের ছায়ানিবিড় পথে বেড়াতে বেড়াতে কোনো বলিষ্ঠ বাহুর বন্ধনে ধরা দেওয়া, রুদ্ধ নিঃশ্বাস, উষ্ণ ঠোঁটের নিষ্পেষণ···। জোছনায় গড়া স্বর্গের ছোঁয়া···রোমাঞ্চকর মুহূর্ত···স্বপ্নের ভেলায় চড়ে দূর দিগন্তে ভেসে বেড়ানো···উত্তেজনাহীন ভারতীয় জীবনের সঙ্গে কী দুস্তর ব্যবধান! ঘৃণা করা সত্বেও কিন্তু ভারতীয়দের সঙ্গে তার কথা বলতে ইচ্ছে করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ যে সব ভারতীয়দের সঙ্গে তার কথা বলার সুযোগ হয়েছে তারা সবাই এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের অনুকরণকারী। অনুকরণ রোজির মোটেই পছন্দ নয়, বরং অনুকরণকারীদের সে ঘৃণা করে। তাই প্রথম পরিচয়ের পরে দ্বিতীয়দিন আর 'হ্যালো' বলে সম্বোধন করেনি কোনোদিন।

আর সিল্ভিয়া। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান হওয়ায় সে গর্বিত, নিজের প্রস্ফুটিত যৌবনের সৌন্দর্য সম্পর্কেও সে গর্বিত কিন্তু যখন কোনো ইংরেজ তাকে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বলে তখন সে কেমন ম্রিয়মান হয়ে যায়। নিজের পবিত্র এ্যাংলো স্যাকসন রক্তে সংমিশ্রণের জন্তে রাগে গর গর করতে করতে ভারতীয়দের প্রতি সুতীব্র ঘৃণায় কটূক্তি করে—"হতচ্ছাড়া ভারতীয়দের কি ভেজাল দেওয়াই ধর্ম। দুধ, ঘি চিনি, শস্য, কাপড় সব কিছুতেই ভেজাল এমনকি তার রক্তেও ভেজাল। ড্যাম সোয়াইন।"

জ্যাকসন তাঁর মেয়েদের যথার্থ শিক্ষাই দিয়েছেন। সব রকম কলুষতা থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন যাতে ইংলণ্ডে গিয়ে বাস করার সময়ে তাদের কোনো অসুবিধা না হয়। ইংলণ্ডের স্বার্থ রক্ষার্থে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী কাজের মতো এটিও তার অন্যতম কর্তব্য। মেয়েরা তাঁর কাছে প্যালেস্টাইনের ম্যাণ্ডেটের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। চিন্তার জগতে জ্যাকসন তাঁর মেয়েদের সম্বন্ধে একটি বাক্য জ্বলন্ত অক্ষরে খোদাই করে রেখেছেন —'Reserved For England'। মেয়েদের সম্পর্কে তিনি যখনই কিছু চিন্তা করেন বা বলেন তখনই তাঁর কল্পনার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—'Reserved For England'। পেট্রোল পাম্পে ক্যালটেক্সের বিজ্ঞাপনের ভাষা যেমন একবার জ্বলে, আবার নেভে, আবার জ্বলে ঠিক তেমনি মিঃ জ্যাকসনের কল্পনার দৃষ্টির সামনে আলো জ্বলছে আর নিভছে, 'Reserved For England' আলোয় উদ্ভাসিত···অন্ধকার···আবার আলোয় আলোয় দীপ্ত—'Reserved For England'। আজও মিঃ জ্যাকসন হাঁটতে হাঁটতে চিন্তা করেই চলেছেন ইয়র্কশায়ারের কথা, ছোট্ট একটা বাড়ির কথা, এরই সঙ্গে সম্পর্কিত আরো অনেক কথা।

এম্প্রেস রোড ধরে চলেছেন মিঃ জ্যাকসন। বাতাসে শীতের আমেজ, নির্জন পথ, ভারী বুটের শব্দ। নেশার আমেজ, রঙীন ফুর-ফুরে মন। মিঃ জ্যাকসন থামেন। সামনে মেয়েদের কলেজ। এখানে থাকেন ওঁর এক প্রেয়সী। কলেজের ক্রীশ্চান শিক্ষয়িত্রী। মন চায়

একবার ও দিকে যেতে। কী একটা ভেবে সিদ্ধান্ত পাল্টান। মনে মনে হাসেন জ্যাকসন,—'না বাড়ি ফেরাই ভালো।' এগিয়ে যান সামনের দিকে। মোড় পেরিয়ে, অল ইণ্ডিয়া রেডিওর বিল্ডিং ছাড়িয়ে এসে পড়েন নিজের বাংলোয়। সান্ত্রীরা কুর্নিশ করে, পা ঠুকে দাঁড়ায়।

* * * *

মিঃ জ্যাকসনের খাস বেয়ারা এসে খবর দেয়,—হুজুর ওঁরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন।

—কাকে কোথায় বসিয়েছো?

—হুজুরের দপ্তরে বসিয়েছি নেহাল চাঁদ খোকরি মহাশয়কে, আর মৌলানা আল্লাহদাদ পিরজাদাকে বসিয়েছি ড্রইংরুমে। কাকে আগে খবর দেব হুজুর?

—খবর দিতে হবে না। তুমি পিরজাদা সাহেবকে ড্রিঙ্কস দাও, আমি মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলতে দপ্তরে যাচ্ছি।

নেহাল চাঁদ খোকরি মহাশয় লাহোরের একচ্ছত্র হিন্দু নেতা। তিনটি সংবাদপত্র, চারটে বাড়ি ও গুজরানওয়ালায় দশ হাজার একর জমির মালিক। বড় ছেলে ইণ্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, ছোট ছেলে কংগ্রেসের এম. এল. এ.। জামাই হিন্দুমহাসভার সেক্রেটারী আর নিজে বেদান্ত সোস্যালিষ্ট। সুচিন্তিত পরিকল্পনায় তিনি নিজের এবং পরিবারের ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় করে রেখেছেন। যুগের পরিবর্তনের দিকে তাঁর দৃষ্টি সদা জাগ্রত। কিন্তু সব পরিকল্পনাই বানচাল হতে বসেছে। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বড়ই গোলমেলে। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় তিনি বেসামাল হয়ে পড়েছেন। মুসলমান চাঁইদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই। মুসলমান হয়ে যাওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। দিশেহারা হয়ে পড়েছেন তিনি। স্বাধীনতার ধুয়া তুলে পাঞ্জাব ভাগ হয়ে যাবে আর তাঁর সর্বস্ব যেখানে সেই লাহোর পড়বে পাকিস্তানে একথা স্বপ্নেও ভাবেননি কোনোদিন। যদি আর কিছুদিন সময় পেতেন তাহলে হয়তো খাজা হাসান নিজামির শরণাপন্ন হয়ে আজমীঢ়ে চলে যেতেন, আধা মুসলমান হয়ে থাকতেন। কিন্তু এখন আর তা

সম্ভব নয়। আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়েছে শহরের আনাচে কানাচে। খুন জখম বোমাবাজি চলছে বেপরোয়াভাবে। জ্যাকসনের কাছে তাই ছুটে এসেছেন তিনি সাহায্য ও পরামর্শের প্রত্যাশায়। জ্যাকসন এই শহরে আসার পর থেকেই তাঁর সঙ্গে পরিচয়।

—ওয়েল মহাশয়, কি খবর?

—আমার জরুরী চিঠিটা পেয়েছিলেন? —নেহালচাঁদের প্রশ্নের মধ্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়।

—হাঁা পেয়েছি।

—এখন তাহলে কি উপায় বলুন। হিন্দুরা ভীষণভাবে বিপন্ন। শাহআলম গেট পুড়ে গেছে। সাবরন পাড়ার হিন্দুরা কেউ বেঁচে নেই। কৃষ্ণনগর, সন্তনগর ও আর্যনগরের হিন্দুদের রক্ষা করে যদি এখনই লাহোর থেকে সরানো না যায় তাহলে তারাও বাঁচবে না। ডি. এ. বি. কলেজে তিন হাজার উদ্বাস্তু আশ্রয় নিয়েছে, সেখানে মাত্র আর দু দিনের র‍্যাশন আছে। এই তো পরিস্থিতি…

নেহালচাঁদের কথা শেষ না হতেই জ্যাকসন প্রশ্ন করেন,—হিন্দুস্থান সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছে?

—একদিন প্লেন থেকে খাবারের প্যাকেট ফেলেছিল ডি. এ. বি. কলেজে। সঙ্গে চিঠি ছিল, তাতে লেখা ছিল,—'তোমাদের লাহোর থেকে সরিয়ে আনার ব্যবস্থা হচ্ছে।' কিন্তু এখনো কিছু হয়নি। অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হচ্ছে। পনেরোশো লরির প্রয়োজন, মাত্র আড়াইশো যোগাড় হয়েছে। সাহেব, অপেক্ষায় অপেক্ষায় থেকে আমরা তো শেষ হয়ে যাবো।

মিঃ জ্যাকসন মুচকি হেসে বলেন,—মজা কি জানেন নেহালচাঁদ মহাশয়, কলকাতার ডিপোতে হাজার হাজার লরি রয়েছে। দিল্লী, ফিরোজপুর, লুধিয়ানা যে কোন জায়গা থেকে গভর্ণমেন্ট লরি কনস্ক্রিপট করতে পারে কিন্তু তারা কিছুই করছে না। লরির ব্যবস্থা করা কোনো সমস্যাই নয়।

—তাহলে আমাদের কি হবে সাহেব? আমরা তো নরকের মধ্যে আছি। ঈশ্বরের দোহাই, সাহেব আমাদের বাঁচান। সবাইকে যদি না পারেন অন্ততঃ আমার পরিবারকে বাঁচান। যে ভাবে হোক আমাদের সাহায্য করুন সাহেব।

নেহালচাঁদ আকুল প্রার্থনা জানিয়ে বলেন,—সাহেব, আমার দুই ছেলে, মেয়ে জামাই, আমাদের রাশিয়ান কুকুর আর আমরা স্বামী স্ত্রী দু জন—এই ক'জনকে প্লেনে অথবা মিলিটারী লরিতে পার করে দেবার ব্যবস্থা করুন। অন্যদের রেলে কিংবা অন্যভাবে পরে ব্যবস্থা করে দেবেন, আগে আমাদের নিরাপদে পালাবার ব্যবস্থা করে দিন।

জ্যাকসন আচমকা প্রশ্ন করে বসেন,—আপনি কতটাকা ব্যয় করতে পারেন?

—টাকা কোনো সমস্যা নয় সাহেব। দশ, বিশ, পঞ্চাশ হাজার, যদি বলেন এখনই দিতে পারি।

জ্যাকসন অনেকক্ষণ চিন্তিত ভাব করে বসে থাকেন তারপর একসময় ধীর স্বরে বলেন,—আপাততঃ আপনি কুড়ি হাজার রেখে যান, দেখি কি করতে পারি। মুসলিম খিদমতগারদের নেতার সঙ্গে কথা বলতে হবে, মনে হয় ব্যবস্থা কিছু একটা করতে পারবো কিন্তু আমি অন্য একটা কথা ভাবছিলাম। লাহোরের ওপর আপনাদের অধিকার কেন ছাড়বেন? হারামজাদা মুসলমানদের সাথে মোকাবিলা করুন।

—সাহেব এ আপনি কি বলছেন? ওদের কাছে মেশিনগান, রাইফেল, পিস্তল রয়েছে। খালি হাতে আমরা কি করে ওদের সাথে মোকাবিলা করবো?

জ্যাকসন চেয়ারটা টেনে নিয়ে নেহালচাঁদের মুখোমুখি বসেন তারপর চোখে বিচিত্র ইঙ্গিত ফুটিয়ে তুলে বলেন,—যদি আপনাদের হাতেও ওই সব অস্ত্রশস্ত্র আসে? Have a peg মহাশয়...

নেহালচাঁদ উত্তেজনায় ফেটে পড়েন। উদ্ভাসিত মুখে বলেন,—আপনি সত্যি বলছেন সাহেব?

মিঃ জ্যাকসন মুখে হাসি ফুটিয়ে বলেন,—আপনি আমার কতদিনের পুরনো বন্ধু, আপনাকে সাহায্য করবো না তো কাকে করবো? তা'ছাড়া আমি তো মনে করি লাহোরের ওপর সত্যিকার অধিকার হিন্দুদেরই। লাহোরের যা কিছু সৌন্দর্য সংস্কৃতি সবই হিন্দুদের অবদান। বাগান বলুন, কলেজ বলুন, সিনেমা, থিয়েটার সব কিছুই তো হিন্দুরাই করেছে। লাহোরের ওপর অধিকার দাবী করতে পারে একমাত্র হিন্দুরাই। সুতরাং হিন্দুদের লাহোর ছেড়ে যাওয়া মোটেই উচিৎ কাজ হবে না। বীরের মতো থাকুন, যুদ্ধ করে থাকুন, আমি আপনাদের পাশে আছি। আপনার লোকবল কত?

নেহালচাঁদ মদের গেলাস তুলে নেন, চুমুক দেন। উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর মুখ। গর্বের সঙ্গে বলেন,—লাহোরের হিন্দুরা একজন নেতাকেই চেনে, একজনের ওপরেই ভরসা রাখে, তার নাম নেহালচাঁদ খোকরি।

—বহুত খুব। জ্যাকসন বেল বাজান। একজন বেয়ারা এসে জ্যাকসনকে ফিসফিস করে কিছু বলে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে আবার কিছু বলে চলে যায়।

জ্যাকসন উঠে দাঁড়ান। নেহালচাঁদকে বলেন,—আপনি এখানে রিল্যাক্স করুন। আধঘন্টার মধ্যে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমি ফোন করে দিচ্ছি। মিলিটারী লরিতে সব সরঞ্জাম এসে যাবে। আমি একজন লোকও সঙ্গে দেব, সে আপনার লোকদের অস্ত্রের ব্যবহার শিখিয়ে দেবে।

নেহালচাঁদ উঠে দাঁড়িয়ে অভিভূতভাবে বলেন, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। তবে আমার ফ্যামিলিকে এখান থেকে সরে যাবার ব্যবস্থাটা আগে করে দেবেন। বাকী হিন্দুরা মুসলমানদের জব্দ করবে।

জ্যাকসন বলেন,—ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি নিশ্চিন্তে পান করুন। আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে তাই না? আপনার

জন্যেই আমাকে আরেকজনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। অস্ত্রশস্ত্রের দাম ড্রাইভারের হাতেই দিয়ে দেবেন।

মিঃ জ্যাকসন চলে যান।

হুইস্কেমে মৌলানা আল্লাহদাদ পিরজাদা পান করে চলেছেন পেগের পর পেগ।

মিঃ জ্যাকসন প্রবেশ করে বলেন,—কি খবর মৌলানা, সব ভালো তো? মৌলানা বলেন,—সাহেব ভালো আর কি করে থাকি? এখন ভালো আছে শুধু পুলিশের লোক। শুনেছি পুলিশের লোক প্রত্যেকে এত সোনা লুট করেছে যে সাতপুরুষকে আর খেটে খেতে হবে না। সাধারণ পুলিশেরই যখন এই অবস্থা তখন আপনার বাড়ি নিশ্চয়ই সোনার ইট দিয়ে গাঁথা হবে। মৌলানা নিজের রসিকতাতে নিজেই হো হো করে হাসতে থাকেন।

—'You big swine' জ্যাকসন মৌলানার পিঠে আদরের চাপড় মেরে বলেন, এবার আসল কথা বলুন।

মৌলানা বলেন,—মডেল টাউনে সব বড়লোক হিন্দু আর শিখদের বাস। দু তিনবার হামলা করেও কিছু ফল হয় নি। ডোগরা সেপাইরা যে কেমন বেয়াড়া তাতো আপনি ভালোই জানেন। তা ছাড়া ওদের কাছে পিস্তল, বন্দুক রয়েছে। এই তো সেদিন সার্কুলার রোডের মুসলমানরা হামলা করতে গিয়েছিল। হিন্দুদের কিছুই হয়নি উল্টে চল্লিশজন মুসলমান মারা গেছে। অবাক হয়ে ভাবি হিন্দুদের কাছে এত অস্ত্রশস্ত্র এল কোথেকে? গরীব মুসলমানরা ওসব পাবে কোথায়? ছোরার ওপর নির্ভর করে এ সব কাজ হয় না।

জ্যাকসন বলেন,—তুমি কি বলতে চাইছ অস্ত্রের যোগান দেওয়ার মালিক আমি? আমার নিজের কাছে থাকলে নিশ্চয়ই দিয়ে দিতাম। আর এ সব সরঞ্জাম পেতে গেলে টাকার দরকার। সম্ভব হলে আমি নিশ্চয় ব্যবস্থা করতাম কারণ আমাকে তো পাকিস্তানেই থাকতে হবে। হিন্দুদের সঙ্গে আমার বনবে

না। ইসলামের সাথে ক্রিশ্চানিটির অনেক মিল। খ্রীষ্টানরা মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে থাকতে পারে কিন্তু হিন্দুদের সঙ্গে কখনই নয়। হিন্দুদের সাথে আমার কখনই মতের মিল হবে না।

—টাকা আমার সঙ্গেই আছে। মৌলানার ঠোঁটে অর্থপূর্ণ হাসি।

জ্যাকসন অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন,—কোথেকে পেলেন?

—ইসলামের নামে, কাফের বধ করার জেহাদ তুলে এক জাগির-দারকে বধ করেছি। এই নিন্ পঞ্চাশ হাজার। যত তাড়াতাড়ি পারেন অস্ত্র যোগাড় করে দিন।

জ্যাকসন বেল বাজান। বেয়ারা প্রবেশ করে। তাকে কাছে ডেকে ফিসফিস করে তিনি কিছু নির্দেশ দেন। বেয়ারা চলে যায়। আবার কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে মিঃ জ্যাকসনকে ফিসফিস করে কিছু বলে চলে যায়।

জ্যাকসন টাকাগুলো গুনে নিয়ে বলেন,—আমার টাকার প্রয়োজন নেই, আপনি টাকাটা লরির ড্রাইভারকে দিয়ে দিবেন। এক ঘন্টার মধ্যে এক লরি অস্ত্র এসে যাচ্ছে। লরি নিয়ে চলে যান, দয়া করে আর বিরক্ত করবেন না। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে এই অস্ত্র জোগাড় করতে, আর দামও খুবই কম, একরকম বিনামূল্যেই পেলেন আপনি। ওদের বললাম, গরীব মুসলমান এত টাকা কোথায় পাবে, তাই ওরা সস্তা করে দিল। আর একটা কথা আপনাকে বলি, এবার আমায় রেহাই দিন। মুসলমানদের জন্যে অনেক করেছি বিনিময়ে কিছুই পাইনি। আপনি বেশ অকৃতজ্ঞ, প্রভাব খাটিয়ে আমাকে লাহোরের সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ করে দিতে পারতেন। কিন্তু কোনো চেষ্টাই করলেন না।

পিরজাদা মিঃ জ্যাকসনের অভিযোগের কোন উত্তর না দিয়ে গেলাস তুলে নিলেন। চুমুক দিয়ে বললেন,—আঃ কী সুন্দর মদ! কোথায় পেলেন?

—পুরনো ফরাসি মদ, এক হিন্দু রাজা উপহার দিয়েছেন। তাঁর রাণীকে নিরাপদে দিল্লী পৌঁছে দিয়েছিলাম।

—রাণী নিশ্চয়ই পরমাসুন্দরী ছিল। ঠোঁটের ওপর বার কয়েক জিভ বুলিয়ে নিয়ে পিরজাদা রসালো কণ্ঠে বলেন,—পুরনো ফরাসি মদের মতো, কি বলেন ?

—জ্যাম সোয়াইন। জ্যাকসন হাসি হাসি মুখে বলেন। তারপর চোখে বিশেষ ইঙ্গিতের ভাষা ফুটিয়ে তুলে বলেন,—আমি তো শুনেছি আপনি নাকি আজকাল রোজই একজন হিন্দু কুমারী…।

—আল্লাহ দেয়। পিরজাদা শব্দের ঢেউ তুলে হাসতে থাকেন। গেলাস তুলে ধরেন চোখের সামনে। মদ ছলকে ওঠে তরল সোনার মতো।

আধঘন্টার ব্যবধানে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই দুটো লরি দুই বিপরীত-মুখী গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হয়ে যায়। মিঃ জ্যাকসন সোফায় শরীরটাকে এলিয়ে দেন, সামনের আর একটি সোফায় জুতোসুদ্ধ পা দুটি তুলে দেন। চুরুট ধরান। ঘন ধোঁয়ার অন্তরালে তাঁর চোখে ভেসে ওঠে ভবিষ্যতের একটি রঙিন ছবি। স্ত্রীকে তিনি বিলেত নিয়ে যাবেন না। স্ত্রীর একেতো বয়েস হয়েছে, তাছাড়া মেয়েদের মতো ফর্সাও নয় সে। চেহারায় ভারতীয় ছাপ বেশ প্রকট স্ত্রীকে নিয়ে তাই তিনি কোন পার্টিতে যান না। স্ত্রীকে ডিভোর্স করবেন। ক্ষতিপূরণ বাবদ মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে দিলেই চলবে।

দুই মেয়েকে নিয়েই তিনি ইংলণ্ডে ফিরবেন। মেয়েরা তাঁর প্রাণ। দুই মেয়ের জন্যে ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত পরিবারের গরীব দুটি পাত্র কেনা যাবে সহজেই। এই ক'বছরে টাকা জমিয়েছেন যথেষ্টই। আর নিজেও তিনি বিয়ে করবেন, সুন্দরী রূপবতী ইংরেজ কাউন্টেস, যাঁর নিজেরও জমিজমা আছে। ফেয়ার হলে টাঙান থাকবে বিখ্যাত ব্যক্তিদের অয়েল পেন্টিং, মাথায় থাকবে সুন্দর তাজ, প্রাচীন বংশমর্যাদার প্রতীক নর্মান তাজ। বিয়ের ছবি ছাপা হবে লণ্ডন টাইমস্‌-এ। খুশির ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাঁর মুখ।

—বেয়ারা…বেয়ারা গলা ছেড়ে ডাকেন মিঃ জ্যাকসন।

বেয়ারা এসে কুর্নিশ করে দাঁড়াতে তিনি প্রশ্ন করেন,—ছোট মেমসাহেব বার্ট থেকে ফিরেছেন?

—হুজুর, বড় মেমসাহেব ফিরেছেন। ছোট মেমসাহেব খবর পাঠিয়েছেন আজ ফিরবেন না। বোধ হয় নাচের প্রতিযোগিতা আছে। উনি আপনাকে দেবার জন্যে এই চিঠিটা পাঠিয়েছেন।

বেয়ারা চিঠি দিয়ে চলে যায়।

মিঃ জ্যাকসন আর এক পেগ গলায় ঢেলে চিঠিটা খোলেন। তাঁর প্রিয়তমা কন্যা রোজির চিঠি।

ডার্লিং পাপা,

তোমার প্রিয়তমা কন্যা রোজি তোমায় চিঠি লিখছে বার্ট নাচঘর থেকে। আজ এখানে প্রতিযোগিতা আছে কিন্তু সিন্থিয়া নাচের প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়নি। ও বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করো এ প্রতিযোগিতায় আমিই প্রথম হবো। ভাবলাম, পুরস্কারটা ছেড়ে দিই কেন? যদিও এ কথা জানাবার জন্য আমি চিঠি লিখছি না। আমার সামনে সুবেশ তরুণ তরুণী রাজহাঁসের মত জোড়ায় জোড়ায় কার্পেটের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। মনোরম আলোর ছটা, অর্কেষ্ট্রার সুরের মায়াজাল গোটা হলকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে রঙিন নেশার আবেশে। যেন চাঁদ আর সূর্য একই সাথে নেমে এসেছে আমাদের পৃথিবীতে। পাপা, আমি কিছুটা শেরি পান করেছি তাই বোধ হয় কিছুটা কবিত্ব করে ফেললাম। তবে শেরি, কবিত্ব কিংবা নাচ এসব মোটেই আমার বক্তব্য নয়। আমি লিখছি আমার বন্ধুর জন্যে, যে এখন আমার সামনের চেয়ারে বসে আছে। ওর চোখে সস্নিগ্ধ হাসি। আমার দিকেই ওর দৃষ্টি। পাপা, তুমি ওকে চেনো না। ওর নাম আনন্দ, হ্যাঁ খাঁটি ভারতীয়।

আনন্দের সাথে পরিচয় হয়েছে তা প্রায় দু বছর হলো। তুমি রেগে যাচ্ছো জানি কিন্তু ওর সঙ্গে পরিচয় থাকলে তুমি রাগ করতে পারতে না। সত্যি বলছি পাপা, ওর ওপর কেউ রাগ করতে পারে না। ও অনেকের চাইতে আলাদা। কী সুন্দর

নাচে। ওর নাচের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন কোনো এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বা ইউরোপিয়ান আমি দেখিনি। আনন্দ্-এর গায়ের রং কালো। তুমি তো জানো কালো রঙের যুবক আমার পছন্দ নয়। তাই যখন প্রথম ও আমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিল আমি তখন ওর সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করেছিলাম। অন্যান্য ভারতীয়দের সঙ্গে আমি যেমন ব্যবহার করে থাকি ওর সঙ্গেও সেই ব্যবহারই করেছিলাম। ও কিন্তু একটুও রাগেনি বরং মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল ওর মুখে। ভারতীয়দের আমি চিরকাল ঘৃণা করে এসেছি কিন্তু আনন্দ্-এর হাসিতে বোধ হয় অমোঘ জাদু ছিল, আমার মনের স্বপ্নে গড়া কেল্লার ভিত্ প্রচণ্ড নাড়া খেল সেই হাসিতে। বড়ো মারাত্মক ওর হাসি, পাপা।

আনন্দ্ ছ'ফুটের মতো লম্বা। সাঁওতালের মতো চওড়া বুক, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো ক্ষীণ কটি আর ঘন কালো চোখে বুদ্ধির উজ্জ্বল দীপ্তি। ও যখন আমার কোমর জড়িয়ে নাচে তখন নাচঘরের সব আলো ম্লান হয়ে যায়। কল্পনায় জেগে ওঠে বাংলার গভীর গহন অরণ্য। সহস্র বৃক্ষের মর্মর ধ্বনি, কচি সবুজ পাতার দোলা, বন্য জন্তুর হুঙ্কার, রক্তে বেজে ওঠে জীবনের আদিম উল্লাস।

নিজেকে তখন মনে হয় অরণ্যবাসিনী. কোন এক ব্যাধের অঙ্কশায়িনী কিম্বা বল্কল পরিহিতা এক ভীল রমণী নেচে চলেছি বনে বনান্তরে।

আনন্দ-এর সঙ্গে যেদিন প্রথম নেচেছিলাম সেদিন আমার যে অনুভূতি হয়েছিল তা-ই তোমাকে জানালাম। এক বছর আগের কথা বলছি, তারও এক বছর আগে ওর সাথে আমার পরিচয়। আনন্দ্ পুরো এক বছর ঘুরে বেড়িয়েছে আমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে, ঘনিষ্ঠ হবার জন্যে। আর আমি একজন যথার্থ এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ের মতো ওর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে এসেছি কিন্তু ওর উৎসাহকে দমাতে পারিনি।

আনন্দ্ গুজরানওয়ালার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে। ও উচ্চ-

শিক্ষিত, বিলেত ঘুরে এসেছে। ওর একটা প্যাকার্ড গাড়ি আছে, এছাড়া কিছু ইংরেজ তরুণীর ছবিও আমাকে দেখিয়েছে যারা ওকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু এ সব আমাকে আকর্ষণ করতে পারেনি। পাকা একটি বছর আমি ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করিনি। সেই সময় ও নাচের আসরে আসতো, আত্মমর্যাদাহীন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের সঙ্গে নাচতো। তেমন কিছু ভালো নাচতো না। তারপর অনেকদিন বার্টে আসতো না। কিন্তু যখন ফিরে এলো তখন ও দুর্দান্ত নাচে। বাধ্য হয়েই একদিন ওর সঙ্গে আমাকে নাচতে হলো। সেই নাচের অভিজ্ঞতা আগেই জানিয়েছি।

নাচের পর আমরা এক টেবিলে এসে বসি। আমি তখন বলতে গেলে সম্পূর্ণ ই সম্মোহিত। আনন্দ্ প্রশ্ন করেছিল,—তুমি আমাকে মানে ভারতীয়দের ঘৃণা কর, তাই না?

আমি বলেছিলাম,—তোমাদের গায়ে বিশ্রী গন্ধ।

আনন্দ্ আমার খুব কাছাকাছি এসে বলে,—কি মনে হচ্ছে তোমার?

আমি ওর শরীরের ঘ্রাণ নিই। আমাকে স্বীকার করতেই হলো এমন সম্মোহনীয় গন্ধের সাথে আমার পরিচয় ছিল না।

আনন্দ্ বললো,—শতকরা পাঁচজন ভারতীয়দের গায়ে দুর্গন্ধ অন্যদিকে প্রায় পঞ্চাশজন ইংরেজের গায়েই দুর্গন্ধ। অস্নানজনিত দুর্গন্ধ কি আর কোলন মেখে দূর করা যায়?

—তোমাদের গায়ের রং কালো?

আনন্দ্ হো হো করে হেসে ওঠে। ওর কালো চেহারায় শুভ্রোজ্জল দাঁতের দীপ্তি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি।

ও বলে,—কি হলো?

—তোমার দাঁত সত্যিই সুন্দর।

—হ্যাঁ ভারতীয়দের দাঁত সাদা আর চকচকে, আমাদের রঙের সাথে মানায় ভালো। রোজি, সৌন্দর্যের অনেক রঙ, নানারঙের সমাহারেই সৌন্দর্যের বিকাশ।—আনন্দের চোখে স্নিগ্ধ হাসি।

হার মানবো না বলেই আমি বললাম,—পাপা বলেছেন তোমরা জোচ্চোর, ঠগ, ঘুষ খাও, খাদ্যে ভেজাল মেশাও, অলস, কাজের উদ্যোগ নেই।

আনন্দ ধীরস্বরে বলতে থাকে,—রোজি, তোমার বাবা পুলিশের লোক। রোজ যাদের থানায় নিয়ে যাওয়া হয় তাদের দেখেই তোমার বাবা ভারতীয়দের সম্পর্কে ধারণা করে নিয়েছেন। আমি যদি স্কটল্যাণ্ডইয়ার্ডে কাজ করতাম তাহলে হয়তো ইংরেজদের সম্পর্কে আমিও একই কথা বলতাম। আর আমরা যদি অলস হতাম, উদ্যোগহীন হতাম তাহলে ইংরেজদের আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে হতো না।

—আমি তোমার কোন কথাই শুনতে চাই না। তোমরা ভারতীয়রা সব শুয়োরের বাচ্চা। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বলি। রাগে কাঁপতে কাঁপতে আমি যখন চলে আসছিলাম তখন ওর হাসিমিশ্রিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

—শোনো, আমি পাঁচহাজার বছরের পুরনো। আমার অনেক কিছু জানা আছে। তোমাকে আমি বশ করবোই।

ওর চ্যালেঞ্জ আমার ভালো লাগেনি কিন্তু মনের গতি বড় বিচিত্র। বোধহয় আমার অজান্তেই ওকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। তাই এই ঘটনার পর থেকে ওর সঙ্গে আমি বন্ধুর মতই ব্যবহার করেছি। ওকে আমার চেয়ে ছোট মনে হয়নি আর কোনদিন। আর যখন আমাদের চার চোখের মিলন হতো তখন আমাকেই প্রথম দৃষ্টি সরিয়ে নিতে হতো। আগেই বলেছি ওর হাসি বড় ভয়ানক। ও যখন আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসে তখন মনে হয় সর্বাঙ্গে যেন কাঁটা ফুটছে। শরীর কেমন যেন অবশ হয়ে আসে। মনে হয় গলায় কে যেন ফাঁস পরিয়ে দিল। এর পর পাঁচ ছ'মাস আমি ওর সঙ্গে নাচিনি। তারপর এলো প্রতিযোগিতার দিন। আমাকে একজন পুরুষ সঙ্গী বেছে নিতে হবে। প্রতিযোগিতায় জিততে হলে ওকে নির্বাচন করা ছাড়া আমার সামনে অন্য কোনো পথ

খোলা ছিল না। বলাবাহুল্য আমরা দু'জনেই পুরস্কার পেলাম। পুরস্কার পাবার পর আমরা একই পাত্র থেকে স্বাস্থ্য পান করি। আনন্দ ইচ্ছে করলে সেদিন আমায় চুম্বন করতে পারতো। আমি গ্রহণ করার জন্যে তৈরি ছিলাম। কিন্তু ও সুযোগ গ্রহণ করলো না। শুধু সুন্দর হাসি উপহার দিল আমায়। ওর হাসিতেই অনেক কিছু পাওয়া যায়। মনে হচ্ছিল ও যেন আমায় চুম্বন করছে। সহস্র বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করে যেন আমায় প্রেম নিবেদন করছে। আমি সেই বন্ধন থেকে কোনোমতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারিনি। আমি ভয় পাই। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ি। ও বোঝে না কেন আমি ওর কাছ থেকে দূরে দূরে সরে যাই। কেন আমি দূরে দূরে থাকি। দূরে থাকলেও আনন্দ আমাকে টানে। আমি বুঝতে পারি না কেন। কোথায় ওর জোর।

আমাদের দু'জনের দেশ আলাদা, ধর্ম আলাদা, আচার ব্যবহার সবই আলাদা তবু কেন ওর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে আমি ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড আবেগ অনুভব করি, বুঝতে পারি না। অনেক বিনিদ্র রজনী আমি কাটিয়েছি শুধু এই চিন্তাতেই। প্রিয় পাপা তোমাকে সব কথা খুলে জানালাম যাতে তুমি তোমার প্রিয় কন্যার মনের অবস্থা বুঝতে পারো, তার সিদ্ধান্ত, তার নতুন জীবনকে গভীরভাবে বুঝতে পারো।

যেদিন থেকে আমি নিজেকে চিনলাম, নিজের মনকে ভালোকরে বুঝলাম সেদিন থেকে আমি ওর সাথে গোপনে মেলামেশা শুরু করলাম। কারণ বার্টের সবাই তখন আনন্দকে রোজির ইণ্ডিয়ান পার্টনার বলতে শুরু করে দিয়েছে। এই সব মন্তব্য সিম্ফিয়ার অসন্তোষের কারণ হতো। তা ছাড়া লোকে বলতো ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর মেয়ে একজন ভারতীয় যুবকের সঙ্গে প্রেম করছে। তোমাকে জড়িয়ে এ সব কথা আমার পছন্দ নয়, তোমার দুর্নাম হয় তা আমি সহ্য করতে পারি না। তাই আমরা মেট্রোতে চলে যেতাম। এখানকার পরিবেশ সম্পূর্ণই ভারতীয়। এখানে আসতো শিল্পী, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ্ সোশ্যালিস্ট এবং

কম্যুনিষ্টরা। প্রায় সবাই খদ্দর পরিহিত। এরা ভারতীয় শিল্প নিয়ে আলোচনা করত। ভারতীয় সাহিত্য, ভারতের কৃষাণ মজুর, দেশ আর জাতিকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই নিয়ে এরা আলোচনা করতো। ইংরেজদের ভারত ছাড়ার কথা, গোটা ছনিয়ার ভ্রাতৃত্ব, মনুষ্যত্ব ও শান্তি প্রতিষ্ঠার কথাও উঠতো। এ সব কথা, এ জাতীয় আলোচনা আমি বার্ট ইনস্টিউটে কখনো শুনিনি। স্কুলে, নিজেদের বাড়িতে কিম্বা আর কোথাও কখনো শুনিনি। এইসব কথা শুনলে পৃথিবীর জন্তে কাজ করতে ইচ্ছে জাগে, মহৎ কিছু করার জন্তে নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রাণ চায়। পাপা, এখন আমি বুঝতে পারছি তুমি আর তোমার পৃথিবী কতটা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, কত অন্ধকার। পৃথিবীর আলো তোমার কাছে এখনো পৌঁছয়নি।

পাপা, তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে, মাম্মাকে সিন্থিয়াকে সবাইকেই ভালোবাসি। কিন্তু তবু তোমাদের ছেড়ে আমাকে অনেক দূরে চলে যেতে হচ্ছে। কারণ পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে পাপা। তোমরা কিন্তু ঈজিপ্টের মমির মতোই প্রাণহীন হয়ে রয়েছ। যাত্নঘরে রাখা প্রস্তরমূর্তির মতোই অচেতন; সুন্দর কিন্তু প্রাণহীন।

বিগত ছ বছরে আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তা আমি তোমাদের জগতের বাইরে এসেই পেয়েছি। তোমার, মাম্মার, সিন্থিয়ার প্রভাবমুক্ত হয়ে। সেই অভিজ্ঞতার কথাই আজ লিখতে বসেছি।

আমি ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে শিখেছি। ভারতীয় খাদ্য খেতে অভ্যস্ত হয়েছি। এদের ভাষা শিখেছি, গান শিখেছি, নৃত্যে, সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেছি। সাড়ি পরলে আমাকে এত সুন্দর মানায় যে ইচ্ছে করে সর্বক্ষণ সাড়ি জড়িয়ে থাকি। এখন আমি ভারতনাট্যম ও কথাকলির প্রাচীন ছন্দকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। ছশো বছরের অন্ধকারের যতটুকু দাগ আমার মনের

ওপর পড়েছিল তা আজ উঠে গেছে। আমি ভারতীয় কন্যা, পাপা।

তুমিও ভারতীয়, পাপা। তুমি, আমি, সিন্থিয়া, মাম্মা, আমরা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা সবাই ভারতীয়। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবে আমাদের অবয়ব ইংরেজদের মতো নয়। আমাদের প্রত্যেকের চেহারায়, রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের ছাপ। আবার বলছি পাপা, তুমি ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো, আমরা সবাই ভারতীয়।

এই দু বছরে ভারতকে আমি নানান দিক থেকে গভীর দৃষ্টিতে দেখেছি। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি এরাও আমাদের মতই ভালো-মন্দে মেশানো। আজকাল আমার জিলাবি, মতিচুর, লাড্ডু খেতে খুব ভাল লাগে। খোয়া আর ডালমুটও বেশ মজার খাবার। আর মোগলাইখানা তো এত ভাল লাগে যে মনে হয় এতদিন অখাদ্য খেয়ে এসেছি। কোরমা, শাম্মি কাবাব, মোর্গা মসল্লাম আর জরদা পোলাও! পাপা, তোমার ওপর খুব রাগ হয়। ষোলো বছর তুমি আমাকে শুধু অখাদ্য স্যুপ খাইয়ে রেখেছ।

পাপা, তুমি মেঘদূতের অনুবাদ পড়েছ? যেদিন আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে যায়, গাছে গাছে ঝোলে হলুদ বরণ থোকা থোকা। ফুল সেইসব দিনে আনন্দ আমায় মেঘদূতের চরণ পড়ে শোনায়। ভ্রষ্টা শেক্সপীয়রের বিরাটত্ব, গেটের দর্শন আর শেলীর প্রেম একত্রে ঘনীভূত মেঘদূতের ছত্রে ছত্রে। যে জাতি এমন কাব্য সৃষ্টি করতে পারে তাকে অ-সভ্য আখ্যা দেওয়া চরম ধৃষ্টতার পরিচয়।

পাপা, ষোলো বছর তুমি আমাকে প্রতারণা করেছ, নিজেকেও প্রতারণা করেছ। ভারতীয়ত্ব থেকে নিজেকে পৃথক ভেবে এসেছ। আপন জাতির উপরেই অত্যাচার করেছ। যখন তাদের পাশে দাঁড়ানো উচিত ছিল, তাদের সেবা করা উচিত ছিল তখন তুমি তাদের উপর নিস্পেষণ চালিয়েছ। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ। আজও তুমি দু পক্ষকেই অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে বিরোধ জিইয়ে রাখছো। আজ আমার চোখ খুলে গেছে। স্বচ্ছ দৃষ্টিতে

আমি সত্যকে দেখতে পাচ্ছি। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোমাদের পৃথিবী থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নেবার।

আজ আমি আনন্দ্-এর সাথে নতুন জীবনের পথে যাত্রা করছি। আনন্দ্ আজ নিঃস্ব। ওর ঘর. বাড়ি, প্যাকার্ড গাড়ি সব পুড়িয়ে দিয়েছে। ওর মা বাবাকেও হত্যা করা হয়েছে। পরনের সার্ট ও প্যান্ট ছাড়া ওর আর কিছু নেই। কিন্তু আছে মন, যা ওর নিজের। আছে আত্মা, যা ওর নিজের অধিকারে, দেশের সভ্যতা ওর আপন। ঘৃণা ওকে স্পর্শ করেনি। ওর মধ্যে প্রতিহিংসা নেই, প্রতিহিংসা ও চায় না। আমরা মনুষ্যত্বের ডাক শুনেছি, স্বর্গের প্রতিনিধিত্ব করবো আমরা এই পৃথিবীতে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদি, রাশিয়ান আর আমেরিকান সবই আমরা একই মাটির সন্তান।

পাপা, তোমার মেয়ে আজ সুতীর সাড়ি পরে উদ্বাস্তুদের শিবিরে যাচ্ছে। আমরা হিন্দুদের কাছে যাবো। মুসলমানদের কাছে যাবো। সকলের কাছেই মিলনের বাণী নিয়ে যাবো। জানি এই উন্মত্ততার পরিবেশে কেউ এখন আমাদের কথা শুনবে না। হয়তো মৃত্যুই আমাদের পরিণাম। হয়তো একাজ আমাদের ধৃষ্টতার পরিচয় হবে, হয়তো আমরা ভুল করছি কিন্তু একাজ যে আমাদের করতেই হবে। হয়তো এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজকে আমি প্রতারণা করছি কিন্তু কে যেন আমায় ডাক দিয়েছে সেই ডাকে সাড়া না দিয়ে পারছি না আমি। কে যেন আমায় বলছে, এ কাজ তোকে করতেই হবে। এগিয়ে চল্, দুশো বছরের গ্লানি মুছে ফ্যাল। তোর সত্য পরিচয় অর্জন কর্। তুই ভারতীয় কন্যা. তোর স্থান নাচঘরে নয়, সেবার বেদীতে।

—রোজি

* * *

মিঃ জ্যাকসন উঠে দাঁড়ালেন। রোজির চিঠি তাঁর হাত থেকে মেঝেতে পড়ে গেল। তাঁর নেশা ছুটে গেছে, তবু কিন্তু পা টলছে, পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে। ঢক ঢক করে দু পেগ গলায় ঢেলে নিলেন তারপর টাই সামলে নিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

স্থির হয়ে তাকিয়ে রইলেন নিজের প্রতিচ্ছবির দিকে। বিড়বিড় করে বলতে থাকেন,—আমি মিঃ জ্যাকসন। আমার মেয়ে রোজি। রোজি আমাকে চিঠি লিখেছে!

চোখের নিচে ঘন কালো ছাপ। আয়নার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হয় তাঁর অবয়বের প্রতিটি রেখায় ভারতীয় ভাস্কর্যের নিদর্শন প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে। এই নাক, এই ঠোঁট ইংরেজদের নয়। চোখ, মুখ, চোয়াল কোনটাই খাঁটি ইংরেজের নয়। একান্তই ভারতীয়, কিছুটা মিশেল রয়েছে এই যা। মিঃ জ্যাকসন চিৎকার করে বলে ওঠেন,—না, না, আমি ইংরেজ। আমার বাড়ি ইয়র্কশায়ারে আমার স্ত্রী ইংরেজ কাউন্টেস, তার মাথায় রোমান তাজ। কেয়ার হলে দাঁড়িয়ে সে আমার জন্তে অপেক্ষা করছে।

মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। মিঃ জ্যাকসন দুহাত দিয়ে তাঁর মাথা চেপে ধরেন। আবার আয়নার দিকে চোখ যায়। আবার সেই ভারতীয় মুখের ছায়া আয়নায় ধরা দেয়। সেই চুল সেই নাক, সেই চোয়াল সেই ভারতীয় চোখ এমনকি ভুরুর তির্যক ভঙ্গিটা পর্যন্ত ভারতীয়। মিঃ জ্যাকসন চিৎকার করে ওঠেন, —না, না, আমি ভারতীয় নই, আমি ইংরেজ, ইংল্যাণ্ড আমার দেশ। কেটে কেটে উচ্চারণ করেন,—ইয়র্কশায়ার ডাবি··· কাউন্টেস···নরম্যান···থোবর্ণ · নাইট···কিং আর্থার···

আয়নায় তখন অনেক ভারতীয় মুখ, তারা উচুস্বরে হাসতে থাকে। রাশি রাশি ভারতীয় মুখ, হাসতে হাসতে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে···মিঃ জ্যাকসন রিভলবার হাতে তুলে নেন ·· ঘোড়া টেপেন · কার্পেটের ওপর মিঃ জ্যাকসনের ভারী দেহটা লুটিয়ে পড়ে। রক্তের ধারা গড়াতে থাকে ওঁর কানের পাশের শিরা থেকে।

বিবি

সিওল শহর জ্বলছে।

একটা পাথরের ভাঙা দেওয়ালের গায়ে দেশলাইর কাঠি ঘষে লিয়াম 'লাকি স্ট্রাইক' সিগারেট ধরিয়ে নেয়। তারপর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চারদিকটা একবার তাকিয়ে দেখে নেয়। ধোঁয়ায় ছেয়ে আছে সিওলের আকাশ। বোমায় বিধ্বস্ত শহরটার দিকে তাকিয়ে খুশিতে ভরে ওঠে লিয়ামের মন। বিধ্বস্ত শহরটায় এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে কাঁচ, ইট, পাথর। দুমড়ানো ইলেকট্রিক পোষ্টে ঝুলছে কোরীয়দের মৃতদেহ। আধপোড়া ছাদহীন দরজা জানালাবিহীন বাড়িগুলো পাঁজর বের করা কঙ্কালের মতো হা করে দাঁড়িয়ে আছে। লিয়ামের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মনে মনে সে মার্কিন বিমান বাহিনীর তারিফ করে। নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে কর্তব্য সমাধা করেছে তারা। 'গুক্‌স'-দের* গর্বের শহর সিওলকে তারা বিধ্বস্ত করে দিতে পেরেছে। কাজটা খুব সহজ ছিল না কারণ কোরীয়দের ভয়ডর বলতে কিছুই নেই লোকগুলো মরতে মরতেও লড়াই করে।

সিগারেট টানতে টানতে লিয়াম দেখতে থাকে। তার দৃষ্টি চলে যায় সেই লোহার কাঠামোর ওপর যার ওপর একদিন গড়ে উঠেছিল বিশাল বিশাল অট্টালিকা। এখানে ছিল আধুনিক সুন্দর সুন্দর বাড়ি। এখানে ছিল শান্তির নীড়, শিশুদের হাসি, কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে থাকতো এইসব গৃহ। রাজপথের দু ধারে ছিল পুরুষদের কর্মস্থল। সব কিছু ধ্বংস করে দিয়েছে মার্কিন বিমান বাহিনী। পরিকল্পনামাফিক গোটা শহরটাকে তারা প্রথমে আটটি বর্গক্ষেত্রে ভাগ করে নেয় তারপর উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম থেকে বোমারু বিমানে আক্রমণ চালায়। তারপর

---

*এশীয়বাসীদের অ-সভ্য বোঝাতে মার্কিনরা এই পরিভাষা ব্যবহার করতো।

চলে পেট্রোলিয়াম জেলি বোমার আক্রমণ। ধ্বংসের চেহারা দেখে পরিতৃপ্ত লিয়াম সাথীকে সম্বোধন করে বলে, বেশ সুষ্ঠুভাবেই সব কাজ সম্পন্ন হয়েছে, কি বল জুস্?

সাথীর আসল নাম কিন্তু জুস্ নয়। তার নাম জোনস্। তার নরম ও সুশ্রী চেহারার জন্তে সবাই তাকে আদর করে ডাকে জুস্। সরলতা মাখানো নরম প্রকৃতির এক তরুণ এই জোনস্। এক মাথা প্ল্যাটিনাম-সাদা চুল, চোখের সবুজ মণিছুটো সাদা পালকে ঢাকা মুরগীর চোখের মতো চিকচিক করে। থুতনির খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে সে বলে,—সুষ্ঠুভাবে হয়েছে ঠিকই কিন্তু যখন আক্রমণ চলে তখন···উঃ ··

লিয়াম কিছু বলে না কারণ তখন তার দৃষ্টি চলে গিয়েছে একটি আধভাঙা তিনতলা বাড়ির ওপর। বাড়ির মাথায় একটি লম্বা দণ্ডের ওপর মার্কিন পতাকা টাঙ্গানো হয়েছে। তারকাখচিত ডোরাকাটা বিশাল পতাকা হাওয়ায় উড়ছে। নাৎসী বিজেতার মতো পরিতৃপ্ত মুখের চেহারা হয়েছে লিয়ামের পতাকার দিকে চোখ রেখে সে সিগারেটে সুখ টান দেয় জোরে দম নিয়ে। হাওয়ায় সিগারেটের ছাই উড়ে গিয়ে পড়ে তার চোখে। দু হাত দিয়ে সে চোখ রগড়াতে থাকে। খক্ খক্ কাশতে কাশতে সে গালি দিতে থাকে অসভ্য এশীয়বাসীদের বিশেষ করে এই কোরীয়দের।

—খতম্ করে দাও, শালা এশীয়দের, বজ্জাত কোরীয়দের। বেশ ছিলাম সিনসিনাটিতে ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট হয়ে। শালাদের জন্তে ছুটে আসতে হয়েছে এখানে।

জোনস্ হাসি মুখে বলে,—এখানে ও তো তুমি কারো না কারোর ইনসিওরেন্স এজেন্ট।

—তার মানে?

—ওই দেখো না। আধপোড়া একটা বাড়ির দিকে জোনস্ লিয়ামের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওই বাড়িতে সাঁটা রয়েছে আমেরিকার বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড। বড় বড় কর্পোরেশন ও

ট্রাস্টের নাম। যেমন, গ্রেট আমেরিকান জেভারেল ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন; 'লাইফ' এবং 'টাইম' পত্রিকা; 'ফিলিপ্‌স কোম্পানী'; 'নিউইয়র্ক কয়লা পরিবহন কর্পোরেশন; সমিতিবদ্ধ'; 'কোকাকোলা; সমিতিবদ্ধ, চিকাগো' ইত্যাদি।

আনন্দে লিয়াম জিভের নিচে আঙুল দিয়ে শিস দিয়ে ওঠে। —আশ্চর্য, এতবড় একটা ব্যাপার আমার নজরে পড়েনি এতক্ষণ। আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠান সব। তাহলে আমরা গাইরা* আসার অনেক আগেই দেখছি এরা আমেরিকা থেকে এখানে এসে ঘাঁটি গেড়ে বসে গেছে।

—হ্যাঁ, কম্যুনিস্ট ও গুক্‌স্‌রা না চাইলেও আমরা এখানে থাকবো। —জুস্‌ ধীর কণ্ঠে বলে

পকেটে হাত ঢোকাতে ঢোকাতে লিয়াম জোর দিয়ে বলে,—আলবৎ। লম্বা দোহারা গড়ন লিয়ামের। মাতৃকুলের দিক থেকে সে আধা জার্মান, আধা আইরিশ। পিতৃকুলের দিক থেকে তার দেহে রয়েছে আটভাগ নিগ্রো রক্ত। আটভাগ জিপসি, আটভাগের দু ভাগ মেক্সিকান রক্ত বাকীটা ফরাসী রক্ত। অর্থাৎ খাঁটি আমেরিকান বলতে যা বোঝায় লিয়াম হলো ঠিক তাই। ট্রুমান ও লিঙ্কিং-এর প্রধান সেনাপতি ম্যাক-আর্থারের ওপর তার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। সেও চায় এশীয়বাসীদের টিট করতে। লিয়াম বাইরে থেকে দেখতে সুস্থ এবং বলিষ্ঠ ভিতরে কিন্তু ভীরু। সঙ্কীর্ণমনা এবং দাম্ভিক। সাথী জুস্‌ও তাই। নোংরাম্বেষী মন, সহজে তারা তুষ্ট হতে চায় না। লিয়াম ও জুস্‌ দুই বন্ধু একত্রে সৈনিক মহলে 'লিয়াম জুস্‌' নামে পরিচিত। তাদের গভীর অন্তরঙ্গতার জন্যেই এই নামকরণ।

সামনের ভাঙা বাড়ির দোতলায় কয়েকজন গাই-কে মস্ত বড় ফেস্টুন টাঙাতে দেখা গেল। তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা:

নিলাম, নিলাম

এমন সুযোগ হারিওনা ভাইরা।

---

*আমেরিকান সৈন্যদের সংক্ষেপে গাই বলা হয়।

কেস্ট্নুর টাক্সিয়ে গাইরা ভিতরে চলে গেল। দেখা পড়ে দুইবন্ধু পরস্পরকে কনুই দিয়ে খোঁচা দেয়। তারপর তারা ছোটে সেই বাড়িটার দিকে। কোরীয় ও মার্কিন সৈন্যদের মৃতদেহ টপকে তারা পৌঁছে যায় সেই বাড়িতে। সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে হলঘরে পৌঁছে তারা দেখে ইতিমধ্যে সেখানে অনেক গাই এসে হাজির হয়েছে। পঞ্চাশ সেন্ট দিয়ে তাদের প্রবেশপত্র কিনতে হয়েছে।

হলের মধ্যে পানমত্ত গাইরা হৈ হল্লোড় শুরু করে দিয়েছে। হল্লোড়ের শব্দ ঢেউয়ের মতো গড়িয়ে যাচ্ছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। হলের এক কোণে মুষ্টিযুদ্ধের মঞ্চের মতো মোটা দড়ি দিয়ে ঘেরা একটি চৌকোণ মঞ্চ তৈরি হয়েছে। মঞ্চের পশ্চিম দিকে একমাত্র প্রবেশ পথে একটি পর্দা ঝুলছে। মঞ্চ খালি।

একজন গাইকে লিয়াম জিজ্ঞেস করে,—এখানে কি হবে। বক্সিং ?

—না।

—তবে কি কোনো খেলা ?

—না।

—সার্কাস নাকি ?

—না।

—তবে কি ? ঝাঁঝালো কণ্ঠে লিয়াম জুনকে ডেকে বলে,—চলো যাই, যত্তোসব ধোঁকাবাজি ব্যাপার।

পাশের গাই এবার জড়িয়ে জড়িয়ে বলে,—নিলাম হবে বলেই তো মনে হচ্ছে।

—কিসের নিলাম। মঞ্চ তো খালি, কোনো জিনিসপত্তর নেই! আশ্চর্য ব্যাপার।

— ঠিকই বলেছ, আশ্চর্যই বটে। তা এই আশ্চর্য যুদ্ধে সবই তো আশ্চর্যের। আশ্চর্য যুদ্ধ, আশ্চর্য মঞ্চ, আশ্চর্য প্রচার, আশ্চর্য যুদ্ধজয়, এতসব আশ্চর্য দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

ঠিক সেই মুহূর্তে মঞ্চের পশ্চিম দিকের পর্দাঘেরা প্রবেশ পথ দিয়ে

একজন আমেরিকানকে মঞ্চের ওপর এসে দাঁড়াতে দেখা গেলো। তাকে দেখে মনে হয় যেন সপ্তদশ শতাব্দীর একজন ক্রীতদাস বিক্রেতা। এক হাতে লম্বা চাবুক অন্যহাতে ছোট্ট একটি ঘন্টি। দেহ ঝুঁকিয়ে, মাথা নুইয়ে, ঘন্টি বাজাতে বাজাতে মঞ্চ থেকে দর্শকদের উদ্দেশ্যে সে চিৎকার করে বলতে থাকে,— শুনুন মহাশয়রা, অ্যাটমের সন্তানেরা! সিওলের যূপকাষ্ঠে শত্রুদের আমরা ঝুলিয়েছি। আজ আমরা বিজয়ী, সবাই আমরা সুখী ও আনন্দিত। এ্যাটমের বরপুত্রেরা, আপনাদের জন্যে এখানে আমরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নিলামঘরের ব্যবস্থা করেছি। এমন অদ্ভুত, এমন মনোহর নিলামের পণ্য দুনিয়ার আর কোথাও আপনারা পাবেন না, একথা আমি হলপ করে বলছি। আপনারা শুধু পকেট উজাড় করে যাবেন। আসুন সবাই. দলে দলে আসুন, বিশ্বের বিচিত্র এই নিলামে অংশ গ্রহণ করুন। অ্যাটমের বরপুত্রেরা আসুন, বাছাই করুন মনের মতো পণ্য জিতে নিন।

ঘন্টি বাজাতে বাজাতে নিলামওয়ালা পর্দার দিকে কিছু ইঙ্গিত করে। পর্দা সরে যায়। কয়েকজন কোরীয় যুবতীকে ভিতর থেকে ঠেলে দেওয়া হলো মঞ্চের ওপর। সঙ্গে সঙ্গেই গাইদের দৃষ্টি আছড়ে পড়লো মঞ্চের ওপর। হলের মধ্যে এতক্ষণ যে হৈ হুল্লোড় চলছিল হঠাৎই সব স্তব্ধ হয়ে গেল। অদ্ভুত, দমবন্ধ নিস্তব্ধতা নেমে এল হলের মধ্যে।

বিবস্ত্র কোরীয় যুবতীরা মাথা নিচু করে মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। পিছমোড়া করে তাদের হাত পা বেঁধে রাখা হয়েছে যাতে লজ্জা নিবারণের ক্ষীণতম চেষ্টাও তারা না করতে পারে। মাথার আলু থালু চুল ঝুলে পড়ে তাদের মুখ ঢেকে দিয়েছে। কোরীয় যুবতীদের দর্শকদের মুখোমুখি অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমেরিকান সৈন্যদের কামনার লোলুপ দৃষ্টির সামনে অসহায় আবরণহীন নারীরা অধোবদনে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের দেহ ঈষৎ কম্পমান। নারী দেহের যা কিছু সৌন্দর্য ও মহত্বের তা আজ বহুজনার কামনা লোলুপ দৃষ্টির সামনে লাঞ্ছিত।

যে গ্রীবায় প্রেমাস্পদের চুম্বনের ঘাম আঁকা থাকতো, যে বক্ষ থেকে শিশুর ওষ্ঠ স্পর্শে ঝরে পড়তো জীবন-সুধা তা আজ অজস্র বুভুক্ষু দৃষ্টির সামনে খুলে ধরা হয়েছে। কামাতুর পাইদের আবিল দৃষ্টির সামনে তুলে ধরা হয়েছে কোরীয় রমণীদের বক্ষ, তাদের নিম্ন দেহ,—কোরীয় মাতার নবজীবনের অঙ্কুর-গর্ভ।

নবজীবনের বীজ রয়েছে এই গর্ভে, আছে বীজকোষ, সুস্থ সুন্দর পরিবেশে যার পরিণতি ঘটতে পারতো নব অঙ্কুরে, নবজীবনের উন্মেষে। আজ সেই সৃষ্টিময়ী নারী বিদেশী বিজেতার সামনে শৃঙ্খলাবদ্ধ, নগ্নদেহা, চরমতম অপমানের সম্মুখীন। শতাব্দীর ইতিহাসের পাতা উল্টোলে দেখতে পাই যখনই জনগণের স্বাধীনতা লুণ্ঠিত হয়েছে, পদদলিত হয়েছে তাদের সম্মান, তখনই নারীত্বের চরম অসম্মান হয়েছে। নারীত্বের এই নির্মম অবমাননা আমরা দেখেছি চেঙ্গিস খাঁর শিবিরে, দামাস্কাসের বাজারে, গ্রীসের নারী বিক্রয়ের হাটে, রোমের এ্যাম্ফিথিয়েটারে, আমেরিকার দক্ষিণী রাষ্ট্রের নিলামের বাজারে। দেখেছি এই সেদিন হিটলারের নাৎসী বাহিনীর হাতে নারীর ওপর নৃশংস অত্যাচার। এই অত্যাচার, অপমান সেখানেই ঘটে যেখানে বিজেতা নৃশংস অত্যাচারী হয়ে ওঠে। মনে হয় এদের সভ্যতা ও কৃষ্টির লক্ষণই যেন নারীত্বকে অসম্মান করা।

মঞ্চের ওপর ওই যে বিবস্ত্র নারীরা অধোবদনে দাঁড়িয়ে আছে তাদের কণ্ঠে যেন ধ্বনিত হচ্ছে এক ব্যথাতুর মায়ের চিরন্তন প্রশ্ন :

—তোরাই না জন্মেছিলি আমার গর্ভে? আজ তোরা মায়ের বস্ত্র কেড়ে নিয়েছিস? শিশুদের পুড়িয়ে মারছিস? বৃদ্ধের বুক চিরে ফেলছিস বেয়নেট বিঁধিয়ে। এই অপকর্ম করার জন্যেই কি এসেছিলি এই সুন্দর পৃথিবীতে? স্নিগ্ধ প্রেমের পরশ পাওয়ার জন্যে তোদের মনে কি একবারও আকাঙ্ক্ষা জাগে না, কিম্বা সঙ্গীত সরোবরে ডুব দিতে? তোদের কি ইচ্ছে হয় না কিছু সৃষ্টি করতে, একটি বই লিখতে, কিংবা একটি সুর সৃষ্টি করতে। কখনো কি মনে হয় না একটি ফুল তুলে সরল নিষ্পাপ হৃদয়ের কাউকে উপহার দিই? ক্ষণিকের জন্যেও কি

তোদের মনে প্রশ্ন জাগে না যে যা করছি তাতে নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দিতে পারবো না?

কিন্তু অপমানিত, লাঞ্ছিত নারীর এ প্রশ্নের উত্তর ওরা দেবে না যেমন দেয়নি প্রাচীন কালের অত্যাচারীরাও।

ঘরের সেই দমবন্ধ পরিবেশ ভঙ্গ করলো হঠাৎই একজন শিস্ দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরাও সুরু করে দিল হুল্লোড়, অট্টহাসি, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী ও মন্তব্য। একজন গাই চেঁচিয়ে বললো:

—আর দেরী কেন, শুরু করে দাও নিলাম। এই মেয়েটির জন্যে আমি এক ডলার দাম দিচ্ছি। নাও কাজ শুরু করে দাও, টাকা নিয়ে মেয়েটাকে আমার কোলে ছুঁড়ে দাও।

নারীবিক্রেতা হাঁক দিল,—নিলাম। নিলাম, এক ডলারে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে সুন্দরী কোরীয় তরুণী। এক ডলার···এক ডলার···

—দুই ডলার।

—তিন ডলার পঞ্চাশ সেণ্ট।

শুরু হয়ে গেল নিলামের কাজ। নিয়ম অনুযায়ী কুড়ি ডলারের ওপর কেউ ডাকতে পারবে না। টাকা যদি না থাকে তো টাইপিন, হাতঘড়ি, ফাউণ্টেন পেন দিয়েও ডাকা চলতে পারে, দাম হিসেবে ওগুলিও গ্রহণীয়। নিলামের হাতুড়ির ঘা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে মেয়ে বিক্রি হয়ে যায় তাকে তখন ক্রেতার দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। দর্শকদের মধ্য থেকে ক্রেতা ছুটে এসে সেই মেয়েকে নিয়ে শুরু করে দেয় নাচ কিংবা ভীড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে মেয়ে নিয়ে সে চলে যায় কোনো নিরিবিলি স্থানে।

উত্তেজিত ভাবে প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে লিয়াম। জুস্ হাসি হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে বলে,

—ধীরে বন্ধু, ধীরে, অত গরম হয়ে উঠো না।

—বিরক্ত করো না, এদের মধ্যে সব থেকে যে মেয়েটি ভালো দেখতে তাকেই আমি কিনবো।

—বুঝেছি, তুমি এদের মধ্যে জ্যাকেলের মতো মেয়ে খুঁজছো।

লিয়াম ঝাঁঝালো কণ্ঠে লুকুকে ধমক দিয়ে বলে,—হ্যাজেল আচে-র বিকার মেয়ে তারওপর সে আমার প্রেমিকা। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ভবিষ্যতে হ্যাজেল সম্পর্কে ভেবেচিন্তে মন্তব্য করবে।

দুই বন্ধুর পাশে বেঁটে খাটো একজন গাই দাঁড়িয়ে ছিল। সে মন্তব্য করলো, :

—আমি তো কোনো তফাৎ দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাজেল, ব্যাসেল, ইসাবেলার সঙ্গে তফাৎ কোথায় এদের ?

ঘুষি বাগিয়ে লিয়াম বলে ওঠে,—সাবধান, এ জাতীয় কথা আমি বরদাস্ত করবো না বলে দিচ্ছি।

লোকটি নির্লিপ্ত স্বরে বলল,—আমার আর ভালো লাগছে না এসব। বড় ক্লান্ত মনে হয়। যুদ্ধ আমার ভালো লাগে না, আমি ঘরে ফিরে যেতে চাই।

লিয়াম বিদ্রূপের খোঁচা দিয়ে বলে,—ও তোমার বুঝি এসব ভালো লাগছে না। তবে বাছাধন এখান থেকে কেটে পড়ো। বরং গির্জা টির্জা খুঁজে নিয়ে উপাসনা করোগে যাও। হ্যাঁ, যদি পারো তো কিছুটা ছাগলের দুধ খেয়ে নিও। ন্যাকা কোথাকার।

হঠাৎ মঞ্চের দিক থেকে একটা চিৎকার শুনে সবাই সচকিত হয়ে ওঠে। নারীবিক্রেতা একটি মেয়ের পিঠে চাবুক কষিয়ে দিয়েছে। হাত বাঁধা মেয়েটি তখনো চেষ্টা করছে অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে। সে চিৎকার করে অত্যাচারিতদের অভিসম্পাত দিচ্ছে, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে প্রতিবাদ করছে। তাম্রবর্ণ ক্রোধদৃপ্ত মুখখানি যেন একটি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা। কালো চুলের ঢল নেমে এসেছে তার কাঁধ বেয়ে। মন-মাতানো সুন্দরী মেয়েটি। মেয়েটির নগ্নদেহে আর একবার চাবুক পড়তেই লিয়াম কেমন যেন অস্থির হয়ে ওঠে। মেয়েটির রূপ সে গিলে খেতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে বলে ওঠে :

—ওর জন্যে কুড়ি ডলার।

অনেকগুলি মুখ লিয়ামকে দেখতে থাকে। লিয়াম গর্বোদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। হলের আর এক প্রান্ত থেকে সার্জেন্ট কার্টন

বলে ওঠে :

—কুড়ি ডলার এবং আমার হাতঘড়ি।

সমস্ত ঘর তখন উত্তেজনায় কাঁপছে। দুজন ক্রেতার প্রতিযোগিতা দর্শকদের মনে উত্তেজনার খোরাক যোগায়। কার্টনের চেহারায় ফুটে উঠেছে ষাঁড়ের গোঁ। শুরু থেকেই সে সৈনিকবৃত্তিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। হৃদয়হীন, মানব-দ্বেষী, দাম্ভিক লোকটি। ঘাড়ে গর্দানে ষাঁড়ের মতো দেখতে, মুষ্টিযোদ্ধার মতো বড় মাথা আর মনে প্রাণে নীচ প্রকৃতির। লিয়ামের ডাক শুনে সে বলে :

—ঠিক আছে, আমি আগের দরের সঙ্গে আমার চেনটিও ধরলাম।

নারীবিক্রেতা চিৎকার করে বলতে থাকে, - এই যে বিকিয়ে গেল সস্তায় কোরীয় সুন্দরী · বিশ ডলার···একটা হাতঘড়ি···একটা রূপোর চেন ··একটা ফাউন্টেন পেন···জলের দরে সুন্দরী কোরীয় যুবতী ·

প্যান্টের বেল্ট খুলতে খুলতে লিয়াম চেঁচিয়ে বলে এই নাও আমার চামড়ার বেল্ট, রূপোর বকলস লাগানো। আমার কাছে আর আছে কৌজি কিট্ ব্যাগ। দরকার হলে তাও দিয়ে দেব, ওই মেয়ে আমার চাই।

হলঘরে হাসির ঢেউ উঠলো। লিয়ামের জেদ দেখে কার্টনও হেসে ফেলে। মঞ্চ থেকে ছুঁড়ে দেওয়া হলো মেয়েটিকে লিয়ামের কাছে। লিয়াম তাকে জড়িয়ে ধরতেই মেয়েটি লিয়ামকে কামড়ে দেয়, খামচি কাটে, এলোপাথাড়ি ঘুষি মারতে থাকে। লিয়াম মেয়েটিকে শক্ত করে চেপে ধরে বেদম মারধোর করে কাবু করে ফেলে।

হঠাৎ একজনের দরাজ কণ্ঠস্বর শুনে সবাই থমকে যায়। সকলের দৃষ্টি চলে যায় মঞ্চের দিকে। মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে একজন লম্বা চেহারার নিগ্রো। দীর্ঘ দুটি বাহু প্রসারিত করে নিগ্রোটি উদাত্ত কণ্ঠে বলতে থাকে,—এ কাজ এখুনি বন্ধ করতে হবে। সহ্য করা যায় না এই নিষ্ঠুর অমানবিক কাণ্ডকারখানা। আমি বলছি এ খেলা বন্ধ করে দাও।

একসঙ্গে অনেকে ক্রোধে ফেটে পড়ে। চিৎকার করে তারা বলতে থাকে,—নোংরা নিগারটাকে বের করে দাও।

নিগ্রো যুবকটি তখনো বলতে থাকে,—না না, আমাকে তোমরা বের করে দিতে পারো না। আমার কথা তোমাদের শুনতেই হবে। ভাইসব, এই জঘন্য নিলাম বন্ধ করে দাও।

নিগারটার স্পর্ধা তো কম নয়। একজন মন্তব্য করে।

নিগ্রো সৈনিকটি বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তার মনের মধ্যে উদ্দীপ্ত চিন্তাভাবনা খেলতে থাকে। তাকে কেমন অভিভূত দেখায়। মঞ্চের ঘেরা দড়িটা শক্ত করে ধরে একটু ঝুঁকে সে বলতে থাকে :

—বন্ধুগণ, আমার মনের সব কথা হয়তো এখন তোমাদের গুছিয়ে বলতে পারবো না তবু সংক্ষেপে কয়েকটি কথা তোমাদের কাছে নিবেদন করতে চাই : আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে, অন্তর্বিপ্লবের সময়ে এবং তারও আগে আমাদের দেশে এই জাতীয় নিলামের বাজার ছিল। সেই অন্যায়ের জন্যে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে আমাদের। মহাত্মা এ্যাব্রাহাম লিঙ্কন···

—নোংরা নিগারটা কম্যুনিষ্ট বুলি ছড়াচ্ছে। লাথি মেরে ফেলে দাও ওকে নিচে—গলা টিপে ধরে মুখ বন্ধ করে দাও। সমবেত ধিক্কার, চিৎকারে নিগ্রো যুবকটির কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায়।

নিগ্রো যুবকটি গলার স্বর আরো চড়িয়ে বলতে থাকে,—আমার কথা তোমাদের শুনতেই হবে, ভাইসব। বিশ্বাস করো আমি কম্যুনিষ্ট নই। লক্ষ লক্ষ আমেরিকানদের মতই আমি একজন সাধারণ আমেরিকান নাগরিক। আমার নাম জো স্মিথ। নিউইয়র্ক শহরের হার্লেম স্ট্রীটের বাসিন্দা আমি। আমার মা কাজ করেন এক লণ্ড্রীতে। আমার ছোট ভাই খবরের কাগজ বিক্রী করে। আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসি, তার নাম জেন। সেও থাকে হার্লেম স্ট্রীটে তার মা বাবার সঙ্গে। আমার জেনের মতই এই কোরীয় মেয়েরা। এঁদের সঙ্গে পাষাণ ব্যবহার করা তোমাদের পক্ষে উচিৎ কাজ হচ্ছে না,

বন্ধুগণ। সাময়িক মোহের বশে তোমরা এমন কাজ করতে যাচ্ছো। আমি জানি বন্ধু তোমরা প্রত্যেকেই মর্যাদাসম্পন্ন এবং সজ্জন।

কার্টন চিৎকার করে বলে,—নিগারটা কম্যুনিষ্টদের মতো কথা বলছে ওকে খতম করে দাও।

—না, না, বন্ধু, আমি কম্যুনিষ্ট নই। মার্কসের লেখা পড়ার আমার সুযোগ হয়নি। আমি শুধু পড়েছি পবিত্র বাইবেল গ্রন্থ। জীবনে বহুবার অনাহারে আমাকে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছে কিন্তু তবু আমি কোনোদিন কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে হাত মেলাইনি। আমি আজ তোমাদের যে কথা বলছি তা আমি নিউইয়র্কের একজন শ্বেতাঙ্গ পাদ্রীর কাছে শুনেছি। তিনি আমাকে বলেছিলেন: দুনিয়ার সৎ ব্যক্তি মাত্রেই মেয়েদের শ্রদ্ধা করে। কারণ তারা আমাদের মা, আমাদের বোন আমাদের মেয়ে। আমাদের প্রিয়া। মেয়েদের শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা আমাদের আত্মাকে শ্রদ্ধা করতে শিখি। আমরা যেন ভুলে না যাই মেয়েরাই সৃষ্টির ধারয়িত্রী, সভ্যতার ধাত্রী।

লিয়াম অধৈর্য হয়ে ওঠে। সে চিৎকার করে বলতে থাকে,—এই নিগারটা পাক্কা কম্যুনিষ্ট। কম্যুনিষ্ট না হলে এসব কথা বলে? ওকে এখনো কেন এ সব কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে? ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দাও। এই, তোর যদি জীবনের প্রতি মায়া থাকে এখনই মঞ্চ থেকে নেমে আয়।

—না বন্ধু, আমার আরো কিছু বলার আছে। তোমাদের শুনতেই হবে আমার কথা। আমি ইতিহাস পড়েছি। ইতিহাস পড়ার ফলেই আমি বুঝতে পারছি আমরা, আমার দেশবাসীরা কী ভয়ঙ্কর সর্বনাশা পথে পা বাড়িয়েছে। দুশো বছর আগে তোমাদের পূর্বপুরুষরা আফ্রিকার উপকূলে জাহাজ ভিড়িয়েছিল। আমার পূর্বপুরুষদের পিতৃভূমি সেই আফ্রিকা। সবুজ টিয়া, নীল হ্রদ আর জিরাফের গায়ের ঝিকিমিকি রঙের খেলা যেখানে সেই অরণ্য-গহন আফ্রিকা তারা নেমে এল আফ্রিকার মাটিতে তারপর যে ভাবে মজবুত ফাঁদ, খেদা-তে হাতির দলকে খেদিয়ে আনা হয় সেইভাবে তারা আফ্রিকার

সরল বাসিন্দাদের ধরে ধরে জাহাজের খোলে বোঝাই করে নিয়ে গেল ভিন দেশের নিলামের বাজারে। হাজার হাজার লাখো লাখো কৃষ্ণকায় মানুষ হলো ক্রীতদাস। আজো দেখছি সাবেক কালের মতো মানুষ বিক্রির নিলামের বাজার, সেই ক্রেতা, সেই চাবুক। ভাইসব, বিশ্বাস করো সেই চাবুকের দাগ আমার হৃদয়ে কেটে বসে আছে। সেই অন্তর্দাহের জ্বালাতেই আমি আজ তোমাদের সামনে ছুটে এসেছি। আজি জানি এই পাপের ফলেই উত্তর ও দক্ষিণী রাষ্ট্রের মধ্যে কালো রঙের দুস্তর সমুদ্রের সৃষ্টি হয়েছিল। আবার নতুন করে পাপের পারাবার সৃষ্টির প্রয়াস কেন? আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই এই জাতীয় নিলাম বেশিদিন চলবে না, চলতে পারে না। সেই সাবেকী আমলে ও যেমন বন্ধ হয়েছিল, একালে ও তেমনি বন্ধ হবে। মানুষ বিক্রেতাদের চরম শাস্তি পেতে হবে। দক্ষিণী রাষ্ট্রের দাস বিক্রেতাদের, রোম, দামাস্কাস, গ্রীস, কার্থেজ এমনকি এই সেদিনের বার্লিনের অত্যাচারীদের ও চরম দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে। এখনকার মতই সেকালেও মানব বিদ্বেষীদের গর্ব, ঔদ্ধত্য আকাশ মাটি কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তাদের পরিণতি কী হয়েছিল বন্ধুগণ তোমরা সবাই তা জানো। বন্ধুগণ, আমি তোমাদের সতর্ক করে দিতে এসেছি। একবার খোলা চোখে এশিয়ার দিকে তাকিয়ে ছাখো। এশিয়ার মানুষ জেগে উঠেছে। এখান থেকে নিলামের বাজার তোমাদের এবার গোটাতেই হবে, ভাইসব।

·· সট্ সট্ সট্···তিনটি বুলেট একই সঙ্গে ছুটে যায়···।

জো শিথের প্রশস্ত বুকে গিয়ে বিঁধলো সেই তিনটি বুলেট। বিশাল বৃক্ষের মতো শিথের দেহটি ক্ষনিকের জন্যে কেঁপে উঠেই আছড়ে পড়লো মঞ্চের দড়ির ওপর। তার মাথাটি ঝাঁকুনি খেয়ে একধারে হেলে পড়লো, যেভাবে দু হাজার বছর আগে যীশুখৃষ্টের মাথা হেলে পড়েছিল সেই ভাবেই। দড়িটা ছিঁড়ে গেল। শিথের ভারী দেহটি ছিটকে এসে পড়লো হল ঘরের মেঝেতে। ক্ষণিকের স্তব্ধতা তারপরেই কয়েকজন গার্ড এসে শিথের মৃতদেহটি টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে

হলের বাইরে ফেলে দিয়ে এল। আবার সুরু হলো নিলামের ডাক।

এক ডলারে একটি মেয়ে, একটি হাতঘড়ির বিনিময়ে একটি মেয়ে, একটি আংটির বিনিময়ে একটি মেয়ে। এই ভাবে পণ্যের মতো এক একটি মেয়ে বিক্রি হয়ে যায়। এক সময় বেচা কেনা শেষ হয়ে যায়, মঞ্চ খালি হয়ে যায়। মঞ্চের পিছনে টাঙানো আমেরিকার সুবৃহৎ জাতীয় পতাকাটি শোভা পেতে থাকে। তারকাখচিত ডোরাকাটা পতাকা। হ্যাঁ ডোরাকাটা!

নিলাম শেষ হয়ে গেলে লিয়াম, জুস্ ও কার্টন পাশের একটি ঘরে গিয়ে তাস খেলা সুরু করে। তিনজনই তাদের কোলে তাদের কেনা নগ্নদেহা মেয়েকে বসিয়ে তাস খেলতে থাকে। তিনটি মেয়েই শান্ত-ভাবে বসে থাকে। এমনকি লিয়ামের কেনা সেই তেজস্বিনী মেয়েটিও। কিছুক্ষণ খেলার পর কার্টন বিরক্ত বোধ করে। তাস ফেলে দিয়ে সে বলে—এই একঘেয়ে খেলা আর ভালো লাগছে না। নতুন কিছু খেলা যাক।

জুস্ জিজ্ঞেস করে,—নতুন খেলা? কি খেলার কথা বলছো?

—একই খেলা শুধু নিয়মটা আলাদা। এ খেলায় গোলাম বিবির চাইতে বড়।

—সে কি? তাস খেলায় সব সময়েই তো গোলাম বিবির চাইতে ছোট।

—না। আমি যে খেলার কথা বলছি তাতে গোলামই বড়। ভারি মজার খেলা।

—কে শিখিয়েছিল এ খেলা? লিয়াম জিজ্ঞেস করে।

—বিগত যুদ্ধে এক নাৎসী বন্দীর কাছে শিখেছিলাম। কার্টন বলে।

—তাহলে তোমার নতুন নিয়মেই এসো খেলা যাক। লিয়াম বলে।

—কিন্তু চারজন না হলে তো খেলা যাবে না। আমরা আছি তো তিনজন।

—তিন নয়, আমরা আছি দু'জন। কিন্তু এই কোরীয় মেয়েগুলি এত নিরেট যে ওরা আমাদের খেলা বুঝবেই না। মন্তব্য করে জুন্।

কার্টন দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে চতুর্থ ব্যক্তির খোঁজে। দেখতে পেল একজন সাধারণ সৈনিক একটি কোরীয় মেয়েকে নিয়ে এদিকে আসছে। কোরীয় মেয়েটি কিন্তু বিবস্ত্রা নয়, তার গায়ে মিলিটারী কোট চাপানো। সার্জেন্ট কার্টন রাগে ফেটে পড়ে। রাগে চিৎকার করে প্রশ্ন করে,

—মেয়েটার গায়ে লম্বা কোটটা কার?

—আজ্ঞে আমারই।

—এখনই খুলে নাও। হুকুম দ্যায় সার্জেন্ট কার্টন।

দুর্বল কণ্ঠে সৈনিক বলে,—ভারি বিশ্রী লাগে।

—কোট খুলে নাও, খুলে নাও—সার্জেন্ট কার্টনের কণ্ঠে অফিসারের আদেশের সুর।

সৈনিক দুটি পা ঠুকে অভিবাদন জানায় তারপর কোটটি খুলে নিয়ে মেয়েটিকে নিরাবরণ করে দ্যায়।

কার্টন খুশি হয়ে বলে,—এসো এবার একজন ভদ্র মার্কিনের মতো আমাদের সঙ্গে তাস খেলায় যোগ দাও।

সৈনিক যোগ দিল তাস খেলায়। সৈনিকের নাম সিম্পসন।

কার্টন প্রশ্ন করে,—সেই স্বনামধন্য সিম্পসনদের সঙ্গে কি তোমার কোনো আত্মীয়তা আছে?

—হ্যাঁ আছে।

—কি রকম সম্পর্ক?

—খুবই সাধারণ সম্পর্ক। এই যেমন প্রভু আর গোলাম, সেই রকম সম্পর্ক। ওঁরা হলেন আমার মালিক আর আমি তাদের গোলাম। দুনিয়ার সর্বত্র আমরা ছোট সিম্পসনরা বড় সিম্পসনদের গোলাম।

—দেখ ছোকরা এখানে ওই সব লাল মার্কা কথাবার্তা বললে ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। আর যেন ওই ধরনের কথাবার্তা না

গুনি। যদি গুনি তাহলে তোমাকেও ওই কম্যুনিষ্ট লিয়ারটার মতো দাওয়াই দিতে হবে। এবার এসো খেলার কথা বলি। আমি হলাম রুহিতনের গোলাম আর আমার কোলের মেয়েটি রুহিতনের বিবি। লিয়াম হলো হরতনের গোলাম আর ওর মেয়েটি হলো হরতনের বিবি। জুস্ হলো ইস্কাপনের গোলাম আর ওর মেয়েটি ইস্কাপনের বিবি। তোমার আর পছন্দ করে নেবার কিছু রইল না।

সিম্পসন বলে,—ঠিকই বলেছেন গোলাম গোলামই তার আবার পছন্দ অপছন্দের কি আছে?

সার্জেন্ট কার্টন আদেশের সুরে বলে,—ঠিক আছে এবার তাস ভাঁজতে শুরু করো।

তাস খেলা সুরু হয়ে যায় হলের ভিতরে। হলের বাইরে তখন অদ্ভুত নিথর নিস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে মেসিনগানের গুলির শব্দে সেই নৈঃশব্দ চির যায়, পরমুহূর্তেই আবার সেই মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধতা। সিওল দখল করেছে আমেরিকানরা কিন্তু কোরীয়রা প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়েই যাচ্ছে।

তাস ভেঁজে নিয়ে কেটে চাল দেওয়া হলো। সিম্পসনের ভাগ্য ভালো প্রথমেই সে দেখিয়ে দিল হরতনের গোলাম। সুতরাং লিয়ামের মেয়েটি স্থানান্তরিত হলো সিম্পসনের কোলে। তার কোলে এখন দুটি মেয়ে। খেলা চলতে থাকে। কোনো সময় কার্টনের কোলে ও দুটি মেয়ে চলে আসে। জুস্ তো একবার তিনটি মেয়েই পেয়ে বসলো। কিন্তু আশ্চার্য সার্জেন্ট কার্টন একবার ও হরতনের গোলাম পেল না। লিয়ামের কোলের সেই আশ্চর্য সুন্দরী ও তেজস্বিনী মেয়েটিকে একবারও নিজের কোলে বসাতে না পেরে কার্টন মনে মনে ক্রমশঃ ক্ষেপে ওঠে। খেলা অনেকক্ষণ চলে। কার্টন মনে মনে ভাবে, ব্যাপার কি। কেন সে একবারও হরতনের গোলাম পাচ্ছে না। অন্ততঃ একবারের জন্যেও তাকে হরতনের গোলামের তাস পেতেই হবে। কার্টনের জেদ চেপে যায়।

বাইরে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শুনে হলের মার্কিন সৈন্যরা ছুটে

দেখতে যায়। হলের মধ্যে তখন চুপচাপ শান্ত হয়ে বসে থাকে কোরীয় যুবতীরা। অনেক দূরের একটি সুবৃহৎ অট্টালিকার ওপর বিমান থেকে বোমা পড়ছে। গত সাতদিন ধরে এই অট্টালিকার ভিতর থেকে কোরীয় সৈন্যরা মার্কিনদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাচ্ছিল। ভূমিসাৎ হয়ে গেছে সেই বিশাল অট্টালিকা। লিয়ামের মুখ খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অত্যন্ত নিপুণভাবে কাজটি সমাধা হয়েছে দেখে মার্কিন বিমান বাহিনীর তারিফ করতে করতে লিয়াম ফিরে আসে তাদের টেবিলে।

ফিরে এসেই তার চোখে পড়ে নিজের কেনা সেই সুন্দরী তেজস্বিনী মেয়েটির ওপরে। দেখে মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে আছে। অদ্ভুত রহস্যময় সে চাহনি। এক লহমার জন্যে সে চোখ জ্বলে উঠেছিল। পরমুহূর্তেই সে শান্ত স্বাভাবিক। লিয়ামের কোলে শান্ত অনুগতের মতো বসে থাকে। সন্দেহের রেখাপাত হয় লিয়ামের মনে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্দেহের মেঘ কেটে যায় কারণ তার কোলের মেয়েটি সহ অন্যান্য তিনটি মেয়েই শান্ত, চুপচাপ। সন্দেহ কেটে গেলে আবার খেলা সুরু হয়।

রাত গভীর হয়। নিস্তব্ধ নিশীথিনী। সিম্পসন বলে ওঠে,—এবার খেলা বন্ধ করো। আর ভালো লাগছে না। ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

কার্টন অনুরোধ করে—আর এক হাত হোক।

কামাতুর দৃষ্টি দিয়ে সে লিয়ামের কোলের মেয়েটিকে গিলে খেতে থাকে।

এটাই শেষ খেলা তো?—প্রশ্ন করে লিয়াম।

—হ্যাঁ এবারই শেষ।—কার্টন বলে।

সিম্পসন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার তিনজন পার্টনারের দিকে ফিরে ফিরে তাকায়। তারপর বলে,—এবার খেলা শেষ হলে আর খেলবো না। আর তাস কিন্তু এবার আমি ভাঁজবো।

—কেন এবার তো আমার পালা।—লিয়াম প্রতিবাদ করে ওঠে।

—তা জানি। তবু তোমাকে অনুরোধ করছি আমাকেই ভাঁজতে দাও।

—আচ্ছা।—লিয়াম বলে।

সিম্পসন তাস ভাঁজে।

লিয়াম বলে ওঠে আবার ভাঁজো। সিম্পসন আবার ভাঁজে। কার্টন বলে,—আমি কাটবো।

—আচ্ছা কাটো।—লিয়াম বলে। তাস তুলে নেয় কার্টন। তারপর বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে সে তাসটি সকলের সামনে মেলে ধরে। হরতনের গোলাম!

অনেকক্ষণ তাসের টেবিল ঘিরে গভীর নীরবতা বিরাজ করে। লিয়াম মেয়েটিকে কোল থেকে নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। প্যাণ্ট ঠিক করতে করতে দাঁতে দাঁত চেপে বলে,—এর মধ্যে চালাকি আছে।

—তার মানে? কার্টন প্রতিবাদ করে।

—কারণ আমার হাতে ও আছে হরতনের গোলাম। তাসটি দেখিয়ে সে বলে,—তাস ভাঁজার আগেই আমি এই তাসটি তুলে নিয়েছিলাম।

সিম্পসন বলে,—আমি কিন্তু ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম, এই খেলাই চলবে। সেই জন্যে আমিও হাত সাফাই করেছিলাম। যুদ্ধে আসার আগে আমার জীবিকাই ছিল হাত সাফাই।

হঠাৎ একজন গাই এসে বলে,—পালাও, পালাও, নিজেদের জীবন নিয়ে যেভাবে পারো পালাও। কোরীয় গেরিলারা এ বাড়িতে ঢুকে পড়েছে।

চকিতে সবাই তাস, মদের বোতল, কেনা মেয়ে মানুষ সব আকর্ষণ ছেড়ে পালাতে সুরু করে।

কিন্তু পালাবার পথ বন্ধ হয়ে যায়। 'থামো'—কোমল কিন্তু কঠিন আদেশের স্বর শুনে তারা থমকে দাঁড়ায়। পিস্তলের মুখের সামনে তারা দাঁড়িয়ে। লিয়ামের কেনা সেই সুন্দরী তেজস্বিনী কোরীয় যুবতী পিস্তল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে পথ আগলে। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে

সে বলে ;—খেলার মধ্যে ও লালের প্রতি তোমাদের বিতৃষ্ণা, ঘৃণা। কিন্তু তোমরা ভুলে যাও যে হরতনের বিবির রং সব সময়েই লাল। এমনকি তোমাদের আমেরিকায় তৈরি তাসেও।

পিস্তল তুলে সে গুলি করে প্রথমে লিয়ামকে তারপরে কার্টনকে। সঙ্গে সঙ্গে জুস্ গুলি ছোড়ে তার দিকে। হলের মধ্যে হলের বাইরে তখন গুলির শব্দ। প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা ···হৈ হৈ···· গুলির শব্দ··· পালানোর হিড়িক · তারপর আবার নিস্তব্ধতা।

গেরিলারা বাড়িটি ঘিরে ফেলেছে। সব ক'টি পথে মেসিনগান বসিয়ে তারা প্রস্তুত হয়ে বসেছে। একদল গেরিলা এসে লিয়াম, কার্টন, জুস্, সিম্পসন ও অন্যান্য মার্কিন সৈন্যদের মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে যায়। তিনজন কোরীয় যুবতীর মৃতদেহও তারা নিয়ে যায়। মার্কিন সৈন্যদের গুলিতে এরা প্রাণ হারিয়েছে। আহত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছে সেই সুন্দরী তেজস্বিনী কোরীয় যুবতী।

একজন কোরীয় গেরিলা যুবক সৈনিক মাথা নিচু করে তাকে দেখে হঠাৎ চিনতে পেরে ঝুঁকে পড়ে বলে,—মিং মিনস, চোখ খুলে ভাখো চিনতে পারো কিনা। আমি হাক্-কু।

মিস মিং অনেক কষ্টে চোখ মেলে তাকায়। আনন্দে বেদনাশ্রু গড়িয়ে পড়ে তার চোখ থেকে। স্মিত হাসি ফোটে মুখে। অনেক কষ্টে মিস্ মিং তার ডান হাতটা তুলে হাক্-কু'র কাঁধের ওপর রাখে। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বলে :

—হাক-কু ক্ষমা করো আমায়। গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিতে বলেছিলে তুমি, আমি রাজি হইনি। দেশের বিপদের গভীরতা তখন আমি বুঝতে পারিনি। আমি এখন বুঝতে পারছি, কিন্তু বড়ো দেরীতে বুঝলাম হাক-কু। আমাকে ক্ষমা করো তুমি।

ধীরে ধীরে মিস মিং-এর চোখের পাতা বুজে আসে।

—কিন্তু এখানে তুমি কি করে এলে মিং? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। সিওল থেকে তুমি তো অনেক দূরে ছিলে?

—আমাকে ওরা ধরে নিয়ে এসেছিল আরো চারশো কোরীয়

মেয়ের সাথে। হাক-কু'র চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে।

—অস্তাজদের মতো আমাকে ও বাড়ি থেকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে এসেছিল। জামা কাপড় খুলে উলঙ্গ করে একটা লরিতে তুলে এখানে নিয়ে এসেছিল। তারপর নিলাম ঘরে এনে আমাকে বিক্রি করা হয়েছিল··আমাকে কিনে তাসের জুয়ার বাজি···। কেঁদে ফেলে মিস মিং।

হাক-কু, আমাদের ওরা গরু ভেড়ার মতো বিক্রি করে··আমরা মানুষ নই, নারী নই, ওদের তাসের জুয়ার বাজি।

—হাক-কু'র কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়, কিছু বলতে পারে না, শুধু চোখ দুটি জ্বলে ওঠে।

প্রিয়জনের দেহ সংলগ্ন হয়ে মৃত্যু পথযাত্রী মিস মিং-এর মুখে আনন্দের রেখা ফুটে ওঠে, ঠোঁটে দেখা যায় পরিতৃপ্তির ক্ষীণ হাসি। আরেকটি হাত হাক-কু'র গলায় রেখে বলে :

—দেশের জন্যে আমি অন্ততঃ একটা কাজ করতে পেরেছি। আমার মার্কিন ক্রেতা প্রভুকে তারই পিস্তল দিয়ে খতম করে দিয়েছি। কোলে বসিয়ে যখন জুয়া খেলছিল তখন সন্তর্পনে তার পিস্তল তুলে নিয়েছিলাম, টের ও পায়নি।

মিস মিং-এর ঠোঁটের হাসিটি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হাক-কু'র প্রস্তর কঠিন মুখও নমনীয় হয়ে ওঠে। দু'হাত বাড়িয়ে সে নিজের শক্ত হাতের তেলোতে মিং-এর ছোট্ট মাথাটি তুলে ধীরে ধীরে বলতে থাকে :

—আমি জানতাম মিং তুমি একদিন নিজের ভুল বুঝতে পারবে এবং গেরিলা বাহিনীতে যোগ দেবে। সেদিন যদি যোগ দিতে তাহলে ···। কথা শেষ করে না হাক-কু। একটু পরে বলে,—জানো মিং, যখন যে অবস্থায় থেকেছি, মাটির নিচে গভীর ট্রেঞ্চে, পাহাড়ের অন্ধকার গুহায়—বসে বসে তোমার কথা ভেবেছি। আবার রাগও করেছি তোমার ওপর। এক এক সময় মন থেকে তোমার চিন্তা দূর করে দিতে চেয়েছি এই বলে এমন একটা ভীরু মেয়েকে আমি

ভালবাসি কি করে ?

মিং-এর মুখ থেকে হাসির রেখাটি এতক্ষণে মুছে গেছে। কালো ছায়ার ঘোমটা যেন ঢেকে দিয়েছে তার মুখ। ভাঙা ভাঙা স্বরে সে বলে,—আজ আমায় ক্ষমা কর তুমি। ফুলের দাম তো দিয়ে গেলাম আমি জীবন দিয়ে

আরো কিছু বলতে চেয়েছিল মিং কিন্তু পারলো না। মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে এসে তার কথা আটকে দিল। হাক-কু রক্ত মুছে দিল। অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর মিস মিং আবার বলল,— সেদিনের কথা মনে পড়ে ? যেদিন তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা আমাদের গ্রামে সেই পপলার গাছের নিচে। তুমি একখানা কাগজ আমার সামনে মেলে ধরে সই দিতে বলেছিলে।

– হ্যাঁ শান্তির আবেদন পত্রে সই সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম। তখন কি জানতাম যে আমেরিকানরা আমাদের দেশে এত তাড়াতাড়ি মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা সুরু করে দেবে।

—সেদিনের কথা মনে পড়ে ? তখন বসন্তকাল। ফুলে ফলে ভরা ছিল গাছ।

হাক-কু'র মুখে হাসি ফোটে। আস্তে আস্তে মিং-এর মাথায় ঠোঁট স্পর্শ করে আদর জানিয়ে বলে,—হ্যাঁ তুমি সেদিন খোপায় ফুল গুঁজেছিলে।

মিস মিং-এর চোখ বুজে এসেছে, কণ্ঠস্বর আরো ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ধীরে অতি ধীরে সে বলে,—সেদিন ছিল সপ্তমীর রাত, দূর থেকে ভেসে আসছিল বাঁশির সুর। আমরা বসেছিলাম গাছের নিচে। তুমি কি যেন বলবে বলবে ভাবছিলে, ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলে না। হঠাৎ কাছাকাছি কোনো বাড়ি থেকে শিশুদের হাসি আর কলধ্বনি ভেসে এল আমাদের কানে। আর ঠিক তখনই তুমি ভাষা খুঁজে পেয়েছিলে। মনে পড়ে ?

—হ্যাঁ গো সবই মনে আছে। তখনো মার্কিন দস্যুরা আমাদের দেশ জ্বালিয়ে দেয়নি।

অনেক কষ্টে মিং সামান্ত চোখ মেলে তাকায়। অদ্ভুত এক দৃষ্টি সে চোখে। অতি কষ্টে ভাঙা ভাঙা স্বরে বলে,—কয়েকদিন আগে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। শান্তির নীড় রচনা করেছি আমরা। ছোট্ট সংসার ···তুমি আর আমি মেঝের ওপর হামা দিয়ে খেলছে আমাদের ছোট্ট শিশু··দেয়ালের গায়ে বুদ্ধদেবের ছোট্ট ধ্যান গম্ভীর মূর্তি আমাদের বাড়ির সামনে বাগানে ফুলে ফুলে হাসি ছড়াচ্ছে। আমি রেধেঁছি সুগন্ধি চালের ভাত · আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে ছিল সেই গন্ধ -

হাক-কু'রও মনে পড়ে অনেক সুখ স্মৃতি। মুহূর্তে চোখের সামনে থেকে কালো পর্দাটা সরে যায়। জ্বলে ওঠে যৌবনের প্রদীপশিখা পূর্ণ গৌরবে। পরমুহূর্তেই সেই প্রদীপ নিভে যায়, আবার ঘনান্ধকার সেই ভারী পর্দাটা পৃথিবীর সব আলো ঢেকে ছায়। হাক-কু অনুভব করে মিং-এর হাত বেয়ে উঠে আসছে হিমেল শীতলতা। মাথা ঝাঁকানি দিয়ে সে নিজের সম্বিৎ ফিরিয়ে আনে। তাকায় মিং-এর চোখের দিকে। পলকহীন স্থির দৃষ্টিতে মিং তাকিয়ে আছে তারই দিকে। কিন্তু মিং-এর দৃষ্টিতে সেই শিহরণ জাগানো আলো আর নেই। নেই সেই স্বপ্ন দেখার চোখ। সে স্বপ্ন দেখতো ছোট্ট এতটুকু বাসা, ফুল, শিশু, পৃথিবীর বুকে নিত্য নতুন বসন্তের আগমন। হাক-কুর দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। কঠিন হাত দিয়ে সে চোখের জল মুছে ফেলে। তারপর পরম মমতার পরশ দিয়ে সে প্রিয়তমার চোখের পাতা নামিয়ে দেয়। গায়ের কোটটি খুলে প্রিয়তমার প্রাণহীন দেহটিকে ঢেকে দিয়ে সোজা উঠে দাঁড়ায়। অনেকক্ষণ পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। শেষ দেখা। তারপর সৈনিকের সপ্রতিভ ভঙ্গিতে সেনাপতিকে স্যালুট জানাবার ভঙ্গিতে স্যালুট জানিয়ে হলঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

* * * *

হিমশীতল গহন গভীর রাত। মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ। হিমেল হাওয়ায় আকাশের তারাও যেন কাঁপছে। মাঝে মাঝে মেশিনগানের শব্দ রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে গুঁড়ো করে দ্যায় কিন্তু তারপর আবার নিস্তব্ধতা।

হাক-কু'র মন জুড়ে রয়েছে মিং আর তার দেশের চিন্তা। দেশের ওপর নেমে এসেছে বিপদের কালো ছায়া। হাক-কু ভাবছিল এই মুহূর্তে কোনো দূর দেশে হয়তো কতো মানুষ অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে সুখনীড়ের মাধুর্য উপভোগ করছে, তারা কি আর জানে কোরীয়রা নিজেদের রক্ত বিসর্জন দিয়ে শান্তির জন্যে আবেদন করছে? মনের এই প্রশ্নের উত্তরের জন্যে সে অপেক্ষা করতে থাকে। হঠাৎ কোনো গেরিলার ট্রেঞ্চ থেকে মেসিন গানের কাটা কাটা শব্দ ভেসে আসে। রাত্রির নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে পড়ে। হাক-কু'র কঠিন মুখ দীপ্ত হয়ে ওঠে। সোনাদানা সোনার মতো মেসিন গানের গুলি শুনতে শুনতে সে মনে মনে বলে,--ওরা আমাদের ভেবেছে কি? গরু ভেড়া? খেলার তাস? কোরিয়ার দেশভক্ত সন্তান আমরা, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাধ্য কি আমাদের মাতৃভূমি দখল করে রাখে?

পেশোয়ার এক্সপ্রেস

পেশোয়ার স্টেশন ছেড়ে আসতেই আমি একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলাম। যে সব যাত্রীদের নিয়ে আমি চলেছি তাদের মধ্যে অধিকাংশই শিখ ও হিন্দু উদ্বাস্তু। পেশোয়ার, হাতিমর্দান, কোহাট, চারসরা, খাইবার, লাণ্ডিকোটাল, বান্নু, নওসেরা, মানসেরা প্রভৃতি সীমান্ত প্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এইসব উদ্বাস্তুরা এসেছে। পেশোয়ার স্টেশনে এইসব উদ্বাস্তুরা অত্যন্ত অসহায় বোধ করছিল যদিও মিলিটারী অফিসাররা সব দিকে নজর রেখে পাহারা দিচ্ছিল। আমি যখন পঞ্চনদীর দেশের দিকে রওনা হলাম, আমার পদ-চক্র যখন চলতে শুরু করলো তখনই তারা নিরাপদ বোধ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

যাত্রীদের মধ্যে কিছু হিন্দু পাঠান উদ্বাস্তুও রয়েছে। হিন্দু হলেও অন্যান্য পাঠানদের তুলনায় কিন্তু তাদের কিছু আলাদা মনে হবে না। মুসলমান পাঠানদের মতই এই লোকগুলিও লম্বা চওড়া এবং শক্ত সমর্থ। মুখে তাদের রুক্ষ পুশতু ভাষা। পরনে তাদের কারো লুঙ্গি, কারো সালোয়ার এবং লম্বা পাঞ্জাবি। প্রতিটি কামরার দরজায় দু'জন করে বেলুচি সৈন্য রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছিল। এরা উদ্বাস্তু পাঠানদের মেয়েদের দিকে মাঝে মাঝেই হাসি হাসি মুখে তাকাচ্ছিল। এদের তাকাবার ভঙ্গিতে মেয়েরা আতঙ্কিত বোধ করছিল।

এইসব পাঠানরা হাজার বছর ধরে পুরুষানুক্রমে যে দেশে বাস করে এসেছে, সেই দেশ, তাদের মাতৃভূমি ছেড়ে আজ তারা পালিয়ে চলেছে কোন্ এক অজানা দেশে। পাহাড়ী কাঁকর মাটির পরিবেশেই তারা শক্তিমান হয়ে উঠেছে। তুষারগলা ঝরণাধারায় তারা তৃষ্ণা মিটিয়েছে। সূর্যকরস্নাত দ্রাক্ষাফলের রসে তারা পুষ্টিলাভ করেছে। হঠাৎই তারা জানতে পারলো তাদের মাতৃভূমি পরভূমে পরিণত হয়েছে এবং তাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। তারা আজ উদ্বাস্তু। কিছু অর্থ ও মেয়েদের সম্মান বাঁচিয়ে চলে আসতে পেরেছে এইটুকুই তাদের

সান্ত্বনা। দুর্ভাগ্যের তাড়নায় সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা আজ মাতৃভূমি, নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে। প্রস্তরভূমির সন্তানদের নালিশ, সবিস্ময় প্রশ্ন যেন মূর্ত হয়ে উঠছে তাদের প্রতিটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ও চাহনির মধ্যে। তাদের দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে যেন উচ্চারিত হচ্ছে,—"মা গো, তোমার সন্তানদের কেন এমন করে তাড়িয়ে দিলে? দ্রাক্ষাকুঞ্জের ফলের মতো যেসব ছেলেমেয়েরা তোমার বুকে বেড়ে উঠেছিল তাদের কেন এমন করে ফেলে দিলে মাগো?"

* * * *

উপত্যকার ওপর দিয়ে তীব্র গতিতে আমি ছুটে চলেছি। আমারই সঙ্গে চলেছে উদ্বাস্তুর দল। প্রতিমুহূর্তে তারা পিছনের দিকে বেদনামাখা দৃষ্টিপাত করছে। প্রিয় মালভূমি, নিম্নভূমি, গিরিসঙ্কট, নদীনালা একে একে তাদের চোখের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে। এইসব পরিচিত দৃশ্যাবলীর ওপর শেষমুহূর্তে তারা মমতামাখানো দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে। ভগ্নহৃদয়ে তারা পরিচিত এই প্রতিবেশের কাছ থেকে অশ্রুসজল চোখে চিরবিদায় নিচ্ছে। তাদের দৃষ্টিপথে যা কিছু এসে পড়ছে, তা সে যত সামান্যই হোক, তুলে নিয়ে তারা বুকের মণিকোঠায় লুকিয়ে রাখছে। কী জানি ওদের দুঃখকষ্ট বোধহয় আমার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে তাই বোধহয় আমার পায়ের চাকাগুলো যেন ক্রমশঃই ভারী ও আড়ষ্ট হয়ে উঠছে। আমি আর ছুটতে পারছি না, প্রতিমুহূর্তেই আমার আশঙ্কা হচ্ছে এই বুঝি আমার গতি স্তব্ধ হয়ে যায়।

এইভাবেই পৌঁছলাম হাসান আবদাল স্টেশনে। এখানেও উদ্বাস্তুর ভীড়। পাঞ্জা সাহেব থেকে এসেছে শিখ উদ্বাস্তুরা। পুরুষদের কোমরে ঝুলছে লম্বা কৃপাণ তবু কিন্তু মুখগুলি ভয়ে ত্রাসে রক্তহীন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। আর এদের শিশু ও নারীদের চোখে অজানা আশঙ্কার কালো ছায়া নেমে এসেছে। ভয়ার্ত চোখে তারা এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। আমাকে দেখার পর তারা যেন নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে

গেল। আমার গাড়ির কামরায় হুটোপুটি করে উঠে পড়লো তারা।

এই নতুন উদ্বাস্তুদের মধ্যে ওই যে লম্বা লোকটিকে দেখছো, ওর বাড়ি ঘর সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আর ওই যে কামরার এক কোণে লোকটি জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে ওর পরনের জামাকাপড় ছাড়া আর সবই ফেলে আসতে হয়েছে। বেচারা জুতোজোড়াও আনতে পারেনি। ওর পাশে যে লোকটি বসে আছে সে কিন্তু ভাগ্যবান। লোকটি সব কিছুই আনতে পেরেছে এমনকি ভাঙা খাটিয়াটি পর্যন্ত। আর ওই যে লোকটিকে দেখছো মুখে একটিও কথা নেই, বিবর্ণ মুখ সে কিন্তু নিজের প্রাণটি ছাড়া আর সবকিছুই খুইয়ে এসেছে। ওর মুখটি কে যেন সেলাই করে দিয়েছে। ও মুখে আর কোনোদিনই বোধহয় কথা ফুটবে না। এই মূক লোকটির পাশেই একটিলোক অহরহ লম্বা চওড়া কথা বলে চলেছে। কথায় কথায় মুসলমানদের গলা কেটে ফেলছে। আশ্চর্য, এই লোকটির কিন্তু কিছুই খোয়া যায়নি কারণ তার কানাকড়িটিও ছিল না কোনোদিন।

কামরার দরজায় সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বেলুচি সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে। তাদের চোখে মুখে কেমন যেন পরিতৃপ্তির হাসি।

তক্ষশিলায় পৌঁছলাম। এখানে আমাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা হলো। স্টেশন মাস্টার গার্ডকে বললেন, আশেপাশের গ্রামগঞ্জ থেকে হিন্দু উদ্বাস্তুরা এদিকে আসছে তাদের তুলে নিয়ে তবে গাড়ি ছাড়া হবে। অতএব আমাকে প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো। এই ফাঁকে যারা গ্রাম থেকে পালিয়ে আসার সময় কিছু খাবারদাবার আনতে পেরেছিল তারা খাওয়াদাওয়া শুরু করলো। শিশুরা যারা এতক্ষণ বিষণ্ণ মুখে জড়োসড়ো হয়ে বসে ছিল তাদের মুখে হাসি ফুটলো। কিশোরী ও যুবতী মেয়েরা যারা এতক্ষণ মুখ লুকিয়ে বসে ছিল তারা তাদের লজ্জানম্র চোখ তুলে জানলার বাইরে দৃষ্টি মেলে দিল। বৃদ্ধদের মধ্যে যাদের কাছে হুঁকো রয়েছে তারা বেশ শব্দ করে তামাক টানতে লাগলো। এই খুশীর হাওয়া হঠাৎ-ই স্তব্ধ হয়ে গেল একটা অতি-পরিচিত আতঙ্কের ধ্বনি শুনে। দূরে ঢোলের কড় কড় শব্দ শুনতে

গেল সবাই। সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। কেউ কেউ অবশ্য তখনো স্টেশন মাস্টারের কথায় আস্থা রেখে ভাবছিল বোধহয় উদ্বাস্তুর দল আসছে, তারই শব্দ শুনছে তারা। শব্দটা যখন কাছে এগিয়ে এল তখন তাদের আশা অবশ্য চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল কারণ ঢোলের কড় কড় শব্দের সঙ্গে বহু কণ্ঠের উল্লাসধ্বনিও শুনতে পাওয়া গেল। বিকট শব্দের ঢেউ কিছুক্ষণ পরে স্টেশনের খুব কাছাকাছি এসে আছড়ে পড়লো। ঢোলের শব্দ এখন আরো তীক্ষ্ণ ও কর্কশ। কয়েক পশলা গুলি বর্ষণের শব্দও শুনতে পাওয়া গেল। কিশোরী ও যুবতী মেয়েরা তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করে বেঞ্চির তলায় লুকিয়ে পড়লো।

যারা ভেবেছিল হিন্দু উদ্বাস্তুরা আসছে তারা কিছু ভুল করেনি কারণ সত্যিসত্যিই হিন্দু উদ্বাস্তুরাই আসছে তবে তারা কেউই জীবিত নেই, তাদের মৃতদেহ মুসলমানরা বয়ে নিয়ে এসেছে। ঘর বাড়ি ছেড়ে যারা পালাচ্ছিল তাদের হত্যা করে মুসলমানরা কাফেরদের মৃতদেহগুলি কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এসেছে। প্রায় দুশোটি মৃতদেহ। মৃতদেহগুলি বেলুচি সৈন্যদের জিম্মায় তুলে দিয়ে মুসলিম জনতা দাবী জানালো মৃতদেহগুলি হিন্দুস্থানে পৌঁছে দিতে হবে। বেলুচি সৈন্যরা জনতার দাবী হাসিমুখে মেনে নিল। মহান দায়িত্ব হিসেবে এই ভার তারা গ্রহণ করলো। মৃতদেহগুলি বেলুচি সৈন্যরা প্রতিটি কামরায় ভাগ করে শুইয়ে দিল। তারপর মুসলিম জনতা এক পশলা গুলিবর্ষণ করে স্টেশন মাস্টারকে আদেশ করলো গাড়ি ছেড়ে দিতে।

প্রতিটি কামরায় জীবিত ও মৃত যাত্রী নিয়ে আমি আবার যাত্রা শুরু করলাম। কিন্তু কিছুটা এগোবার পরই আবার বাধা পেলাম। চেন টেনে কে বা কারা যেন আমাকে থামিয়ে দিল। আশেপাশের গ্রামের মুসলমান জমিদাররা এগিয়ে এসে বেলুচি সৈন্যদের কাছে দাবী জানালো তাদের গ্রামের প্রায় দুশোজন হিন্দু পালিয়েছে সুতরাং তাদের ক্ষতিপূরণ করতে হবে। তাদের কোটা পূরণ না করলেই নয়। সুতরাং তাদের দাবী বিভিন্ন কামরা থেকে দুশোজন হিন্দু শিখ উদ্বাস্তুকে নামিয়ে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। বেলুচি সৈন্যরা

এইসব পশ্যমাত্ত মুসলমানদের দেশাত্মবোধের পরিচয় পেয়ে খুবই খুশি হলো। তারা ছশোজনকে কামরা থেকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে দিল।

একজন মুসলমান জমিদার হুঙ্কার দিয়ে আদেশ করলো,—এই কাফেররা, লাইন দিয়ে দাঁড়া এখানে।

লোকগুলিকে ততক্ষণে মৃত্যুর হিমশীতলতা স্পর্শ করেছে, প্রায় সবাই তখন ভয়ে অর্ধমৃত। আদেশ অনুযায়ী লাইন দিয়ে দাঁড়াবার মতো ক্ষমতা তখন আর তাদের নেই। মুসলমানরাই ওদের ধরে ধরে দাঁড় করিয়ে দেয়। ছশোটি জীবন্ত মৃতদেহ রক্তপিপাসুদের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে।

বেলুচি সৈন্যরা মুসলিম জনতার সাহায্যে এগিয়ে আসে।

পনেরোজন কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে যায়। তাদের আর আঘাত করার প্রয়োজন হলো না। মাটিতে পড়ে গিয়ে তারা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

হায়, তক্ষশিলা!

আরো কুড়িজন মাটিতে লুটিয়ে পড়লো……

এই সেই তক্ষশিলা যেখানে অবস্থিত ছিল এশিয়ার সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়। অগুনতি ছাত্র হাজার বছর ধরে এশিয়ার এই বিদ্যাপীঠে মানবসভ্যতার প্রথম পাঠ নিয়েছিল।

আরো পঞ্চাশজনকে গুলি করা হলো···

এই সেই তক্ষশিলা যেখানকার যাদুঘরে এখনো গেলে দেখতে পাওয়া যাবে অপূর্ব মর্মরমূর্তির সংগ্রহ, শিল্পকলার অতুলনীয় স্বাক্ষর, দুর্লভ ভাস্কর্যের নিদর্শন···আমাদের মহান সভ্যতার প্রদীপ সেখানে প্রজ্জলিত···যে ঐতিহ্যের আলোয় আমরা আলোকিত।

আরো পঞ্চাশজন···

এই তক্ষশিলার যাদুঘরের পিছনেই ছিল সিরকাপের বিস্তীর্ণ ক্রীড়া উাঙ্গন···একটি সুপ্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ এখনো সেখানে বিদ্যমান।

আরো তিরিশজন···

এই সেই তক্ষশিলা যেখানে কনিষ্কের রাজধানী ছিল। এখান

থেকেই শান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করেছিলেন তিনি।

আরো কুড়িজন…

এই অঞ্চলে একসময় বুদ্ধের প্রেমময় বাণী প্রচারিত হয়েছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুকেরা সত্য সুন্দর ও মানবপ্রেমের এক নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছিলেন জনসাধারণকে।

ছশো মানুষের অবশিষ্ট কয়েকজন প্রতীক্ষায় পল গুনতে থাকে… এখানেই একদিন ইসলামের অর্ধচন্দ্র, ভ্রাতৃত্ব, সমতা ও মানবতার মহান বাণী বহন করে এনেছিল।

শেষ কয়েকটি মানুষের জীবনও একসময় শেষ হয়ে গেল।

আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ধ্বনি উঠলো।

আল্লাহো আকবর।

আল্লা তুমি মহান।

অবশেষে রক্তাক্ত প্লাটফরম আমি পরিত্যাগ করলাম। রওনা হলাম গন্তব্যস্থানের দিকে। কিন্তু আমি ঠিকমতো চলতে পারছিলাম না। আমার চলার চাকার প্রতিটি আবর্তনে আমি অনুভব করছিলাম চাকাগুলি যেন পিছনে যাচ্ছে।

ট্রেনের প্রতিটি কামরায় তখন মৃত্যুর ছায়া নেমে এসেছে। কতগুলি জীবন্ত মৃতদেহ যেন বসে আছে শায়িত মৃতদেহগুলির পাশে। শিশুদের সরব কান্না ও স্ত্রীকণ্ঠের চাপা কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাচ্ছি। স্বামীদের ক্ষতবিক্ষত দেহ জড়িয়ে কতো স্ত্রী অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে কামরার মধ্যে। আর আমি ভয়ে ত্রাসে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছি। পৌঁছলাম রাওয়ালপিণ্ডি স্টেশনে।

এখানে আমার প্রতীক্ষায় কোনো উদ্বাস্তু নেই। কয়েকজন মুসলমান যুবক কুড়িজন বোরখায় ঢাকা মেয়েদের নিয়ে একটি কামরায় উঠলো। যুবকদের সকলের হাতেই রাইফেল, কয়েকজনের হাতে কয়েক বাক্স গোলাগুলি। খানিকটা এগোতেই ঝিলাম ও গুজরখানের মাঝে এক জায়গায় আমাকে চেন টেনে থামানো হলো। বোরখায় ঢাকা মেয়েদের এখানে টেনে নামানো হলো। তারা হঠাৎ বোরখা

খুলে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বললো,—আমরা মুসলমান নই, আমরা হিন্দু, শিখ, এরা আমাদের জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে।

মুসলমান যুবকরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। তারা বলতে থাকে,—হ্যাঁ, এরা আমাদের লুটের মাল। আমরা যা খুশি তাই করবো। দেখি কার হিম্মৎ আছে আমাদের বাধা দেয়।

দুজন হিন্দু পাঠান কামরা থেকে লাফিয়ে পড়লো। তারা হিন্দু মেয়েদের রক্ষার জন্ম এগিয়ে যেতেই বেলুচি সৈন্যরাই তাদের শেষ করে দিল। আরো কয়েকজন এইভাবেই নিজেদের জীবন বিসর্জন দিল। তারপর মুসলমান যুবকেরা উল্লাসে ধ্বনি দিতে দিতে মেয়েদের নিয়ে লাইনের ধারে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল। মানুষের কাণ্ডকারখানা দেখে লজ্জায় আমি কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ছুটলাম। তখন আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানাচ্ছিলাম আমার লৌহ-ফুসফুস যেন ফেটে চৌচির হয়ে যায়। যে গহন অরণ্য এতবড়ো লজ্জাকর ঘটনার নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে যেন পুড়ে খাক্ হয়ে যায়, আমার মনের জ্বালার আগুন সবকিছুকে ভস্ম করে দিক।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছি লালা মুসার দিকে। কামরাগুলির ভিতর তখন মৃতদেহগুলি থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে বেলুচি সৈন্যরা স্থির করলো মৃতদেহগুলি চলন্ত গাড়ি থেকে ফেলা দেওয়া হবে আর এ কাজ তারা উদ্বাস্তুদের দিয়েই করাতে চায়। তারা তখন কয়েকজনকে বেছে নিয়ে হুকুম করলো। উদ্বাস্তুরা যখন লাশগুলো টেনে দরজার সামনে নিয়ে এল তখন বেলুচি সৈন্যরা লাশসমেত উদ্বাস্তুদের লাথি মেরে চলন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দিল।

এরপর পৌঁছলাম ওয়াজিরাবাদে। পাঞ্জাবের এই শহরটি দুটি কারণে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গাবাজ হিন্দু মুসলমানরা যে ছোরাছুরি ব্যবহার করেছে তার অধিকাংশই চালান গেছে এখান থেকে। অন্যদিকে ওয়াজিরাবাদের খ্যাতি বৈশাখী মেলার জন্যে। বৈশাখী মেলায় হিন্দু মুসলমান চাষীরা ফসল কাটার আনন্দোৎসব পালন করে। কিন্তু আজ শুধু চোখে পড়ছে

চতুর্দিকে ছড়ানো ছিটোনো অগুনতি লাশ। অনতিদূরে আকাশ কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে। স্টেশনের সামনে পৈশাচিক উল্লাস প্রকাশ করছে স্থানীয় জনতা। দেখতে দেখতে একদল লোক কিছু নগ্ন মেয়েদের ঘিরে নৃত্য শুরু করলো। নানা বয়সের উলঙ্গ মেয়ে। এদের মধ্যে রয়েছে বৃদ্ধা, যুবতী, কিশোরী এমনকি বালিকা যাদের মধ্যে নগ্নতার জন্যে লজ্জাবোধও জাগেনি। ঠাকুমা, মেয়ে, নাতনী এদের ঘিরে নাচছে, গাইছে, হল্লোড় করছে যুবকরা। হিন্দু মেয়েদের উলঙ্গ করাতে পেরে মুসলমান ছেলেদের সে কী আনন্দ। কী অপূর্ব বৈশাখী উৎসব পালন করছে ছেলে-ছোকরারা! এইসব মেয়েদের তারপর এরা হাঁটিয়ে আমার গাড়ীর কাছে নিয়ে এলো। মেয়েদের সর্বাঙ্গে অপমানের চিহ্ন তবু কিন্তু তারা মাথা উঁচু করে হেঁটে এলো। লজ্জা বা ঘৃণার এতটুকু ছাপ পড়েনি এদের চোখে মুখে। যেন করুণাময় মৃত্যু দেবতার আশীর্বাদে শত শত শাড়ি এদের লজ্জা ঢেকে দিয়েছে। লক্ষ সীতার সতীত্বের পূত অগ্নি যেন জ্বলছে ওদের চোখে। মেয়েদের তাড়িয়ে নিয়ে আসছে যারা তারা উল্লাস প্রকাশ করছে নানাবিধ ধ্বনি দিয়ে, যেমন,—"পাকিস্তান জিন্দাবাদ। ইসলাম জিন্দাবাদ!! কায়েদ-ই আজম মহম্মদ আলী জিন্না জিন্দাবাদ!!"

এই বিচিত্র শোভাযাত্রা কামরার কাছাকাছি আসতেই ভিতরের যাত্রীরা ভয়ে জানলা বন্ধ করে দেয়। মেয়েরা ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকে।

বেলুচি সৈন্যরা চিৎকার করে হুকুম জারি করে,—জানলা বন্ধ করা চলবে না, হাওয়া চলাচল করতে দিতে হবে।

সেই হুকুমে কান না দিয়ে যারা জানলা বন্ধ করতে আসে তারা গুলি খেয়ে মারা পড়ে। এইভাবে জানলা বন্ধ করার চেষ্টা করতে গিয়ে বেশ কিছু লোক নিহত হবার পর আর কেউ ও পথে গেল না।

মুসলমান যুবকেরা ওই নগ্ন মেয়েদের নিয়ে কামরায় প্রবেশ করে আবার ধ্বনি দিতে শুরু করলো। কিছুক্ষণ পরে তারা আমায় চলার নির্দেশ দিল।

একটি ছোট ছেলে তার মায়ের কোল ঘেঁষে প্রশ্ন করে,– মা তুমি কি স্নান করে এলে ?

—হ্যাঁ বাবা, আমার দেশের ছেলেরা, ভাইয়েরা আমাকে স্নান করিয়েছে।

—তোমার কাপড় কোথায় মা ?

—আমার বৈধব্যের রক্তের ছাপে সেই কাপড় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমার ছেলেরা, ভাইয়েরা সেই কাপড় নিয়ে নিয়েছে।

চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে দুটি যুবতী মেয়ে অন্ধকার বসুন্ধরার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমি আঁতকে উঠে চিৎকার করলাম। তারপর আবার উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলাম যতক্ষণ না লাহোর স্টেশন আসে।

লাহোর স্টেশন। এক নম্বর প্লা ফরমে আমাকে দাঁড় করানো হলো। দু'নম্বর প্লাটফরমে তখন দাঁড়িয়ে আছে অমৃতসর থেকে আগত আর একটি ট্রেন। এই ট্রেনটি পূর্ব পাঞ্জাব থেকে নিয়ে এসেছে মুসলমান উদ্বাস্তুদের।

কিছুক্ষণ পরে একদল মুসলমান আমার কামরায় কামরায় উঠে তল্লাসি শুরু করে দিল। উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে তারা নগদ টাকাকড়ি অলঙ্কার যা ছিল সব লুঠ করে নিল। তারপর চারশো উদ্বাস্তুদের তারা নামিয়ে নিয়ে গেল হত্যার উদ্দেশ্যে। পঞ্চাশজন রমণীকে নামিয়ে নিয়ে গেল ধর্ষণের উদ্দেশ্যে। এর কারণ অমৃতসর থেকে আগত ওই ট্রেনটি মাঝপথে আক্রান্ত হয়েছিল। ওই ট্রেনের চারশোজন মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছিল এবং পঞ্চাশজন মুসলমান রমণীকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। সুতরাং হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের মধ্যে সমতা রক্ষার জন্যে সমসংখ্যক হিন্দু-শিখ হত্যা করা হবে এবং পঞ্চাশজন হিন্দু রমণীকে ধর্ষণ করা হবে।

মোঘলপুরা স্টেশনে প্রহরী পরিবর্তন করা হলো। বেলুচি সৈন্যরা নেমে গেল তার বদলে এল শিখ, রাজপুত ও ডোগরা সৈন্যরা। অন্তরী স্টেশন পার হতেই পটভূমি পাল্টে গেল। এখন চারিদিকে যে মৃতদেহগুলি দেখা যাচ্ছে সেগুলি সবই মুসলমানদের। কামরায় এখনো যে

ক'জন হিন্দু-শিখ উদ্বাস্তু বেঁচে আছে তারা সবাই এখন বুঝতে পেরেছে যে ট্রেন হিন্দুস্থানের সীমানায় পৌঁছে গেছে।

অমৃতসরে পৌঁছবার পর মুণ্ডিত মস্তক টিকিওলা চারজন ব্রাহ্মণ একটি কামরায় উঠলো। তাদের গায়ে নামাবলী, কপালে চন্দনের তিলক। দেখে মনে হয় তীর্থদর্শনে বেরিয়েছে তারা। হিন্দু ও শিখদের ছোট ছোট দল কৃপাণ, বর্শা, বন্দুক নিয়ে কামরায় কামরায় শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়াতে থাকে। এই চারজন ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে তাদের সন্দেহ হলো। একজনকে তারা প্রশ্ন করলো,—

—বামুন ঠাকুর কোথায় যাচ্ছেন?

—হরিদ্বার।

—হরিদ্বার না পাকিস্তান?

—না না, আমি হরিদ্বারেই যাচ্ছি। আল্লার নামে শপথ করে বলছি, আমি হরিদ্বারেই যাবো।

দলের সবাই তখন সোল্লাসে চিৎকার করে বললো,—ঠিক আছে, তোকে আল্লার নামেই খতম করবো।

—নাথু সিং, এদিকে এসো, শিকার পাওয়া গেছে।

বামুন ঠাকুরটিকে তারা হত্যা করলো। বাকী তিনজন পালাবার চেষ্টা করলো কিন্তু পালাবে কোথায়? একজনকে নাথু সিং প্রশ্ন করলো,—হরিদ্বারে যাবে বামুন ঠাকুর? কিন্তু তার আগে তো ডাক্তারী পরীক্ষা করাতে হবে।

নাথু সিং যা সন্দেহ করেছিল পরীক্ষায় তাই প্রমাণিত হলো। সুতরাং বাকী তিন 'ব্রাহ্মণ'কেও প্রথমজনের মতো হত্যা করা হলো।

গহন বনের মধ্য দিয়ে আমি ছুটে চলেছি। কিছুক্ষণ পরে আমাকে চেন টেনে থামানো হলো। থামতেই শুনতে পেলাম 'সৎশ্রী আকাল' 'হর্ হর্ মহাদেও' ধ্বনি। তারপর দেখলাম এতক্ষণ যেসব হিন্দু উদ্বাস্তুরা ভয়ে সিঁটিয়ে ছিল তারা ও প্রহরারত সৈন্যরা অরণ্যের দিকে ছুটে চলেছে। আমি ভাবলাম এরা বোধহয় মুসলমানদের আক্রমণের আশঙ্কায় অরণ্যে আত্মগোপন করে থাকার জন্যে পালাচ্ছে। একটু

পরেই অবশ্য বুঝতে পারলাম আমার ভুল হয়েছে। নিজেদের জীবন রক্ষার তাগিদে নয়, অন্যের জীবন নাশ করতেই তারা অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করছে। কয়েকশো মুসলমান তাদের বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে এই অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই তারা সব শেষ হয়ে গেল। বিজয় উল্লাস করতে করতে 'বীরপুরুষরা' সবাই ফিরে এল। একজন শিখ তার কৃপাণের ডগায় একটি শিশুর মাথা বিঁধিয়ে নিয়েছে, সে ও তার সঙ্গীরা ভাঙড়া নাচতে নাচতে আনন্দ প্রকাশ করছিল।

জলন্ধরের কাছাকাছি একটি মুসলিম পাঠানদের গ্রামের পাশে আবার আমাকে থামানো হলো। কামরা থেকে হিন্দু শিখরা নেমে গিয়ে হামলা করলো। পাঠানরা বীরের মতো সংগ্রাম করলো কিন্তু একে তো আক্রমণকারীরা সংখ্যায় অধিক তার ওপর অস্ত্রধারী সৈন্যরা তাদের সহায় তাই তারা প্রাণ দিল, তাদের মেয়েরা অপমানিত হলো।

এই সেদিনও পাঞ্জাবের এই সুফলা ক্ষেতে হিন্দু-মুসলমান-শিখ কৃষকেরা মিলেমিশে সোনার ফসল ফলাতো, পিপল শিশমের গাছের নীচে কৃষাণ স্বামীরা অপেক্ষা করতো কখন তাদের গৃহিণীরা কাঁধে করে বয়ে নিয়ে আসবে লস্যির ঘড়া, তাদেরই ক্ষেতের সোনার গম থেকে তৈরি চাপাটি। আহা এই তো সেই পাঞ্জাব যেখানে জন্মেছিল হীর, মহীওয়াল ও রান্‌ঝা। মীর্জা সাহেবানার গীত আর বোধহয় এখানে ধ্বনিত হবে না কোনোদিন। চিনারও বোধহয় আর তেমন শান্ত গতিতে বইবে না। আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি আকাশ ভেঙে বর্ষিত হোক অভিসম্পাত সেইসব নেতাদের ওপর যারা এই সোনার দেশটাকে ভাগ করলো, নোংরামি ও কদর্যতার পাঁকে ডুবিয়ে দিল দেশটাকে। জানি আমি যন্ত্র, মানুষের মতো আমার চোখ নেই, কান নেই, মন নেই তবু কেন জানি না এই নৃশংসতা আমাকে এমন প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে।

লুধিয়ানা স্টেশনে আমাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা হলো কারণ লুঠেরারা লুঠপাট সেরে না আসা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা

করতে হবে। মুসলমানদের দোকানপাট লুঠ করে তারা ফিরে এল ঘণ্টা দুই পরে। আমার কামরাগুলির সর্বদেহে রক্তের দাগ, স্নান করে পরিচ্ছন্ন হবার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম কিন্তু আমি জানি সে সুযোগ আমি পাব না। আমাকে এখনো সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে এবং সেই পথ পরিক্রমায় আমাকে অনেকবার থামানো হবে। অনেক নিষ্ঠুর ঘটনা দেখতেও হবে আমাকে।

মাঝরাতে পৌঁছলাম আম্বালা স্টেশনে। মিলিটারী প্রহরায় একজন মুসলমান ডেপুটি কমিশনার ও তাঁর পরিবার এসে উঠলেন প্রথম শ্রেণীর একটি কামরায়। তাঁর ও তাঁর পরিবারের কারোর যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সে সম্পর্কে মিলিটারীর ওপর কড়া নির্দেশ ছিল।

রাত দুটোয় আম্বালা ছেড়ে মাইল দশেক এগোবার পর চেন টেনে আমাকে থামানো হলো। কিছু লোক সেই মুসলমান অফিসারের কামরায় ঘা দিতে লাগলো। কামরা ছিল ভিতর থেকে বন্ধ। তারপর জানলা ভাঙা হলো। ঘাতকরা অফিসার, তার স্ত্রী ও তিনটি শিশু-সন্তানকে হত্যা করলো, তাদের অলঙ্কার ও টাকা-পয়সা সব লুঠ করলো। অফিসারের একটি সুন্দরী যুবতী কন্যা ছিল, তাকে তারা হত্যা করলো না, নিয়ে গেল তাকে লাইনের পাশে জঙ্গলে।

মেয়েটিকে নিয়ে এখন কি করা যায় এই নিয়ে ঘাতকদের মধ্যে আলোচনা সভা বসলো। মেয়েটি বললো,—আমাকে তোমরা মেরে ফেলো না, মেরে ফেলে কি লাভ হবে তোমাদের? বরং তোমাদের মধ্যে কেউ একজন আমাকে বিয়ে করতে পারো।

একজন যুবক বলল,—ঠিকই বলেছে মেয়েটি, আমার মনে হয়…

যুবকটির কথা শেষ হবার আগেই আর একটি যুবক এগিয়ে এসে মেয়েটির পেটে ছোরা বসিয়ে দিয়ে বলল,—অনেক গোলটেবিল বৈঠক হয়েছে, এবার চলো যাই, আরো অনেক কাজ আছে।

মেয়েটির হাতে ছিল সমাজতন্ত্রের ওপর লেখা একটি বই। বুদ্ধিমতী, বিপ্লবী মেয়ে ছিল সে। হয়তো সে চেয়েছিল দেশের সমাজব্যবস্থা পাল্টাতে, দেশের ও মানুষের সেবা করার জন্যেই বোধহয় সে তৈরি

ছিল। হয়তো সে চেয়েছিল আদর্শ স্ত্রী হতে, আদর্শ মা হতে। সম্ভাবনাপূর্ণ সেই মেয়েটি আর নেই, শুধু পড়ে আছে তার প্রাণহীন দেহটি গহীন অরণ্যের মাঝে শিয়াল-কুকুরের খাদ্য হিসেবে। পাশেই পড়ে আছে রক্তেভেজা সেই বইটি,—"সমাজতন্ত্রবাদ : মত ও পথ"।

আমি রুদ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছি অন্ধকারের মধ্য দিয়ে। আশাহীন ভয়াবহ সেই অন্ধকারের রূপ। কামরায় কামরায় যাদের নিয়ে আমি চলেছি তারা এখন জড়ানো গলায় ভাঙা ভাঙা স্বরে মহাত্মা গান্ধীর জয়ধ্বনি করছে।

* * * *

সুদীর্ঘ ভয়াবহ পথ অতিক্রম করে আমি বম্বেতে ফিরে এসেছি। এখন আমাকে শেডের নিচে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। রক্তের দাগ ধুয়ে মুছে আমাকে পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। না, রক্তের দাগ আমার শরীরের কোথাও আর নেই, নরখাদকদের পৈশাচিক উল্লাসের অট্টহাসিও আমাকে আর শুনতে হচ্ছে না। কিন্তু রাত্রি যখন গভীর হয় তখন মনে হয় প্রেতাত্মারা বুঝি জেগে উঠেছে।

স্মৃতিপটে তখন জেগে ওঠে মানুষের পাশবিক আচরণের দৃশ্যাবলী। শিশুদের আর্ত চিৎকার, মেয়েদের বুকভাঙা কান্নার স্বর শুনে আমি শিউরে উঠি। কায়মনোবাক্যে তখন আমি প্রার্থনা জানাই আর কোনদিন যেন আমাকে ওই ভয়ঙ্কর পথে যাত্রা করতে না হয়। যদি আবার কোনদিন পাঞ্জাবের সোনালী খেত হীর ও রানঝার শাশ্বত প্রেমগীতিতে মুখরিত হয়ে ওঠে, আবার যদি কোনোদিন হিন্দু মুসলমান কৃষাণ-শ্রমিকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পাঞ্জাব শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে তখনই আমি প্রসন্ন চিত্তে সে দেশে যাবার জন্তে আগ্রহ অনুভব করবো।

ইস্পাত ও কাঠ দিয়ে গড়া আমার শরীর, তবু কেন জানি না আমি এমন নিদারুণভাবে আহত। মানুষ, তোমাদের কাছে আমার মিনতি

প্রতিহিংসা ও ঘৃণা বোঝাই করে সেই নারকীয় পথে আমাকে আর কোনোদিন পাঠিও না। নারকীয় কাজের সহায়ক হিসেবেও আমাকে তোমরা আর কোনোদিন ব্যবহার করো না। এর পর থেকে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত অঞ্চলে আমাকে খাদ্য বহন করে নিয়ে যাবার জন্যে পাঠিও কিংবা শিল্পাঞ্চলে কয়লা, লোহা ও তেল বয়ে নিয়ে যেতে। কৃষাণদের ঘরে সার পৌঁছে দেবার জন্যে পাঠিও কিন্তু মৃত্যু ও ধ্বংসের পথে আর নয়।

আমি সেই দিনের দিকে তাকিয়ে আছি যেদিন আমার কামরায় কোনো ঘাতক উঠবে না, উঠবে কৃষাণ ও শ্রমিকেরা। তাদের সঙ্গে থাকবে সুখী স্ত্রীরা আর থাকবে তাদের ফুলের মতো সুন্দর সব শিশু। সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশের মধ্যে তারা বেড়ে উঠবে। তারা কেউ হিন্দু হবে না, মুসলমান হবে না, তারা হয়ে উঠবে এমন একটি পরিচয়ের যোগ্য যার নাম এক কথায় বলা হয় মানুষ।